'পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র সঙ্গীত চর্চা'

তত্ত্বাবধায়ক
ডঃ মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী
অধ্যাপক
নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

GIFT

425530

উপস্থাপন
ইফ্ফাত-ই-রহমান ইফা
এম,ফিল (গবেষক)
রেজিস্ট্রেশন ও সেশন নং- ১/২০০০-২০০১
নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার
Dhaka University Library
425530

নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অঙ্গীকার নামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, 'পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র সঙ্গীত চর্চা' এই অভিসন্দর্ভ পত্রে আমার জানামতে পূর্বে কোন গবেষক এ গবেষণা কাজটি করেন নাই। আর্ন্তজাতিক কোন পত্রপত্রিকাতে আমি এই অভিসন্দর্ভ পত্রের কিয়দংশও প্রকাশ করি নাই।

ইফফাত-ই-রহমান ইফা
(ইফফাত-ই-রহমান ইফা) ২২.০৭.০৬
এম,ফিল (গবেষক)
নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

425536

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

২২.৭.০৬
(ডঃ মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী)
অধ্যাপক
নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক
নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সুচীপত্র

বিষয়বস্তু পৃষ্ঠা

ভূমিকা ঃ ০৪

প্রথম অধ্যায় ঃ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সাহিত্য সঙ্গীত চর্চা ০৫

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বাংলাদেশের নিসর্গচিত্র, সমাজ জীবন এবং কবির গানে তার প্রভাব ২৬

তৃতীয় অধ্যায় ঃ বাংলার বাউল গান ও রবীন্দ্রনাথ ৫৫

চতুর্থ অধ্যায় ঃ পূর্ববঙ্গে রচিত গানের তালিকা ও সুরবিশ্লেষণ ৭৩

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ৯৩

- 425530

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ভূমিকা

বাঙ্গালী জাতি শিল্প ও সাহিত্যের দিক থেকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে পেয়েছে ঐশ্বর্যের এক সুবিশাল ভান্ডার। বাংলা ভাষার আধুনিকায়ন শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের গান আজ থেকে একশ বছর আগেও ভীষণ ভাবে আধুনিক ও জনপ্রিয় ছিল, এমনকি সেই গানগুলির বাণীর ভাব গভীরতা ও সুরের নতুনত্বে এই একবিংশ শতাব্দীতেও সমান জনপ্রিয় ও আধুনিক। তাই তাঁর গান ও সাহিত্যকলা নিয়ে আজও গবেষণা চলছে।

তৎকালীন পূর্ববঙ্গে ঠাকুর পরিবারের জমিদারী তদারকীর কাজে রবীন্দ্রনাথকে পূর্ববাংলায় আসতে হয় ১৮৯০ সালে। দশ বছরেরও বেশী সময় তিনি এখানে স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন। এরপরেও বিভিন্ন সময়ে তিনি বহুবার পূর্ববঙ্গে এসেছেন- নিসর্গ প্রকৃতি, প্রমত্তা পদ্মা ও সাধারণ মানুষের টানে। কারণ গ্রাম বাংলার নিসর্গ চিত্র, সমাজজীবন, আর মাটির কাছাকাছি যে সমস্ত মানুষের বাস তাদের অকৃত্রিম ভালবাসা তাঁর অন্তর্লোকের সৃষ্টিশীল সত্তাকে জাগিয়ে তুলেছে। বাংলার নদী, নীল আকাশ এবং বিস্তির্ণ খোলা প্রান্তরে কবি আবিস্কার করেছেন পৃথিবীর অসীম ঔদাস্য ও সৃষ্টির নিগুঢ় রহস্য। এই ভাবের গভীরতা তাঁর গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ গুলিকে সমৃদ্ধ করেছে। পল্লী অঞ্চলেই তিনি মানুষের জীবনকে সবচেয়ে কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন- দেখেছেন তাদের দুঃখ-দরিদ্র, হাসি-কান্না। কবির নানা রচনায় পূর্ববঙ্গের অভিজ্ঞতার ছাপ ফুটে উঠেছে। সেই হিসেবে আমরা বলতে পারি, কবির পূর্ববঙ্গে আসার পূর্বের রচনাসমূহ থেকে পরবর্তীকালের রচনাবলী আরও নতুন মাত্রা পেয়েছে।

এই নতুনত্ব বিশেষ ভাবে প্রষ্ফুটিত হয়েছে তাঁর গানে। কারন ১৮৯০ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত তাঁর স্থায়ী ভাবে পূর্ববঙ্গ বাসকালীন সময়ে তিনি লোকসঙ্গীতের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসেন। শিলাইদহ, শাহজাদপুর, পতিসর প্রভৃতি অঞ্চলের বাউলদের গান শোনেন। তাদের গানের ভাবগভীরতা ও জীবনবোধ কবিকে মুগ্ধ করে। পূর্ববাংলার বাউলদের গানে উৎসাহিত হয়ে তিনি তাঁর গানে লোকসঙ্গীতের সুর সংযোজন করেছিলেন।

এই গবেষণাপত্রে, চারটি অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের পূর্ববঙ্গে বসবাস, জমিদার হিসেবে তাঁর পল্লী উন্নয়নের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং বিভিন্ন সময়ে তাঁর পূর্ববঙ্গে আসা-যাওয়ার দিন-তারিখ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া পূর্ববঙ্গের নিসর্গ প্রকৃতি সমাজজীবন কবির রচনায় কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে এবং বাংলার লোকজসুর ও লোকসঙ্গীত সাধকদের দ্বারা কবি কিভাবে প্রভাবিত হয়েছেন এবং বিভিন্ন সময়ে পূর্ববঙ্গে অবস্থান কালে কবি যে সব গান রচনা করেছেন তার একটি তালিকা ও গানগুলির সুর বিশ্লেষণ- এ সমস্তই গবেষণার মূল উপজীব্য।

এই গবেষণার কাজে সর্বোতভাবে সহযোগীতা করেছেন আমার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় ডঃ মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী। গবেষণা কাজটিকে সুষ্ঠ রূপে সম্পাদন করার জন্য বিভিন্ন সময়ে উপদেশ, তথ্য ও তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরী ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছিলেন বলে তাঁর কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়া নিলুফার ইয়াসমীন স্মৃতি পাঠাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, পাবলিক লাইব্রেরী ও শিল্পকলা একাডেমীর লাইব্রেরীতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ যারা আমাকে সাহায্য করেছেন এবং যে সমস্ত লেখক ও গবেষকের বইপত্র থেকে আমি সহায়তা গ্রহন করেছি তাদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

প্রথম অধ্যায়

পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সাহিত্য সঙ্গীত চর্চা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মের পর প্রথম বারো বছর কেটেছে কলকাতা শহরে জোড়াসাঁকোর গলিটির ভেতরে । পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে কিছুদিন শান্তিনিকেতন ও শৈলাবাসে ডালহৌসি পাহাড়ে ভ্রমনই তাঁর কলকাতার বাইরে প্রথম পদক্ষেপ। এরপরে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের আহমেদাবাদের বাড়ীতে কিছুদিন থাকার পর সেখান থেকেই উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য চলে যান ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ড থেকে কলকাতায় আসা যাওয়া থাকলেও বাংলাদেশে আসার তেমন সুযোগ ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি তখন মহর্ষিদেব রবীন্দ্রনাথকে মনোনিত করলেন পূর্ববঙ্গের জমিদারী দেখাশোনার জন্য। আদেশ হল কলকাতা ছেড়ে বিরাহিমপুরের কাছারি শিলাইদহে গিয়ে বাস করতে হবে। একে সর্বকনিষ্ঠ পুত্র, তার উপর কবি স্বভাবের রবীন্দ্রনাথকে মহর্ষি এই কাজের জন্য মনোনীত করায় বাড়ীর আত্নীয়স্বজন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য কয়েকবছরের মধ্যে জমিদারীর সর্বতোভাবে উন্নতি দেখে তারা আশ্বস্ত হলেন এবং মহর্ষির অন্তর্দৃষ্টির প্রশংসা করতে লাগলেন ।

১৮৯১ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত প্রায় দশ বছর তিনি কুষ্টিয়ার শিলাইদহে, রাজশাহীর পতিসরে এবং পাবনা জেলার সাজাদপুরের কাছারী বাড়ীতে থেকে জমিদারীর যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনা করেন। পল্লী বাংলার সঙ্গে কবির আন্তরিক পরিচয় হলো এখানেই ।[২] পূর্ববঙ্গের জমিদারী পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ রবীন্দ্রনাথের জীবনে ছিল একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা । কারণ ইতোপূর্বে তাঁর জীবনের পরিধি ছিল মূলত শহর কেন্দ্রিক । কলকাতার অভিজাত শহুরে জীবনে আবদ্ধ থাকলে তাঁর মানসিক বিকাশ, সাহিত্য ও কাব্যসৃষ্টি হয়তো ঐ সামাজিক গন্ডী থেকে বেড়িয়ে আজকের বিশাল পর্যায়ে পৌছাতো না । বাংলার যিনি মহাকবি তাকে তো দেশের কথা লিখতে হলে বাংলার মর্মমূলে পৌছাতে হবে, আর পল্লী গ্রামেই রয়েছে দেশের ৮০ ভাগ মানুষের বাস। জমিদারীর ভার গ্রহণ করে সেই প্রথম যখন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে গিয়েছিলেন, তাঁর সেই অনুভূতি তিনি ব্যক্ত করেছিলেন- " মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের মধ্যেই এই খানেই প্রানের নিকেতন লক্ষ্মী এই খানেই তাহার আসন সন্ধান করেন"

" কলকাতা থেকে শিলাইদহের একেবারে ভিন্ন পরিবেশে এসে রবীন্দ্রনাথ বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন" (কবির সঙ্গে সাক্ষাৎকার "The Forword" 23 February, 1936) । "গ্রামের জীবন আচার ও স্বভাব ভিন্ন । মাটি, জল, রোদ, হাওয়ার গন্ধ এখানকার মানুষের গায়ে। পল্লীর নিসর্গ মূর্তি আর সেখানকার মানুষের প্রকৃতি- এই দুই-ই রবীন্দ্রনাথের কাছে নতুন আবিস্কার । শহরের জটিলতা থেকে মুক্ত বলে এখানকার জীবন প্রনালী যেন এক ধরনের সহজিয়া সাধন। সরল স্বভাবের বলে এদের ভালোবাসাও সহজ ।"[৩] এছাড় শিক্ষার অভাব, দারিদ্র, ক্ষুধা, অস্বাস্থ্য সব মিলিয়ে দেশের মানুষ যে কতটা অসহায় তা উপলব্ধি করতে পেরে কবি এদের জন্য ভালোবাসার সাথে সাথে বেদনাও বোধ করতে শুরু করেছিলেন। অবশ্য বেদনা বোধ করেই তিনি নিশ্চুপ থাকেননি, কিভাবে তাদের জীবনধারণ পদ্ধতির উন্নতি করা যায় সেই বিষয়ে ভেবেছেন, লিখেছেন এবং সাধ্যমত পল্লী সেবায় আত্নিয়োগ করেছেন। পূর্ববঙ্গে আসার কিছুদিন পরেই লেখা "এবার ফিরাও মোরে" কবিতাটিতে যে আত্নধিক্কারের সুর আছে সেটি যেন তাঁর নিজেরই এতোদিনের শৌখিন কবি জীবনকে ধিক্কার।[৪] পল্লীবাসীর এই অসহায় জীবনচিত্র কবির মনে সর্বদা জাগ্রত ছিল বলেই তিনি মাটির অনেক কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ জানতেন ধন, ধান্য, পুষ্পভরা বাংলাদেশের কথা। কিন্তু পূর্ববঙ্গে এসে দারিদ্রের যে চিত্র তিনি প্রত্যক্ষ করলেন তা ছিল তার ধারণার একেবারে বিপরীত । " চাহিদার অভাবে তাঁতীর তাঁত আর চলে না, স্যাকরার এবং কামারের হাপর বন্ধ, কুমারের চাক অচল, ছুতোর মুচির ব্যবসা মাটি। জীবিকার অভাবে এরাও গ্রাম ছেড়ে শহরে, গঞ্জে, কলকারখানার ধারে এসে বাসা বাঁধল। গ্রামাঞ্চল জনহীন হতে লাগলো ।"

ঐ সময়ে গ্রামে শিক্ষার আলো একেবারেই ছিল না। দু'একজন যারা শিক্ষিত হতে পারছিল তারা চাকুরী ক্ষেত্রে শহরেই বাস করে ফলে গ্রামের লোকদের সংগঠিত করা কিংবা কোন সমস্যার সমাধান করার ব্যাপারে সঠিক লোকের এবং সঠিক সিদ্ধান্তের অভাবে গরীবলোক আরো গরীব হতে থাকে। এ অবস্থা উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ পল্লী উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করতে চেয়েছেন। 'স্বদেশী সমাজ'

(১৯০৪) নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে দেশবাসীকে সমবেতভাবে পল্লীসেবা ব্রতে আহ্বান জানিয়েছেন। চার বছর পরে পাবনা কনফারেন্সের অভিভাষণে তিনি দেশবাসীর মনকে গ্রামমুখী করবার উদ্দেশ্যে সংগঠনমূলক একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা সর্বসমক্ষে উপস্থাপন করেছিলেন। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, কোন দিক থেকে কোন সাড়া পাননি ; কেননা একাজে শ্রম এবং নিষ্ঠার প্রয়োজন যতখানি, উত্তেজনার মদিরা ততখানি নয় । কাজেই তাকে নিতান্ত একলাই এ পথে অগ্রসর হতে হয়েছে" [৫]

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে আরো লিখেছেন, যেমন-অবস্থা ও ব্যবস্থা, সভাপতির অভিভাষণ তাঁর পল্লী পূনর্গঠন চিন্তার পরিকল্পিত মডেলটিকে বাস্তবধর্মী করতে সাহায্য করেছে । এরপর এসেছে 'পল্লীর উন্নতি' ও 'সমবায় নীতির' মত তাৎপর্যপূর্ণ নিবন্ধ। সেই সঙ্গে 'পল্লী প্রকৃতি' ও 'কালান্তর' গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলো। এছাড়াও তাঁর প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে, চিঠিপত্রে এমনকি আলাপচারিতায়ও পল্লী পূনঃগঠন প্রসঙ্গে বারবার উঠে এসেছে। প্রমান রেখেছে এ বিষয়ে তার চিন্তার ক্রম উত্তরণের । [৬]

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন বিদেশী রাজশক্তির কাছে আবেদন নিবেদন বা ভিক্ষা না, নিজস্ব সম্পদ ও শক্তির সাহায্যে আত্মনির্ভর, অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী ও আত্মবিশ্বাস সম্পন্ন সমাজ প্রধান পল্লী গড়ে তোলাই হবে প্রকৃত দেশের কাজ।

জমিদার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বললেও তিনি প্রজাদের বিষয়ে কতটা ভেবেছেন এ বিষয়ে রাজশাহী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার-এ তাকে আদর্শ জমিদার রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। গেজেটিয়ার-এর একটি অংশ এখানে উল্লেখ করছিঃ-

It must not be supposed that a powerful landlord is always oppressive and uncharitable. A striking instance to the country is given in the settlement officers account of the estate of Rabindranath Tagore, the Bengali poet, whose fame is wordwide. It is clear that to his poetical genius he adds practical and benificial ideas of estate management, which should be an example to all Zemindars --Employers are expected to deal fairly with the raiyats and unpopularity earns dismissal. Remission of rent is granted when inabality to pay is proved. In 1312 (B.S) it is said that the amount remitted was Rs-57, 595. There are lower primary schools in each of the three divisions of the estate and at Patisor there is a high English school and a charitable dispensary. These are maintained out of a fund to which the Estate contributes annually Rs. 1250/- and the raiyats 6 pies for the rupee in their rent. There is an annual grant of Rs. 240/- for the relief of cripples and the blind. An agricultural bank advances loans to raiyats at 12 Pc. per annuam. The depositors are mostly Calcutta friends of poet, who get interest at 7 percent. The Bank has about Rs. 90,000 invested in loans" (Rajsahi District Gazeteer (1916) by L.S.S.O Malley I.C.S)

কৃষকদের কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মূল পরিকল্পনা হাতে নেবার আগেই কুঠিবাড়ির আশেপাশে নানা ধরনের আবাদ করতে থাকেন । আগ্রহী কৃষকদের মধ্যে উন্নত মানের বীজও বিতরন করেন। রবীন্দ্রনাথ গ্রামে সমবায় প্রথা চালু করেছিলেন তাঁর প্রবর্তিত সমবায়ের মধ্যে রয়েছে- কৃষিসমবায়, তাঁত সমবায়, অর্থ সমবায় ইত্যাদি । তাঁত শিল্পের উন্নতির জন্য প্রথমবারের মত কুষ্টিয়ায় প্রতিসরে স্থাপিত হয় 'বয়ন স্কুল' প্রজাদের খাজনার ওপরে টাকায় দু পয়সা করে জমা করে একটি ফান্ড সৃষ্টি হয়েছিল। তার সাথে জমিদার নিজেও অর্থ সাহায্য করেছেন। ঐ ফান্ডের টাকায় গ্রামে স্কুল, হাসপাতাল, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা ও রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়েছে। মহাজনদের হাত থেকে গ্রামের লোকদের উদ্ধার করার জন্য রবীন্দ্রনাথ বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা ধার নিয়ে পতিসরে কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। এই ব্যাংক খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল এবং এই প্রথম প্রজারার ঋণমুক্ত হওয়ার সুযোগ পেলো। পূর্ববঙ্গে গঠনমূলক এসব

পল্লী উন্নয়ন কাজই কবিকে উৎসাহিত করেছিল শ্রীনিকেতনে "বিশ্বভারতীয় পল্লী সংগঠন" বিভাগ প্রতিষ্ঠা করার।

রবীন্দ্রনাথ পূর্ববাংলার পল্লীবাসীর উন্নয়নের জন্য যা কিছু করবার চেষ্টা করেছেন তা মূলত সবটাই ছিল মানবিক দিক থেকে তিনি পল্লীর মানুষকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে বা ভালবাসতে পেরেছিলেন। তবে এর পুরো কৃতিত্বই দিতে হবে পল্লীবাসী সাধারণ মানুষদের সহজ-সরলতা এবং আন্তরিকতাকে । পল্লীবাসী তাদের জমিদারকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন বলেই তাঁর কবি মন পূর্ববঙ্গে এসে নিজেকে যেন নতুন ভাবে জানল। ধর্ম স্বাদেশিকতা, জাতীয়তা, সমাজ-সচেতনতা, সাহিত্যিক আদর্শ প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাই পরিবর্তনের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। একটু বিশ্লেষণ করলেই এই পরিবর্তনগুলো আমরা দেখতে পাই।

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই ঠাকুর বাড়ির ধর্মভাব নিয়ে বড়ো হয়েছিলেন, বাড়ির ঔপনিষদিক আবহাওয়ায় মানুষ হয়েও আর পাঁচ জনের মতো ধর্মমতকে তিনি আপনার বলে গ্রহণ করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থটি থেকে জানা যায়, "আমার জন্ম যে পরিবারে সে পরিবারের কর্মসাধন একটি বিশেষ ভাবের, উপনিষদ এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা, রামমোহন এবং আর আর সাধকদের সাধনাই আমাদের পারিবারিক সাধনা, আমি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র, জাতধর্ম থেকে আরম্ভ করে আমার সব সংস্কারই বৈদিক মন্ত্র দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অবশ্য ব্রাহ্মমতের সঙ্গে মিলিয়ে । আমি স্কুল পালানো ছেলে। সেখানেই গন্ডী দেওয়া হয়েছে সেখানেই আমি বনিবনা করতে পারিনি কখনো। যে অভ্যাস বাইরে থেকে চাপানো তা আমি গ্রহণ করতে অক্ষম। এর থেকে বোঝা যায় তিনি ছেলেবেলা থেকে উপনিষদিক ব্রাহ্ম সংস্কারের বিশ্বাস নিয়ে বড় হয়েছেন ঠিকই কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর এ বিশ্বাসের পরিবর্তন হয়েছে। তার অন্তরের মানবতাবোধ দিয়ে।

কলকাতার বিশিষ্ট সমাজের একদিকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকায়, সমাজের নিম্নস্তরের লোকেদের মধ্যেও যে একটা সৌন্দর্য্য আছে সে বিষয়ে তিনি অজ্ঞাত ছিলেন। ''মানুষের ধর্ম'' গ্রন্থে এ বিষয়ে তিনি এক স্মৃতির উল্লেখ করেন। তখন তাঁর বয়স আঠারো-উনিশ বা বিশ হবে হয়তো । একদিন শীতের সকালে চৌরঙ্গীর বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি রাস্তার দিকে তাকিয়েছিলেন- "যেমনি সূর্যের আবির্ভাব হল গাছের অন্তরাল থেকে, অমনি মনের পরদা খুলে গেল। মনেহল, মানুষ আজন্ম একটি আবরণ নিয়ে থাকে । সেটাতেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য । স্বাতন্ত্র্যের বেড়া লুপ্ত হলে সাংসারিক প্রয়োজনের অনেক অসুবিধা । কিন্তু সেদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার আবরণ খসে পড়ল । মনেহল, সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখলুম, মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখলুম। দু'জন মুটে কাঁধে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে চলেছে। তাদের দেখে মনেহল, কী অনির্বচনীয় সুন্দর, মনে হল না তারা মুটে । সেদিন তাদের অন্তরাত্মাকে দেখলুম, যেখানে আছে চিরকালের মানুষ।''[৭] তিনি অবলোকন করলেন এই বিশ্বব্রহ্মান্ড, এই সৃষ্টি অসম্ভব সুন্দর । এই সুন্দরকে ধরে রেখেছে প্রকৃতি আর এই প্রকৃতিরই একটা অংশ মানুষ। সেই মানুষ যারা মিশে আছে প্রকৃতির বুকে। মানুষকে ভালোবাসাই আসলে হওয়া উচিত বিশ্বমানবের ধর্ম।

১০ বছরেরও বেশী সময় (১৮৯০-১৯০১) কবি পূর্ববঙ্গে স্থায়ী ভাবে বসবাস করেছেন। সে সময় তাঁর প্রজাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। কারণ তিনি তাদের প্রজা হিসেবে দেখতেন না, দেখতেন মানুষ হিসেবে । প্রজাদের জন্য তাঁর কাছে ছিল অবারিত দ্বার । এই সমস্ত মানুষকে ভালোবেসে কবি তাদের সাহায্য করার চেষ্টাও করেছেন সাধ্যমত। এতো কিছুর পরেও তাঁর কবিমন থেমে থাকেনি। তিনি যেন সৃষ্টির নেশায় মেতে উঠেছিলেন এ সময়টায়, পূর্ববঙ্গে বসবাসকালীন এই দশ বছরকে বলা হয় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল সময়ের স্বর্ণযুগ।

শিলাইদহের কুঠিবাড়ীতে, শাহজাদপুর ও পতিসরে কবির বাসভবনে, রাজশাহীতে বন্ধু লোকেন পালিতের বাড়ীতে সর্বপরি বোটে চরে বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে ঘুরতে কবির অসংখ্য রচনা স্মৃতি হয়ে ছড়িয়ে আছে। পূর্ববঙ্গে বাসকালে তাঁর সৃষ্টিকর্মগুলোকে একত্রিত করাই আমার এখনকার প্রয়াস। ১৮৯০-১৯০১ সাল পর্যন্ত স্থায়ীবাস সহ পরবর্তী কালে বিভিন্ন সময় কবি পূর্ববঙ্গে এসেছেন। তবে, নানা কাজে তাকে সর্বদাই কলকাতা কিংবা বোলপুর যেতে হতো। এ কারণে পূর্ববঙ্গে রচিত সৃষ্টিকর্মগুলোকে আলাদা করার উদ্দেশ্যেই তাঁর আসা যাওয়ার দিন তারিখ বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার ভ্রমনকাহিনী থেকে জানা যায়, তিনি প্রথমবার শিলাইদহে এসেছিলেন জ্যোতিরীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্ভবত ১৮৭৬ সালে তখন তার বয়স ছিল ১৫ বছর। ফুলের রস দিয়ে ছবি আঁকা আর এই রস তৈরীর যন্ত্র বানাতে মিস্ত্রি দিয়ে প্রচেষ্টা কিংবা বাঘ শিকারের ঘটনা তার ছেলেবেলার ভ্রমন কাহিনীতে পাই। কিন্তু কিশোর কবির মনে তখনকার স্মৃতি তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। পরবর্তী কালে প্রায় ১৩ বছর পর ১৮৮৯ সালের নভেম্বর মাসে কবি স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং বলেন্দ্রনাথসহ শিলাইদহে বেড়াতে যান। তারুন্যদীপ্ত কবিমনকে আকৃষ্ট করে শিলাইদহের প্রকৃতি। তিনি বিমোহিত হন প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে। বিস্ময়ে বিমুগ্ধ উচ্ছাস প্রকাশ পেয়েছে ইন্দিরা দেবীকে লেখা পত্রে- "পৃথিবী যে বাস্তবিক কি আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই যে ছোট নদীর ধারে শান্তময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে এবং এই অনন্ত ধুসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতি রাত্রে শত সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎ-সংসারে এ-যে কী একটা আশ্চর্য্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়। সূর্য আস্তে আস্তে ভোরের বেলা পূর্বদিক থেকে কী এক প্রকান্ড গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্ছে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে এক প্রকান্ড পাতা উল্টে দিচ্ছে সেই বা কী আশ্চর্য লিখন - আর, এই ক্ষীণ পরিসর নদী আর এই দিগন্ত বিস্তৃত চর আর ঐ ছবির মতন পরপার ধরনীর এই ---- একটি প্রান্তভাগ, এই বা কী বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালা।"[৮] একমাস পর অর্থাৎ ডিসেম্বর ১৮৮৯ সালে তিনি সপরিবারে কলকাতায় ফিরে আসেন।

জমিদারীর দায়িত্বভার নিয়ে কবি প্রথমবারের মত পূর্ববঙ্গে আসেন ১৮৯০ সালে সম্ভবত জানুয়ারী মাসে। শাহজাদপুরে যাওয়ার সময় কবিকে তাঁর 'ভ্রাতুস্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ' একটি বাঁধানো খাতা নিয়ে একখানা নাটক লিখে দেয়ার আবদার করেছিলেন। সেই আবদার মেটাতে তিনি রচনা করেন নাটক 'বিসর্জন'। এরপর জুন মাসের প্রথম দিকে চলে আসেন শিলাইদহে। শিলাইদহের নির্জনতায় তিনি নিজের ভেতর থেকে লেখার তাগিদ অনুভব করেন। প্রমথ চৌধুরীকে একটি চিঠিতে লেখেন "বোধ হচ্ছে এখানে কিছুকাল থেকে যাব। একটা কিছু লিখতে চেষ্টা করা যাবে" (৩ জুন ১৮৯০)। এ সময় কবি রচনা করেন 'অনঙ্গ আশ্রম' যা পরিবর্তীকালে "চিত্রাঙ্গদায়" পরিণত করেন।

২১ জুনের পর তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন এবং তারও কিছুদিন পর আগষ্ট মাসে কবি দ্বিতীয়বারের মত বিলেত যাত্রা করেন। তবে তাঁর এই ভ্রমণ দীর্ঘ দিনের ছিল না, অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ফিরে আসেন এবং ১৮৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে জমিদারীর দায়িত্ব নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে পতিসরে গমন করেন। কালিগ্রাম পৌছে কবি তাঁর স্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন, তবে এতে ডিসেম্বর ১৮৯০ ছাড়া কোন তারিখ ছিলনা। এরপর পথে যেতে যেতে এবং শাহজাদপুর পৌছে তিনি ইন্দিরা দেবীকে বেশ কিছু চিঠি লিখেছিলেন যার সবকটিতে তারিখ পাওয়া যায় না, তবে শাহজাদপুর থেকে শেষ চিঠিটি ইন্দিরা দেবী পেয়েছিলেন ১০ ফেব্রুয়ারী ১৮৯১। এরপরের চিঠিটি শিলাইদহ থেকে। এই সময়ে তিনি পতিস্বর, শাহজাদপুর, শিলাইদহ প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। এরপর মার্চ মাসের শুরুর দিকে কলকাতায় ফিরে আসেন। এবারের ভ্রমণ কবির কাছে তেমন ভাল লাগেনি আর চলন বিলের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তিনি বেশ বিরক্ত বোধ করেন। তবে তা ছিল সাময়িক।

১৮৯১ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি কবি আবার পূর্ববঙ্গে আসেন। এসময়ে তার বেশ কয়েকটি চিঠি পাওয়া যায় ইন্দিরা দেবীকে লেখা-১৬ জুন ১৮৯১ চুহালি জলপথে, ১৯ জুন চুহালি থেকে এবং ২০ জুন কবি শাহজাদপুর পৌছান সেখান থেকে তিনি মৃণালিনীদেবীকে একটি চিঠি লেখেন। আর ফেরার পথে আরো একটি চিঠি লেখেন ইন্দিরা দেবীকে অন্তত ৪ জুলাই পর্যন্ত কবি শাহজাদপুরে ছিলেন। কিন্তু তিনি কবে ফিরেছিলেন তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশে এরপর কবিকে আবার দেখা যায় সেপ্টেম্বর মাসের শেষে (১৮৯১)। এবারে শিলাইদহে তিনি প্রকৃতিকে আরো নিবিড় করে নতুন করে নবরূপে দেখতে পেলেন। কবি লেখেন- "পৃথিবী যে কী আশ্চর্য সুন্দরী এবং কি প্রশস্ত প্রাণে এবং গভীরভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না" তাঁর মনে হয় পৃথিবী যেন তাঁর সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনের উপর নিস্তব্ধ নতনেত্রে------- কী একটা বৃহৎ উদার বাক্যহীন স্পর্শ– বুলিয়ে দেয়।[৯] অক্টোবর মাসের ১ থেকে ১৯ তারিখ (১৫ আশ্বিন- ৩ কার্তিক, ১২৯৮) পর্যন্ত তার ইন্দিরা দেবীকে লেখা ৫টি চিঠি পাওয়া গেছে। এরপর সম্ভবত তিনি পূর্ববঙ্গে আর বেশী

দিন থাকেননি। কারণ এর পরবর্তী চিঠি পাওয়া যায় ২১/১১/১৮৯১ইং ৬ অগ্রহায়ন ১২৯৮ বাংলা, শিলাইদহ থেকে। সম্ভবত এবারও কবি এদেশে বেশী দিন ছিলেন না।

শিলাইদহ থেকে কবিকে পুনরায় চিঠি লিখতে দেখা যায় ৪, জানুয়ারী ১৮৯২। এই সময়কার শেষ চিঠি জানুয়ারী ৯ তারিখের, সম্ভবত কবি ৯ তারিখের পরেই কলকাতায় ফিরে গিয়েছিলেন। পরের মাসে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে কবি আবার শিলাইদহে ফিরে আসেন কিন্তু এবারও সম্ভবত বেশী দিন থাকেন নাই। রবীন্দ্রনাথ কবে শিলাইদহ এসেছিলেন এবং কবে কলকাতায় ফিরে গিয়েছিলেন তার সঠিক সময় বা দিন তারিখ পাওয়া যায় নাই। শুধু ১২ ফেব্রুয়ারী তারিখে ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠি পাওয়া যায়।

এর পরে কবি আবার শিলাইদহে আসেন এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে। এই সময় ৭ ও ৮ এপ্রিল ইন্দিরা দেবীকে লেখা দুটি চিঠি পাওয়া যায়। এবারেও কবির আসা এবং যাওয়ার সঠিক তারিখ পাওয়া যায়নি, তবে সম্ভবতঃ তিনি খুব বেশী দিন শিলাইদহে ছিলেন না। জৈষ্ঠ্য মাসের শেষের দিকে কবি বেশ কিছুদিন পূর্ববঙ্গে অবস্থান করেন। শিলাইদহে পৌছে ১২ জুন তিনি ইন্দিরা দেবীকে চিঠি লিখেন। সেখান থেকে ২১জুন এক দিনের জন্য তিনি গোয়ালন্দে গিয়েছিলেন বলে আভাস পাওয়া যায়। অতপর আবার শিলাইদহে ফিরে আসেন এবং শাহজাদপুর রওনা হন। ২৬ জুন তিনি মৃণালিনী দেবীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন দুদিন ধরে ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করছে তারমানে ২৫, জুনের আগেই তিনি শাহজাদপুরে পৌছেন। এবার শাহজাদপুরে তিনি অন্তত সপ্তাহ দুয়েক ছিলেন এ সময় তিনি ইন্দিরা দেবীকে ৭ টি চিঠি লেখেন। তার সর্বশেষ চিঠি দেখা যায় ৫ জুলাই ১৮৯২। এরপরে কবি আবার চলে আসেন শিলাইদহে ২০ ও ২১ জুলাই ১৮৯২ ইন্দিরা দেবীকে লেখা দুটো চিঠিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পূর্ববঙ্গে অবস্থানের এসময় কালে কয়েকটি কবিতা ও একটি প্রহসন রচিত হয়। কবিতাগুলো হল ''বৈষ্ণব কবিতা'' (১৮ আষাঢ়), ''দুই পাখি'' (১৯ আষাঢ়) এবং "আকাশের চাঁদ" (২২ আষাঢ়) আর প্রহসনটির নাম "গোড়ায় গলদ"। ২১ জুলাই পর্যন্ত তাঁর শিলাইদহ অবস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এবার কবি কলকাতায় ফিরেছেন কিনা বোঝা যায় না, তবে ৩, ভাদ্র (১৮ আগষ্ট ১৮৯২) ইন্দিরা দেবীকে শরতের আসাধারণ সৌন্দর্য্য বর্ণনাময় একটি চিঠি দেখা যায়। তিনি কবে পূর্ববঙ্গে এসেছিলেন এবং কবে কলকাতায় ফিরে গিয়েছিলেন তাঁর কোন সঠিক প্রমান পাওয়া যায় নাই।

ভাদ্র মাসের পর কবিকে আবার আমরা পূর্ববঙ্গে পাই অগ্রহায়নের প্রথমে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে তিনি শিলাইদহ হয়ে রাজশাহী গিয়েছিলেন বন্ধু লোকেন পালিতের বাড়িতে, এখান থেকে ১৮ নভেম্বর ইন্দিরা দেবীকে একটি চিঠি লেখেন। এখানে ২৯ কার্তিক থেকে ১৬ অগ্রহায়ন পর্যন্ত মোট ১৮ দিন রাজশাহী অবস্থানের সময় কবি 'প্রতীক্ষা'(৩০ নভেম্বর) কবিতাটি রচনা করেন। তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ ''শিক্ষার হেরফের'' এখানেই রচিত হয়েছিল এবং এখানকার একটি সভায় পাঠ করা হয়েছিল।

এরপর ৩০ নভেম্বর ১৮৯২ বিকেলে লোকন পালিতকে নিয়ে কবি রাজশাহী থেকে নাটোরে যাত্রা করেন জগদিন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণে। সেখান থেকে ৭ ডিসেম্বর শিলাইদহে চলে আসেন। তবে, এর মধ্যে জমিদারী কাজে তাকে ৩ দিনের জন্য পাবনা যেতে হয়েছিল, ১৪ ডিসেম্বর তিনি শিলাইদহে ফিরে আসেন এবং ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। কলকাতায় ফিরে আসার পূর্বে ''মানস সুন্দরী'' কবিতাটি লেখেন ৪ পৌষ।

তিনমাস পরে সম্ভবত চৈত্র মাসের ২য় সপ্তাহের শুরুতে তিনি আবার শিলাইদহে আসেন এবং তার পরপরই রাজশাহী যাত্রা করেন বন্ধু লোকেন পালিতের আমন্ত্রনে। এই যাত্রাপথে কবি রচনা করেন ''দুর্বোধ'' কবিতাটি। কবি বলতেন, আমার পেশা জমিনদারী আর নেশা আসমানদারী। রাজশাহীতে তাঁর কোন জমিদারী না থাকলেও আসমানদারীর টানে কবি ছুটে যেতেন সেখানে।

রাজশাহী পৌছে তিনি তিনটি কবিতা লেখেন- 'সুখ' (১৩ চৈত্র), 'ঝুলন' (১৫ চৈত্র) এবং 'সমুদ্রের প্রতি' (১৭ চৈত্র) রাজশাহীতে কমপক্ষে ১৭ চৈত্র পর্যন্ত ছিলেন। এরপর সেখানে থেকে শিলাইদহ এবং শিলাইদহ থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। একমাস কলকাতায় কাটিয়ে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি অর্থাৎ ১৮৯৩ সালের মে মাসের প্রথমেই শিলাইদহ চলে আসেন। ২ মে থেকে ১৬ মে ১৮৯৩ পর্যন্ত ইন্দিরা দেবীকে ৬টি চিঠি লেখেন।

এই চিঠিগুলিতে প্রকৃতি সৌন্দর্যে মুগ্ধতার পাশাপাশি আরেকটি নতুন জিনিস চোখে পরে, তা হলো নিরীহ সরল সাধারণ গ্রামবাসীর আন্তরিক সৌন্দর্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং তাদের অন্তহীন দারিদ্রের প্রতি কবির সচেতনতা। কবির এ অনুভূতির দ্বারা বিশেষভাবে অভিভূত ৯৫ ও ৯৬ সংখ্যক চিঠি দুখানি পড়লে তা বেশ বোঝা যায়। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায় তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে, কোন মতে একটু খানি খিদে ভাঙ্গলেই আবার তখনই সমস্ত ভুলে যায়।[১০] এবারে কবি কলকাতায় ফিরে আসেন জৈষ্ঠের গোড়ার দিকে।

কলকাতায় মাসাধিক কাল থেকে জুনের শেষের দিকে তাঁকে পুনরায় জমিদারীর কাজে যেতে হয় শিলাইদহ, শাহজাদপুর, পতিসরে। প্রথমে গেলেন শিলাইদহে, সেখান থেকে ইন্দিরা দেবীকে প্রথম চিঠি লেখেন ২ জুলাই । ২য় ও ৩য় চিঠি ৩ ও ৪ জুলাই। ৬ তারিখে তিনি শাহজাদপুরের দিকে যাত্রা করেন। শাহজাদপুর থেকে লেখা শেষ চিঠির তারিখ ৩০ আষাঢ় (১০৭ সংখ্যা) । তারপর প্রায় ৪ সপ্তাহ কোনো চিঠি নেই; ১০৮ সংখ্যক চিঠির তারিখ পতিসর ১১ আগষ্ট । লিখেছেন, অনেক গুলো বড়ো বড়ো বিলের মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে । মনে হয়, সেদিনই গিয়ে পতিসরে পৌঁছেন । পতিসর থেকে ইন্দিরা দেবীকে ৩য় ও শেষ চিঠিটি লেখেন সম্ভবত ৩ ভাদ্র । এ চিঠি লেখার দু/এক দিনের মধ্যেই কবি গিয়ে কলকাতায় পৌঁছেন । সেখান থেকে লেখা ছিন্নপত্রাবলীর ১১১ সংখ্যক চিঠির তারিখ ২১ আগষ্ট । এবারকার পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের সময়ে কেবল জমিদার রবীন্দ্রনাথ নয় । বরং কবি রবীন্দ্রনাথকেও বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে । রাজশাহীতে চৈত্র মাসে কবিকে ‘ঝুলন’, ‘সমুদ্রের প্রতি ’ প্রভৃতি কবিতা রচনার এতোকাল পরে পুনরায় পূর্ববঙ্গ সফরকালে কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত দেখি । কবিতাগুলি- ‘ব্যর্থ যৌবন’ (১৬ আষাঢ়); ‘গানভঙ্গ’ (২৪ আষাঢ়); ‘ভরাভাদর’ (২৭ আষাঢ়); ‘প্রত্যাখ্যান’ (২৭ আষাঢ়) ; ‘পুরস্কার’ (৪ শ্রাবণ) এবং ‘বিদায় অভিশাপ’ (৩ ভাদ্র) । শাহজাদপুরে বসে কবি ‘বিদায় অভিশাপ’ কাব্য নাট্যটি লেখা শুরু করলেও শেষ করেন পতিসরে গিয়ে । নৌপথে এই নাট্য কাব্যের মধ্যে পান্ডুলিপিতে হাঁটুর মধ্যে মুখগুঁজে বসা এক পুরুষ মুর্তির পেন্সিল স্কেচ তিনি অঙ্কন করেন । যা দেখে কবির মনে অঙ্কন শিল্পের প্রতি যে একটি দূর্বলতা ছিল তা প্রতীয়মান হয় ।[১১]

১৬ জুলাই ১৮৯৩ অল্প কিছুদিনের জন্য তিনি কলকাতা এসেছিলেন। আবার আগষ্টের ৩ অথবা ৪ তারিখে তাকে শিলাইদহে আসতে হয় । এ পর্বে তিনি ইন্দিরা দেবীকে ১০টি চিঠি লেখেন (ছিন্ন পত্রাবলী, ১৩৮-১৪৭) তার শেষ চিঠি ২৪ আগষ্ট। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে ২৪ অথবা ২৫ তারিখে তিনি কলকাতা ফিরে যান।

সপ্তাহ খানেক কলকাতায় থেকে পুনরায় কবি শাহজাদপুর আসেন । সেখান থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখা প্রথম চিঠি ৫ সেপ্টেম্বর (১৪৯ সংখ্যা) । সেখান থেকে পতিসর এবং পতিসরে প্রথম চিঠি পাওয়া যায় ১০ সেপ্টেম্বর । পতিসর থেকে কবি রাজশাহীতে রওনা হন বন্ধু লোকেন পালিতের কর্মস্থলে। রাজশাহী থেকে তিনি আবার কলকাতায় ফিরে গিয়ে ইন্দিরা দেবীকে চিঠি লেখেন, তার তারিখ ২৯ সেপ্টেম্বর। লোকসাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল ও আগ্রহ আলোচ্য সময়ের দশ বছর আগে থেকেই লক্ষণীয় । এবার শাহজাদপুর পতিসর অঞ্চলে সফরকালে তাঁর উৎসাহ যায় ছড়া ও লোক সাহিত্যের অন্যান্য উপাদান সংগ্রহের দিকে । “বাংলা ভাষায় ছেল ভুলাইবার জন্য যেসব মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছু কাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবিত্ত ছিলাম। আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে সেইটি-ই আমার নিকট অধিকতর আদরনীয় বোধ হইয়াছিল ।”[১২] ছেলে ভুলানো ছড়া (সাধনায় প্রকাশকালে নাম ‘মেয়েলি ছড়া’) নামক একটি প্রবন্ধ এবারে শাহজাদপুরে থাকার সময়ে লেখা ।

১৮৯৪ সালের অর্থাৎ ১৩০০ সনের মাস সংখ্যায় “সাধনা” পত্রিকায় কবির ‘বিদায় অভিশাপ’ কাব্য নাট্যটি প্রকাশিত হয় । এই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের ‘‘রাজসিংহ’’ পরিবর্ধিত সংস্করণ কবির হাতে এসে পরে রবীন্দ্রনাথ প্রতিসরে বসেই রাজসিংহের সমালোচনা লেখেন, এটি সাধনার চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয় । এ সময় পূর্ববঙ্গে রচিত হয় “ব্রাহ্মণ” (৭ ফাল্গুন) এবং পুরাতন ভৃত্য (১২ ফাল্গুন) এই দুটি কবিতা । ৮ ফাল্গুন ১৩০০ তারিখে ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১১৩ সংখ্যক চিঠিতে বোঝা যায় তখনো তিনি প্রতিসরেই ছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি রাজশাহীতে গেলেন বন্ধু লোকেন পালিতের আতিথ্য গ্রহণের জন্য এখানেই ২৩

ফাল্গুন কবি রচনা করেন একটু বিপরীত সুরের কবিতা “এবার ফিরাও মোরে”। এটি তাঁর একটি অন্যতম বিখ্যাত কবিতা। এসময় যখন কবি রাজশাহী পতিসর যাওয়া আসা করছেন তখনি “সাধনা” ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশ পায় “প্রেমের অভিশেখ” কবিতা এবং “সখী আমারি দুয়ারে কেন আসিল” গানটি । ১৫ ফাল্গুন প্রকাশিত হয় ১৬টি গল্প নিয়ে তাঁর ছোট্ট একটি গল্প গ্রন্থ যা প্রকাশের পরপরই পাঠক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।[১৩] জুন, জুলাই, আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর মাস ১৮৯৪ কবি শিলাইদহ শাহজাদপুর, পতিসর অঞ্চলে ঘুরে ফিরে কাটান। আড়াই মাস কলকাতায় থাকার পর তাকে পতিসরে দেখতে পাওয়া যায় জুনের পহেলা দিকে। কবি তাঁর একান্ত প্রিয় বন্ধু বোটটিতে উঠে শান্তির নিঃস্বাস ফেলেন, “ অনেক দিন পরে আমার নির্জন বোটটির মধ্যে এসে আমার ভারী আরাম বোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন বিদেশ থেকে বাড়ী ফিরে এসেছি নির্জনতা যেন আমার গায়ে মাথায় সবার্ঙ্গে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।” এবারে প্রতিসরে থাকাকালে “ ঠাকুরদা (২২ জৈষ্ঠ্য) গল্পটি এবং “দুই বিঘা জমি” কবিতাটি রচনা করেন। সম্ভবত জুনের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে তিনি কলকাতা ফেরেন।

অল্প কিছুদিন পরেই কবি আবার শাহজাদপুর যাত্রা করেন আষাঢ়ের মাঝামাঝি সময়ে । এবারে সাজাদপুর থেকে লেখা ছিন্নপত্রাবলীর প্রথম চিঠি ২ জুন (২১৬ সংখ্যক) এবং শেষ চিঠি (২২০ সংখ্যক) ৯ জুলাই তারিখের । আবার ১০ জুলাই চিঠিটি (২২১ সংখ্যক) শিলাইদহ থেকে লেখা । অর্থাৎ কবি একদিনের মধ্যে শাহজাদপুর থেকে শিলাইদহে ফিরে আসেন। এরপর শিলাইদহ থেকে কলকাতায় ফেরেন ২০ জুলাইয়ের মধ্যেই ।

১৮৯১ থেকে ১৮৯৪ (বাংলা ১২৯৮ থেকে ১৩০১) এই সময়টাকে কেন্দ্র করে শান্তি দেব ঘোষ ‘রবীন্দ্র জীবনে গীত রচনার অজ্ঞাত যুগ’ এই নামে একটি নিবন্ধ রচনা করেন। এই নিবন্ধে তিনি উক্ত সময়ে রচিত গানের তালিকা সাজিয়েছেন। গান গুলো হলঃ-

১। শুধু যাওয়া আসা
২। খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে (১৯ আষাঢ়, শাজাদপুর)
৩। আমার মন মানে না
৪। তুমি নতুন কি তুমি চিরন্তন
৫। ঝড়ো ঝড়ো বরিষে বারিধারা (১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫)
৬। ফিরে এসো ফিরে এসো ।

ওদিকে আমরা শিলাইদহে কবিকে আবার পাই শ্রাবনের শেষে । প্রায় দুইমাস সেখানে ছিলেন এবং এই সময়ে প্রচুর গান তিনি রচনা করেন। কবির ভাষায় মাঝে মাঝে একটি আধটি করে গান তৈরী করছি এবং চৌকিটাতে অকর্মন্য ভাবে বসে গুন গুন করা যাচ্ছে । সুর তুলছি এবং সুখ স্মৃতিময় বিস্বাদ কোমল শরৎ কালের মত কুন্ডলায়িত হয়ে পরেছি ।[১৪] শিলাইদহ থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখা এবারের প্রথম চিঠি (২২৪ সংখ্যক) ছিল ১৪ আগষ্ট এবং শেষ চিঠি (২২৮ সংখ্যক) ২৪ আগষ্ট এর পরবর্তী চিঠি পাওয়া যায় ২০ সেপ্টেম্বর (২২৯ সংখ্যক)। প্রায় মাসখানেক কবির নিশ্চুপ থাকার কারন ঠিক বোঝা যায় না । তবে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত কবি ইন্দিরাদেবীকে মোট ১২টি চিঠি লেখেন (২২৮-২৪০) সংখ্যক।

মজুমদার পান্ডুলিপিতে বিধৃত ২৫টি গানের মধ্যে মাত্র ৪টি গান জোড়াসাঁকোয় রচিত। গানগুলো হলোঃ-

১) উঠরে, মলিন মুখ, রাগ-মুলতান, ২৬ ভাদ্র, ১৩০২ জোড়াসাঁকো
২) (একি) আকুলতা ভুবনে-১৬ কার্তিক জোড়াসাঁকো ১৩০২(স্বর-১০)
৩) তুমি রবে নীরবে-১৮ কার্তিক জোড়াসাঁকো (স্বর-১০)
৪) ওঠে ডাকি-পরজ, ২২ কার্তিক জোড়াসাঁকো (স্বর-১৩)

আর বাকী ২১টি গান শিলাইদহে রচিত ।

১) ওলো সই, ওলো সই-বিভাস-খেমটা, ৫ আশ্বিন ১৩০২ শিলাইদহ (স্বর-৩৫), পৃঃ-৪২।
২) মধুর মধুর ধবনি বাজে -ভূপালি কাওয়ালি, ৬ আশ্বিন ১৩০২ শিলাইদহ (স্বর-১০) পৃঃ-৪৩।
৩) বেলাগেল তোমার পথ চেয়ে-পূরবী একতালা, ৮ আশ্বিন১৩০২ শিলাইদহ (স্বর-১০)পৃঃ ৪৪।
৪) বিশ্ববীনা রবে বিশ্বজন-শঙ্করাভরণ, ঝাপতাল, ৪ এবং৯ আশ্বিন (স্বর-৫০) পৃঃ-৪৫-৪৭ ।

৫) আহা আজি মোর -দেশ পঞ্চম সওয়েরী (রচনার স্থানও তারিখ উল্লেখ নেই) (স্বর-৫০) ।
৬) কে দিল আবার আঘাত-কেদারা কাওয়ালী, ১২ আশ্বিন,১৩০২ শিলাইদহ (স্বর-১১) পৃঃ ৫৭ ।
৭) এসো গো নতুন জীবন-১৩ আশ্বিন ১৩০২ (স্বর-?) পৃঃ-৪৮ ।
৮) পুষ্পবনে পুষ্প নাহি-কালাংড়া, ১৪আশ্বিন ১৩০২(স্বর-১০) পৃঃ-৪৮ ।
৯) আহা জাগি পোহাল-বিভাবরী-রামকেলী, ১৫আশ্বিন (স্বর-৫০)পৃঃ-৪৯ ।
১০) ওহে অনাদি অসীম সুনীল-১৬ আশ্বিন (স্বর-?) পৃঃ-৫০ ।
১১) তোমার গোপন কথাটি-১৮ আশ্বিন (স্বর-১০) পৃঃ-৫১ ।
১২) চিত্ত পিপাসিত রে-২৩ আশ্বিন (স্বর-১০) পৃঃ-৫১-৫২ ।
১৩) আমি চিনি গো চিনি-১৫ আশ্বিন (স্বর-৫০) পৃঃ-৫২ ।
১৪) আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল-২৯ আশ্বিন (স্বর-৫১) পৃঃ-৫২-৫৩ ।
১৫) ওগো ভাগ্যদেবী পিতামহী - ভূপালী - খেমটা, ১ কার্তিক (স্বর-৫১)পৃঃ-৫৪ ।
১৬) সে আসে ধীরে- দেশ একতালা, ২১ কার্তিক (স্থানের উল্লেখ নেই) (স্বর-১০) ।
১৭) ওহে সুন্দর মম - খাম্বাজ-একতালা,২৩ কার্তিক (স্বর-১০) ।
১৮) তুমি যেওনা এখনি-কাওয়ালী, ২৪ কার্তিক (স্বর-১০) ।
১৯) আকুল কেশে আসে- কাওয়ালী , ২৫ কার্তিক ।
২০) হৃদয় শশী হৃদী গগণে-২৯ কার্তিক (স্বর-৪) ।
২১) কী রাগিনী বাজালে হৃদয়ে-সিন্ধু কানাড়া, ২৯ কার্তিক (স্বর-১০) ।

কবি যখন প্রতিদিন গান রচনার নেশায় মগ্ন এ সময় কবি পত্নীও শিলাইদহে গিয়ে উপস্থিত হন । ১৩০২ সনের ১৯ আশ্বিন । পুত্র রথীন্দ্রনাথের "পিতৃস্মৃতি" গ্রন্থে আমরা অমলাদেবী সম্পর্কে জানতে পারি , তিনি ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশের ভাগ্নী । তার অসাধারণ গায়কী প্রতিভা দেখে রবীন্দ্রনাথ তাকে রাধিকা গোস্বামীর কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীত শিখতে পাঠান এবং কবি নিজেও তার গলার উপযোগী করে গান বাঁধেন । যেমন ঃ- চিরসখা, ছেড়ো না মোরে । অমলাদেবী ছিলেন প্রথম রবীন্দ্রসংগীত মহিলা শিল্পী যিনি কবির গান রেকর্ড করেন (H.M.V) অমলাদেবীর উৎসাহে কবি শিলাইদহে প্রচুর গান রচনা করেছেন। জানা যায় কবি পত্নীর সাথে তার খুব ভাব ছিল । অমলাদেবী শিলাইদহেও এসেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৬ অক্টোবর লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রে - "...... রাত্রি যদিও গভীর ছিল কিন্তু নিস্তব্ধ ছিল না, কারন আমার পাশের বোট থেকে আমার দুই প্রতিবেশিনী বিছানায় পড়ে পড়ে হাস্যলাপ করছিলেন ।"[১৫] মৃনালিনী দেবী ও অমলাদেবী হলেন পত্রের সেই দুই প্রতিবেশিনী। শিলাইদহে থাকাকালে অমলাদেবী গান গেয়ে, গান শুনিয়ে এবং সর্বোপরি তার গান শেখবার আগ্রহ রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে গান লিখতে উৎসাহিত করে। রবীন্দ্রনাথ কার্তিক মাসে কলকাতায় চলে এলেও অগ্রহায়ণ মাসের শুরুতে আবার পূর্ববঙ্গে চলে আসেন। প্রথমে পতিসর হয়ে তিনি শাহজাদপুর আসেন, তারপর শাহজাদপুর থেকে শিলাইদহ, শিলাইদহ থেকে আবার শাহজাদপুর এবং শেষে শাহজাদপুর থেকে শিলাইদহ আসেন। এই পর্বের ২৪১ সংখ্যক ছিন্নপত্রটি ২২ নভেম্বর এবং ২৫২ সংখ্যক পত্র ১৫ ডিসেম্বর লিখিত। ১৭ ডিসেম্বরের পরে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন বোলপুরে পৌষউৎসবে যোগদানের উদ্দেশ্যে ।

এবারে উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ কালে কবি চিত্রা কাব্যের শেষ পর্বের কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা রচনা করেন। এতো অল্প সময়ের ব্যবধানে এতোগুলি উল্লেখযোগ্য কবিতা রচনা রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও অসাধারণ। কবিতাগুলি হলো-"পূর্ণিমা"(১ ডিসেম্বর), "চিত্রা"(৩ ডিসেম্বর), আবেদন (৭ ডিসেম্বর), 'উর্বশী'(৮ ডিসেম্বর), 'স্বর্গ হতে বিদায়' (৯ ডিসেম্বর), 'দিনশেষে' (১৫ ডিসেম্বর), "সান্তনা" (১৬ ডিসেম্বর), ও " শেষ উপহার" (১৭ ডিসেম্বর)

শান্তি নিকেতনে পৌষউৎসব এবং মাঘোৎসব সমাপন করে মাঘের শেষে কবি শিলাইদহ আসেন। আগের বারের মতো এবারেও জমিদারী তদারকির পাশাপাশি ফল্গুধারার মতো কাব্যরচনার স্রোত অব্যাহত। এসময় রচিত কবিতাসমূহ ১। 'জীবন দেবতা' (২৯ মাঘ), ২। 'রাত্রে ও প্রভাতে' (১ ফাল্গুন), ৩। '১৪০০ সাল' (২ ফাল্গুন), ৪। 'নীরব তন্ত্রী' (৩ ফাল্গুন), ৫। 'দুরাকাঙ্খা' (৪ ফাল্গুন), ৬। 'ধুলি' (১৫ ফাল্গুন) ও 'সিন্ধুপারে' (২০ ফাল্গুন)।

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে, ২০ ফাল্গুনের পরে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসেন। কিন্তু ‘মজুমদার পান্ডুলিপিতে’ ‘সিন্ধুপারে’ কবিতার প্রথম খসড়ার নীচে তারিখ দেওয়া আছে ২০ ফাল্গুন, সোমবার, জোড়াসাঁকো. ১৩০২। এখানে জোড়াসাঁকো ভুল করে লেখা না হয়ে থাকলে বলতে হয় হয়তো এ দিনই তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। তবে ফাল্গুনের(১৩০২) শেষের দিকে “চিত্রাকাব্য” প্রকাশিত হয়। সুতরাং এ সময় নিশ্চিত ভাবে তিনি কলকাতায় ছিলেন। ২৯ ফাল্গুনের শেষে অবশ্যই ২০ তারিখের পরে চিত্রাকাব্য প্রকাশিত হবার পরে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় শিলাইদহ গমন করেন। ৬ চৈত্র সেখানে থেকে তিনি ব্যারিষ্টার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়কে একটি চিঠি লেখেন। চৈত্রের মাঝামাঝি শিলাইদহ থেকে যান পতিসরে। এবারকার পতিসরে লেখা শেষ কবিতার তারিখ ২ বৈশাখ। এর দু'তিন দিনের মধ্যে তিনি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। আগের দুবারের মতো এবারেও শিলাইদহে এসে তিনি কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হন। প্রকৃতপক্ষে, ১১চৈত্র থেকে ২ বৈশাখ কবি প্রায় অবিশ্বাস্য সংখ্যক মোট ৫৪ টি কবিতা লেখেন। এ কবিতাগুলি সবই চৈতালির অন্তর্গত।

২ বৈশাখের পর রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় চলে আসেন। পুরো তিন মাস পর শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহেই তিনি শেষবারের মত শাহজাদপুর আসেন। এরপর শাহজাদপুর পরগনা ঠাকুরবাড়ীর অন্য অংশীদারের ভাগে চলে যায়। আর রবীন্দ্রনাথও সেই দায়িত্বভার থেকে মুক্ত হন। শ্রাবনের ৭ থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত তিনি সেখানে ছিলেন এবং এ সময়ে রচিত হয় আরো ২১টি কবিতা। শাহজাদপুর দায়িত্ব অব্যহতির পূর্বে ও পরে রবীন্দ্রনাথ শাহজাদপুর ও ইছামতি নদীর নৈসর্গীক সৌন্দর্যের কথা বিভিন্ন পত্রে ও কবিতায় উল্লেখ করেছেন।

শ্রাবণ মাসে শাহজাদপুর থেকে কলকাতায় ফিরে আসার পর দীর্ঘদিন কবি পূর্ববঙ্গে আসেননি। পরের বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে কবিকে আবার দেখা যায় শিলাইদহে। তবে এর মধ্যে তিনি বাংলাদেশ এসেছিলেন কিনা তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। এবারে ১৩০৪ সালের জৈষ্ঠ্য মাসে রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র জমিদারী কাজে শিলাইদহে আসেননি। ১১ জুন ১৮৯৭ সালে নাটোরে প্রাদেশীক কংগ্রেসের সম্মিলন হওয়ার কথা ছিল, যার সভাপতি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সম্মিলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে কবি শিলাইদহে আসেন এবং এই সময় রচিত হয় ‘পসারিনী’ কবিতাটি। কবি শিলাইদহ থেকে নাটোরে আসেন। এই সম্মিলন সভায় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে তাহল, অবনীন্দ্রনাথ ও অপর কয়েকজন যুবক নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নাটোর সম্মিলনের কাজ বাংলায় পরিচালনা করার চেষ্টা করেন। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইংরেজী বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ পাঠ করে সেই সময়ে পরিপ্রেক্ষিতে রীতিমতো একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেন। বাংলা ভাষা প্রবর্তনের জন্য পরের বছর ঢাকা সম্মিলনীতেও কবি সচেষ্ট হয়েছিলেন।

নাটোর থেকে কলকাতায় ফেরার পর তিন মাস কবি কলকাতায় অবস্থান করেন। ভাদ্র মাসের ২৮ তারিখে জমিদারী কাজের জন্যই তিনি পতিসরে আসেন। তবে জমিদারীর কাজে এলেও কেবল হিশেব নিকেশ, জমাওয়াশিল নিয়ে ব্যস্ত থাকেননি, বরং পদ্মা-যমুনা-বড়ল-নাগর নদীতে ভ্রমণকালে কখনো ঝড় বৃষ্টির কখনো শরৎ আলোর হাতছানিতে একটার পর একটা গান রচনা করেন। এবারে শিলাইদহে পরিবারসহ বাস করছেন কি না এবং অমলাদেবীও প্রেরণা যুগিয়েছেন কি না এ সম্বন্ধে অধিক তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘পিতৃস্মৃতি’ থেকে জানা যায়- ‘‘লেখার ফাঁকে ফাঁকে যখন বাবাকে গানে পেয়ে বসত- অমলাদিদিকে কলকাতা থেকে নিয়ে আসতেন। দিনের বেলায় অমলা দিদি মায়ের সঙ্গে রান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ----সন্ধ্যে হলেই অন্যসব কাজ ফেলে গান শোনাবার জন্য সবাই সমবেত হতেন। -----সুরেন দাদার হাতে এসবাজ থাকত। জলিবোট খুলে মাঝ -দরিয়ায় নিয়ে গিয়ে নোঙ্গর ফেলে রাখা হত। তারপর শুরু গান, পালা করে বাবা ও অমলা দিদি গানের পর গান গাইতে থাকতেন। -------সেসব রাত আজ স্বপ্নের মত মনে হয়, কিন্তু আজও যখন -বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে --, তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা প্রভৃতি গান শুনি, সেইসব রাত্রির কথা মনে পড়ে যায়।'[১৬] ২৮ ভাদ্র থেকে ১৩ ই আশ্বিনের মধ্যে রচিত মোট গানের সংখ্যা ১৫ টি। গানগুলি হলো-

১। বৃথা গেয়েছি বহুগান (মিশ্র কানাড়া) ২৮ ভাদ্র, ১৩০৪ (স্বর-?) মজুমদার পান্ডুলিপি পৃঃ ৭৯।
২। কেন বাজাও কাঁকন কনকন, ৬ আশ্বিন (স্বর-১৩) পৃঃ-৭৯-৮০।
৩। হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগণে (৬ আশ্বিন/ইছামতি, ঝড় বাদলা) স্বর-১১ পৃঃ ৮০।

৪। এবার চলিনু তবে (৭ আশ্বিন/১৩০৪, ইছামতি) (স্বর-?) ।
৫। যামিনী না যেতে জাগালে না (৭ আশ্বিন, ১৩০৪/যমুনা নদী) (স্বর-৫০) পৃঃ-৮৩ ।
৬। বন্ধু কিসের তরে অশ্রুঝরে (৭ আশ্বিন, ১৩০৪, বড়াল নদী) (স্বর-?) পৃঃ-৮৪ ।
৭। আমি কেবলি স্বপন করেছি (বেহাগ, ঝাপতাল, ৮ আশ্বিন) (বলেশ্বরী (স্বর-৫১) পৃঃ ৮৫ ।
৮। ভালবেসে সখী কোমল যতনে (৮ আশ্বিন, ১৩০৪ সাহাজাদপুর) (স্বর-৫৬) পৃঃ ৮৬-৮৭ ।
৯। তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা (ইমন কল্যাণ, ৯ আশ্বিন, চলনবিল, ঝড়বৃষ্টি) (স্বর-১০) পৃঃ-৮৭-৮৮
১০। যদি বারন কর তবে (ছায়ানট, ৯ আশ্বিন, চলনবিল/দিনে দু'তিনবার করে ঝড় হচ্ছে, বোট টলমল) (স্বর-১০) পৃঃ ৮৯ ।
১১। আমি চাহিতে এসেছি (কালাংড়া, ১০ আশ্বিন, নাগরনদী) (স্বর-১০) পৃঃ-৯০।
১২। সখি প্রতিদিন হায় (আলেয়া, ১০, নাগরনদী) স্বর-৫০) (মেঘ/বৃষ্টি/শনিবার/আমাবস্যা। পৃঃ ৯১
১৩। বিধি ডাগর আঁখি (ভৈরবী, ঝাপতাল, ১০ আশ্বিন, নাগরনদী,ধানের খেতের ভিতর স্বর-৫১)পৃঃ ৯১
১৪। বঁধু মিছে রাগ কোরো না (বারোঁয়া, মুলতান, ১০ আশ্বিন, পতিসর) (স্বর-৩২) পৃঃ-৯৩ ।
১৫। ওগো কাঙ্গাল আমারে (১২ আশ্বিন, পতিসর) (স্বর-৩৫) পৃঃ ৯৪। এই পর্যায়ে ১৩ ই আশ্বিন ১৩০৪ তারিখে কবি কলকাতায় ফিরে যান।

এই শরৎকালীন ভ্রমনের পরে, কবি বোধহয় অনেকদিন পূর্ববঙ্গে আসেননি । প্রায় বছর খানেক পর ১৩০৫ সালে (১৮৯৮, ৩০ মে) নাটোরের পর এবার ঢাকায় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মিলনে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে পথে শিলাইদহে আসেন বৈশাখের মাঝামাঝি সময়ে, এই সময় সম্ভবত ঢাকায় যাবার তাড়া থাকায় কবি বিশেষ কিছু লেখার দিকে মনোযোগ দেননি। ঢাকায় কনফারেন্স শেষ করে তিনি শিলাইদহে ফিরে আসেন জুনের ৩/4 তারিখে । এসময় তিনি মৃনালিনীদেবীর একটি চিঠি পান। চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন, একান্নবর্তী পরিবারে বাস করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর মাঘোৎসব শেষ করে প্রায় আট মাস পর তিনি স্ত্রী, পুত্র, কন্যাসহ জোড়াসাঁকো থেকে শিলাইদহে চলে আসেন এবং সপরিবারে দুই বছর সেখানে স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন। ''জোড়াসাঁকোতে একটি বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে বাস করাই এ যাবৎ ঠাকুরবাড়ীর রীতি ছিলো। দেবেন্দ্রনাথের পুত্রদের মধ্যে কেবল সত্যেন্দ্রনাথ রীতিমতো এবং জ্যোতিরীন্দ্রনাথ অংশত এ নিয়ম ভঙ্গ করেছিলেন । কলকাতা থেকে অনেক দূরে বাস করতেন এবং স্বাতন্ত্রের বিশেষভাবে অভ্যস্থ ছিলেন বলেই, সত্যেন্দ্রনাথ তা করেছিলেন। যদিও রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে সপরিবারে শিলাইদহে বাস করা কিছুটা অস্বাভাবিক বলেই তখন অনেকের মনে ধারনা হয়েছিল। আরেকটি ব্যাপার হল, এবার জোড়াসাঁকো ছাড়ার পরে, রবীন্দ্রনাথ সত্যিকার অর্থে সেখানে আর স্থায়ীভাবে কখনো বসবাস করেননি। [১৭]

ঠিক করে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের বাড়ীতে গিয়ে সপরিবারে ওঠেন, তা পরিস্কার বলা না গেলেও মোটামুটি ধারনা করা যায় যে, ১৮৯৮ সালের জুন মাসে তিনি স্ত্রীর চিঠি পেয়েছিলেন তার ৮ মাস পর ধরলে ১৮৯৯ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষে অথবা মার্চের প্রথমে তারা শিলাইদহে যান এবং ১৯০১ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত তারা শিলাইদহেই ছিলেন। যদিও নতুন লেখা পড়ে শোনানোর জন্য, কখনো বই প্রকাশ উপলক্ষ্যে, কখনো সাহিত্য সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে, কখনো পিতার কিংবা অন্য আত্নীয়ের অসুস্থতাবশত রবীন্দ্রনাথ কয়েকবার কলকাতা, বোলপুর, এলাহাবাদ, দার্জিলিং প্রভৃতি স্থানে গেছেন, কিন্তু মূল বন্ধনটা ছিল শিলাইদহের সঙ্গেই । এসব জায়গায় গেলেও কবি বেশী দিনের জন্যে যাননি। শুধু দু'বার কলকাতায় অন্যান্য বারের তুলনায় একটু বেশী দিন ছিলেন। প্রথমবার ১৩০৬ সালে প্রায় পুরো বৈশাখ মাস, দ্বিতীয় বার ১৩০৭ সালের অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাস। এসময় তিনি মৃণালিনী দেবীকে কলকাতা থেকে বেশ কিছু চিঠি লেখেন, যার কোন কোনটিতে তারিখ উল্লেখ নেই, কিন্তু মাসের উল্লেখ আছে। প্রথম চিঠিটিতে তারিখ নেই, কিন্তু মাসের উল্লেখ আছে- নভেম্বর, এরপর ২১ ডিসেম্বর থেকে ১৯ জানুয়ারী পর্যন্ত মোট ৬ টি চিঠিতে তাঁর কলকাতায় অবস্থানের প্রমান পাওয়া যায় । ৩১ জানুয়ারীর চিঠিটি আবার এলাহাবাদ থেকে লেখা।

বিভিন্ন কাজের ব্যস্ততা সত্ত্বেও এই দু'বছর ছিল রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল পর্যায়ের অন্যতম, কবিতা ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক রচনা এমনকি কৃষি বিষয়ক পরীক্ষা নিরীক্ষায় তিনি এসময়ে অত্যন্ত সচেষ্ট হয়েছিলেন, নৈবেদ্য, কথা ও কাহিনী, কনিকা, কল্পনা, ক্ষনিকা, কয়েকটি ছোটগল্প এবং প্রবন্ধ, উপন্যাস-

চোখের বালি, রম্য নাটক-চিরকুমার সভা ইত্যাদিতে সাহিত্যকলার সকল শাখায় তাঁর বিচরণ এবারে লক্ষ্য করা যায়।

সপবিরারে পল্লীর নিভৃতে যে নীড় রচনা করেছিলেন, নানা কারণে দু'বছরের মধ্যেই সে জায়গার পাট চুকিয়ে দিতে হয়। যদিও জোড়াসাঁকোর একান্নবর্তী পরিবার থেকে মৃণালিনী দেবী বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শিলাইদহের জীবনও তার কাছে নির্বাসন মনে হতে লাগলো । এছাড়া, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া আর বড় দু'মেয়ের বিয়ে নিয়েও তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। সর্বোপরি বোলপুরে ব্রাহ্ম বিদ্যালয় স্থাপনের কারনে রবীন্দ্রনাথকে সেখানেই বেশী ব্যস্ত থাকতে হয়। এসব কারনে ১৯০১ সালের মাঝামাঝি অর্থ্যাৎ ১৩০৮ সালের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের বাস গুটিয়ে নেন।

সপরিবারে শিলাইদহ ত্যাগ করার পর ১৩০৮ সালে আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত কবি নানা কাজে কলকাতা, বোলপুর ও দার্জিলিং-এ ঘোরাঘুরিতে ব্যস্ত ছিলেন। তবে ২১ মে জগদীশ চন্দ্র বসুকে লেখা এক পত্রে জানা যায় যে, মে মাসে একবার তিনি শিলাইদহ ভ্রমণ করে গিয়েছেন ।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিন অথবা আষাঢ়ের প্রথম দিনে রবীন্দ্রনাথের বড় মেয়ের বিয়ে হয়। বিয়ের পর জমিদারীর কাজে কবিকে আবার শিলাইদহে আসতে হয়। তবে এবারে কবি বোটে না থেকে কুঠিবাড়ীতে ওঠেন। সপরিবারে দীর্ঘদিন এই বাড়ীতে বাস করার পর লোকশুন্য এই বাড়ীতে একাকী কবির মন বড়ই বিরহাকুল হয়ে উঠেছিল। মৃণালিনী দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে (৩০ সংখ্যক পত্র) আমরা তা জানতে পারি। কবি এই আর্দ্র মনেই "নববর্ষা" প্রবন্ধটি রচনা করেন। অবশ্য কবি বেশী দিন শিলাইদহে থাকেননি। সম্ভবত আষাঢ়ের শেষ দিকেই তিনি কলকাতা ফেরত যান।

রবীন্দ্রনাথের মেঝ মেয়ের বিয়ে হয় ২৪ শ্রাবণ । এর আগে অথবা পরে হয়তো কবি পূর্ববঙ্গে এসে থাকবেন কিন্তু তার কোন প্রমান পাওয়া যায়না । তবে কার্তিক মাসে আগরতলা ভ্রমণ উপলক্ষ্যে তিনি পূর্ববঙ্গে এসেছিলেন তা সঠিক বলা যাচ্ছে না । তবে অগ্রহায়ন মাসে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়েছিলেন। কারণ এসময়ে তিনি আগরতলার মহারাজা ব্রজ কিশোরকে একটি চিঠি লিখেছিলেন।

১৩০৮ সালের পৌষ উৎসবের সময় থেকে শুরু করে পরবর্তী আষাঢ় (১৩০৯) মাস পর্যন্ত মৃণালিনী দেবী সম্ভবত আবার শিলাইদহে গিয়েছিলেন। এসময়ে রবীন্দ্রনাথ বেশীর ভাগ সময়ই বোলপুরে ব্রাহ্ম বিদ্যালয় স্থাপনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। শিলাইদহে থাকতেন খুব কম। তবে বিভিন্ন জনের কাছে লেখা চিঠিপত্র থেকে প্রমান হয়-ফাল্গুনের মাঝামাঝি, চৈত্রের শেষদিকে, বৈশাখের মাঝামাঝি ও জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি সময়ে তিনি শিলাইদহে ছিলেন। এই চিঠিপত্রের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা চিঠিগুলো । এই চিঠিগুলোর তারিখ- শিলাইদহ ১৬ ফাল্গুন, ২৬ চৈত্র, ১৩ বৈশাখ ও ১২ জ্যৈষ্ঠ । জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ থেকে শুরু করে। পুরো আষাঢ় মাসটা শিলাইদহে কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ শ্রাবণ মাসে আবার সপরিবারে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। শ্রাবণ মাসের শেষ দিক পর্যন্ত কবি শান্তিনিকেতনেই ছিলেন। কারণ ১৩ শ্রাবণ শান্তিনিকেতন থেকে এবং ১৬ শ্রাবণ আলমোরা থেকে তিনি ব্রজকিশোরকে দুটো চিঠি লেখেন। এরপর তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং নানা সাংসারিক কাজ কর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এদিকে অগ্রহায়ণ মাসে মৃণালিনী দেবী মারা যান। এই সময়ে তিনি শান্তিনিকেতন-কলকাতা, কলকাতা-শান্তিনিকেতন ঘোরাঘুরির কাজে ব্যস্ত থাকেন। তবে মাঘ মাস পর্যন্ত তিনি বেশ কিছুদিন শান্তিনিকেতনেই ছিলেন। এসময়ে শান্তিনিকেতনে লেখা একগুচ্ছ কবিতাই তাঁর অবস্থানের প্রমান করে। মাঘ মাসের প্রথমদিকে তিনি শান্তিনিকেতন থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং নানা কাজে কলকাতা, হাজারীবাগ, আলমোরা প্রভৃতি স্থানে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

পরের বছর কন্যার মৃত্যুতে তিনি অনেকটা ভেঙ্গে পড়েন। এদিকে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় পরিচালনা কাজে নানা জটিলতা দেখা দেয়ায় কবিকে অত্যন্ত ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন থাকতে দেখা যায়। তাই ১৩১০ সালের শেষ দিক পর্যন্ত কবিকে পূর্ববঙ্গে আসতে দেখা যায় । এবছর পৌষ উৎসবের আগে একবার কবি শিলাইদহে গিয়ে কিছুদিন থাকেন। আবার পৌষ উৎসবে যোগ দেয়ার জন্য শিলাইদহ থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন, উৎসব শেষে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আবার শিলাইদহে ফিরে আসেন । অবশ্য বেশী দিন থাকতে পারেননি, কারণ মাঘোৎসবে যোগ দেয়ার জন্য ৯ মাঘ তাকে আবার কলকাতায় আসতে হয়।

মাঘোৎসবের পরে কবি আবার শিলাইদহে প্রত্যাবর্তন করেন। এসময়ে শান্তিনিকেতনে হঠাৎ বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় । শান্তিনিকেতনের ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায় এই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এই রোগ অন্যদের মধ্যে সংক্রামিত হবার ভয়ে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম বিদ্যালয়কে শিলাইদহে নিয়ে আসেন। (১৩১১ এর ১৫ বৈশাখ) গ্রীষ্মের ছুটির আগ পর্যন্ত শিলাইদহেই বিদ্যালয়ের কাজ চলতে থাকে । অবশ্য ছুটির পরবর্তী ক্লাশ শান্তিনিকেতনেই আবার শুরু হয় । তবে যতোদিন শিলাইদহে বিদ্যালয়টি ছিল ততদিন কবি শিলাইদহেই ছিলেন। শুধু ফাল্গুনের শেষে মহর্ষির অসুস্থতার খরব পেয়ে কলকাতা গিয়ে ছিলেন এবং চৈত্রের শেষেই তিনি ফিরে আসেন । ২২ জুলাই কবি কলকাতায় তাঁর ''স্বদেশী সমাজ'' প্রবন্ধটি প্রথম পাঠ করে শোনান।

এরপর বছরখানেক কবি পূর্ববঙ্গে এসেছিলেন কিনা তা সঠিক জানা যায় না । এসময় বঙ্গভঙ্গ করা হবে এরকম একটি আলোচনা শুরু হয়েছে। এদিকে যারা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী তাদের মধ্যেও একটি অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে এ অসন্তোষ একটি বড় আকারের আন্দোলনের রূপ নেয় । কবিও নিজেকে এ আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জড়িয়ে ফেলেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান এ সময় আন্দোলনের প্রেরণা সৃষ্টি করে। ১৯০৩ সালের ৩ ডিসেম্বরের গেজেটে বঙ্গভঙ্গের সংবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় । এর প্রায় ২ বছর পরে ১৯০৫ সালের ১৫ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয় । বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সরূপ রাখিবন্ধন, বয়কট ইত্যাদি কর্মসূচীতে জনগন উৎসাহের সাথে অংশগ্রহন করেছিল । যার অনেক খানিই রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ উৎসাহের ফল । এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ ভিত্তিক যেসমস্ত গান লিখেছিলেন তা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিশেষ প্রেরণা জাগিয়েছিল । এই সময়কার গানগুলিতে কবি পূর্ববঙ্গ বাসের অভিজ্ঞতাগুলিকে কাজে লাগিয়ে ছিলেন । বাংলার বাউল, ভাটিয়ালী, সারি, প্রভৃতি গানের কথা ও সুরের সহজ ভাব কবি এসময়কার গান গুলোতে প্রয়োগ করেছিলেন । আর এজন্যেই গানগুলি সাধারণ মানুষের হৃদয়ে পৌঁছেছিল। যেমন- "আমার সোনার বাংলা", "ও আমার দেশের মাটি", "আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে" ইত্যাদি। বাংলা লোকসঙ্গীতের সুরের মিশ্রণের ফলে শুধু পশ্চিমবঙ্গে কিংবা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়েই নয়, পূর্ববঙ্গের মানুষের কাছেও বিপুল ভাবে সমাদৃত হয়েছে। এমনকি স্বাধিকার আন্দোলনে গনজাগরনের পথিকৃত হিসেবে দেখা যায় এ গানগুলিকে। এদের মধ্যে '' আমার সোনার বাংলা'' -গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের আসন অধিকার করে। উল্লেখ্য এক শতাব্দী পরেও এই গানটি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বলে বিবেচিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের এসময়কার সঙ্গীত সৃষ্টি বিষয়ে একটি জিনিস লক্ষণীয় যে, স্বদেশ প্রেমের গানগুলির বানী ও সুর পূর্ববঙ্গের লোকসঙ্গীতের সুর ও প্রকৃতি মিশে থাকলেও কোন গানই পূর্ববঙ্গে রচিত নয়।

কিন্তু দেশের কর্ম, জাতীয়তাবোধ এবং আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর যে, আদর্শ ছিলো, রাখি বন্ধনের অব্যাবহিত পরেই, রবীন্দ্রনাথ বুঝলেন জনস্রোতের ধারনা তাঁর থেকে সতন্ত্র। ------এ কারনে, কলকাতার রাজনীতি সম্পৃক্ত আবহাওয়া তাঁর কাছে অসহ্য বোধ হলো।[১৮] তাই অগ্রহায়ণ মাসের দিকে, তিনি শিলাইদহে চলে আসেন, পল্লীর নিভৃতে আপন আদর্শকে রূপায়িত করার উদ্দেশ্য এরপর প্রায় চারমাস কাটে কখনো শিলাইদহে, কখনোও কলকাতায় আবার কখনো কখনো বোলপুরে।

রবীন্দ্রনাথ খুব কাছে থেকে তাঁর প্রজাদের দেখেছিলেন এবং তাদের দুঃখ দারিদ্রের পরিমান সম্পর্কে সচেতন হতে পেরেছিলেন। স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধ রচনার পর থেকে সত্যিকার স্বদেশ এবং জনগনের জন্য কী করা উচিত সে বিষয়ে একটি সম্যক ধারনা জন্মে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট পরিনামহীন উত্তেজনায় হতাশ হয়ে কবি আপন জমিদারীর মধ্যে সেই কাজ করতে উদ্যোগী হন । পল্লী পূনঃগঠন ও চাষাবাদের উন্নতির জন্য কৃষি ও গোষ্ট বিদ্যায় পারদর্শি লোকের প্রয়োজন অনুভব করে কবি পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং বন্ধু পুত্র সন্তোষ মজুমদারকে ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে আমেরিকায় পাঠালেন উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে। এদের বিদায় দিয়ে কবি আবার শিলাইদহেই ফিরে গিয়েছিলেন।

কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল বরিশালে বাংলা নববর্ষের দিনে এবং সেই সঙ্গে একটি প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মিলন বসার কর্মসুচিও নির্ধারিত ছিল । এই সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতিত্ব করবার কথা ছিল রবীন্দ্রনাথের । সম্মিলনে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে কবি শিলাইদহ হয়ে আগরতলা গমন করেন । তারপর আগরতলা থেকে কুমিল্লা হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তিনি রবিশাল

পৌছেঁ ছিলেন । কিন্তু ইংরেজ সরকারের অত্যাচারের ফলে কোন রাজনৈতিক বা সাহিত্যিক কর্মকান্ড অনুষ্ঠিত হতে পারেনি । দু-এক দিন কবি নৌকাতেই ছিলেন এবং সম্মিলন বাতিল হওয়ায় বরিশাল থেকে ফেরত আসেন ।

কবির তৃতীয় কন্যা মীরা দেবীর বিয়ে হয় ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪ সন । বিয়ের পর মেয়ে জামাইকে নিয়ে কবি আবারও বরিশাল গিয়েছিলেন । সেখানকার সাহিত্য সেবীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি শাখা বরিশালে স্থাপনের ব্যাপারে তাদের উৎসাহিত করেন । বরিশাল থেকে তারা শিলাইদহে আসেন এবং সম্ভবত চট্রগ্রাম পর্যন্ত গিয়েছিলেন বলে জানা যায় । এ বছরই (১৯০৯ সালে) শরৎকালে কয় দিনের জন্যে তাকে শিলাইদহে পাওয়া যায় । তবে বিশেষ কিছু রচনা লক্ষ্য করা যায় না। মুলত বৈষয়িক কাজেই তিনি ব্যস্ত থাকেন -তবে পদ্মার কলুষ মুক্ত- আবহাওয়ায় তিনি শারিরীক ভাবে খুবই আরাম বোধ করেন। এ সময় কবি কবে কলকাতা ফেরত গিয়েছিলেন তা সঠিক ভাবে বলা যাচ্ছে না।

অল্প কালের মধ্যেই কবিকে শিলাইদহে আবার ফিরে আসতে হয়। উদ্দেশ্য ছিলো প্রকৃতির নিভৃত কোলে লুকিয়ে পরা । অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহে কবির কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথ মৃত্যু বরন করেন। এই মৃত্যু কবির হৃদয়ে গভীর ভাবে আঘাত হানে, এই মৃত্যু শোক স্তিমিত করার জন্যেই কবি হয়তো কিছুদিন একাকী থাকতে চেয়েছিলেন। নগরের কোলাহল থেকে দূরে পল্লীর শান্ত পরিবেশে বাস করে তিনি এ শোক থেকে আরোগ্য লাভ করতে চান। এবারে একাধারে পাঁচ মাস তিনি শিলাইদহে ছিলেন । শুধু তিন-চার দিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন মাঘোৎসবে যোগদানের উদ্দেশ্যে, আর ১১ ফেব্রুয়ারী প্রাদেশিক কনফারেন্সের সভাপত্বি করার কথা থাকায় দু-তিন দিনের জন্য একবার পাবনা গমন করেন। এসময় তিনি "গোরা" উপন্যাস ও অল্প কিছু গান রচনা করেন।

১৯১০ সালের শ্রাবণ মাসের শুরুতে প্রথমে পতিসর এবং পরে শিলাইদহ ঘুরে এ মাসেরই শেষের দিকে কলকাতা ফিরে যান। এ সময়কার আসা এবং যাওয়ার সঠিক দিনক্ষণ জানা যায় না।

কলকাতা ও শান্তিনিকেতন প্রায় দু'মাস কাটাবার পর আশ্বিন মাসের শেষ দিকে তিনি আবার ফিরে আসেন শিলাইদহে পদ্মার কোলে । সম্ভবত সপ্তাহ দু'য়েক কবি শিলাইদহে ছিলেন। পূজোর ছুটির পর কার্তিকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়েছিলেন। এসময় কবি পল্লী-উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ব্যস্ত ছিলেন। "গোরা" উপন্যাস এ সময়েও লেখা চলছে।

পরের বছর বর্ষাকালে কবি আবার পূর্ববঙ্গে আসেন। এবারকার ভ্রমণে কিঞ্চিত মতান্তর পাওয়া যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, কবি শিলাইদহে এসেছিলেন শ্রাবণের শেষে। আবার কাদম্বিনী দেবীকে লেখাপত্রে পাওয়া যায়, তিনি অন্তত আষাঢ়ের শেষ দিকে এসেছিলেন। চিঠির তারিখ ২৮ আষাঢ় ১৩১৬ । তবে ভাদ্র মাসের ৪ তারিখের পর কবি কলকাতায়ই ছিলেন।

আশ্বিনের মাঝামাঝিতে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে কৃষি ও গোষ্ঠ বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষালাভ করে ফেরেন। কবি আর দেরী না করে এ মাসেরই শেষ দিকে ছেলেকে নিয়ে শিলাইদহ গমন করেন। যাতে রথীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে জমিদারী পরিচালনা শিখে নিতে পারে।

এ সময় কবি গীতাঞ্জলী তিনটি গান রচনা করেন। গানগুলি হলোঃ

(১) গায়ে আমার পুলক লাগে (২৫ আশ্বিন)
(২) প্রভু আজি তোমার দক্ষিন হাত (২৭ আশ্বিন) এবং
(৩) জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ (৩০ আশ্বিন) ।

কবি এবারে বেশী দিন পূর্ববঙ্গে থাকতে পারেননি। অল্প দিনের মধ্যে তিনি কলকাতা ফিরে আসেন। আশ্বিনের শিলাইদহ পরিদর্শনের পর এবার অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে রবীন্দ্রনাথ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে নিয়ে পতিসর আসেন। রবীন্দ্রনাথের ডায়েরীতে উদৃত তথ্য থেকে বোঝা যায় তারা শিলাইদহ ও গোয়ালন্দ হয়ে পতিসরে যান। কাদম্বিনী দেবীকে লেখা (১২ সংখ্যক) চিঠির তারিখ ৬ অগ্রহায়ণ, এতে বোঝা যাচ্ছে তারা ৬ অগ্রহায়ন অর্থাৎ প্রথম সপ্তাহে এসেছিলেন। ১০ অগ্রহায়ণ লেখা চিঠিতে (১৩ সংখ্যক) অনুমান করা যায় যে, সেদিনই তারা কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। তবে তারা কলকাতা পৌছেন ১৩ অগ্রহায়ণ।

প্রায় আটমাস পরে ১৩১৭ সালের ২১ আষাঢ় (ইংরেজী ১৯১০ সাল) ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কবি আবার শিলাইদহ আসেন। অনেক দিন পর শিলাইদহের শান্ত পরিবেশে এসে তাঁর মন ভরে উঠেছে। এই সময়ে কবির পুত্রবধূকে লেখা একটি চিঠিতে তার এ মনোভাব ফুটে উঠেছে। 'ইচ্ছা করে অনেকদিন ধরে এখানে শান্তি ও নির্মলতার মধ্যে আবিষ্ট হয়ে কাটিয়ে দিয়ে যাই।' কিন্তু ২৯ আষাঢ় তারিখেই তাকে তড়িঘড়ি করে কলকাতা হয়ে শান্তিনিকেতনে চলে যেতে হয়। তবে সৃষ্টিশীলতা থেমে থাকেনি, ব্যস্ততার মাঝেও শিলাইদহের আশেপাশের এলাকায় নৌকায় ভ্রমণ করতে করতে গীতাঞ্জলীর ১১ টি গান ২৫ থেকে ২৯ আষাঢ়ের মধ্যে রচিত হয়। এই গানগুলি হলো-

১। কে বলে সব ফেলে যাবি
২। নদী পারের এই আষাঢ়ের প্রভাত খানি
৩। মরণ সেদিন দিনের শেষে
৪। দয়া করে ইচ্ছে করে আপনি ছোটো হয়ে
৫। ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা
৬। যাত্রী আমি ওরে
৭। উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
৮। ওজন পূজন সাধন আরধনা
৯। সীমার মাঝে অসীম তুমি
১০। তাই তোমার আনন্দ আমার পর
১১। মনের আসন আরাম শয়ন।

এছাড়া শান্তিনিকেতন থেকে শিলাইদহের রেলপথেও দুটি গান ২১ ও ২২ আষাঢ় রচিত হয়। এর তিন মাস পরে আশ্বিন (১৩১৭) মাসের শেষের দিকে কবি আবার শিলাইদহে এসেছিলেন । এসময়ে কবি জীবনে যেন গানের ঝর্ণাধারা নেমেছিল। এই সুরের ধারায় কবি 'রাজা' নাটক ও তার পঁচিশটি গান রচনা করতে পেরেছিলেন। গানগুলো হলো ঃ

১। খোলো খোলো দ্বার
২। এ যে মোহ আবরণ
৩। কোথা বাইরে দূরে
৪। আজি দক্ষিন দুয়ারে খোলা
৫। যেখানে রূপের প্রভা নয়ন লোভা
৬। আমরা সবাই রাজা
৭। আমার প্রানের মানুষ আছে প্রানে
৮। তোরা যে যা বলিস ভাই
৯। আজি কমলমুকুল দল
১০। মোদের কিছু নাইরে নাই
১১। মম চিত্তে নিতি নৃত্যে
১২। বসন্তে কি শুধু কেবল
১৩। বিরহ মধুর হলো আজি
১৪। যা ছিলো কালো ধলো
১৫। আহা তোমার সঙ্গে
১৬। আমার সকল নিয়ে বসে আছি
১৭। আমার ঘুর লেগেছে
১৮। পুষ্প ফোটে কোন কুঞ্জবনে
১৯। আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না
২০। ভয়েরে মোর আঘাত করো
২১। আমি তোমার প্রেমে হবো সবার
২২। এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে
২৩। আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
২৪। অন্ধকারের মাঝে আমার
২৫। ভোর হলো বিভাবরী।

এবার শিলাইদহে কবির সাথে কন্যা মীরা দেবী এবং নববিবাহিত রথীন্দ্রনাথ ও তার স্ত্রী ছিলেন। সে কারণে এবারকার ভ্রমণ কবির কাছে বিশেষ আনন্দময় ছিল । এযেন তাঁর স্বপরিবারে শিলাইদহে পুর্ব বসবাসের স্মৃতি রোমন্থনের আনন্দ। এ সময় পুত্র রথীন্দ্রনাথ শিলাইদহের জমিদারী দেখাশোনা করছিলেন এবং বিবাহের পর স্ত্রীকে নিয়ে সেখানেই থাকতে শুরু করেন। এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশেষ আনন্দের কারণ। এখানে তিনি একমাসের বেশী সময় থাকার পর শান্তি নিকেতনে ফিরে যান।

আরো ৫ মাস পর ১৩১৮ সালের বৈশাখ মাসের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ আবার শিলাইদহে আসেন। আগের বারের মত এবারেও নতুন নতুন গান রচিত হয়। এবার তিনি রচনা করেন । 'অচলায়ন' নাটক এবং এই নাটকের অন্তর্গত ২৩ টি গান।

১। তুমি ডাক দিয়েছো কোন সকালে (স্বর বিতান-৫২)
২। দূরে কোথায় দূরে দূরে- ,,
৩। এ পথ গেছে কোন খানে গো কোনখানে- ,,
৪। আমরা চাষ করি আনন্দে- ,,
৫। কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে- ,,
৬। সব কাজে হাত লাগাই মোরা- ,,
৭। ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে- (স্বর বিতান-১২)
৮। এই একলা মোদের হাজার মানুষ-(স্বর বিতান-৫২)
৯। যা হবার তা হবে- (")
১০। আমি কারে ডাকি গো-(")
১১। বুঝি এল, বুঝি এল ওরে প্রাণ-(স্বর-?)
১২। আজ যেমন করে গাইছে আকাশ-(স্বর-১১)
১৩। হারে রেরে রেরে-(স্বর-৫২)
১৪। ওরে ওরে আমার মন মেতেছে- (")
১৫। এই মৌমাছিদের ঘর ছাড়া কে করেছে রে-(")
১৬। ও অকূলের কূল-(")
১৭। আমরা তারেই জানি -(")
১৮। সকল জনম ভরে -(")
১৯। উতল ধারা বাদল ঝরে -(")
২০। আলো আমার আলো ওগো-(")
২১। যিনি সকল কাজের কাজি -(")
২২। আমি যে সব নিতে চাই -(")
২৩। আর নহে আর নয় ।-(")

'রাজা' ও 'অচলায়তন' নাটক দুটির রচনা প্রসঙ্গে বলা যায়, এই দুবারের পূর্ববঙ্গ ভ্রমণই কবির পক্ষে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছিল । মাসাধিককাল কাটিয়ে কবি আষাঢ়ে কলকাতায় ফিরে যান ।

কার্তিকের পর কবি শিলাইদেহে আসেন এবং প্রায় একমাস অবস্থানের পর অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিকে তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে যান ।

মাস তিনেক পর ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কবি আবারও শিলাইদহে আসেন । তখন তার বিদেশ ভ্রমণের কথা চলছিল । কিন্তু যাবার আগে শিলাইদহকে একটু না দেখে তিনি যেন যেতে পারছিলেন না । তাই যাবার আগে চঞ্চল অন্তরে তিনি তিনি একবার প্রকৃতির শুশ্রূষা লাভ করতে উদগ্রীব হন । কাদম্বিনী দেবীকে শিলাইদহ থেকে ১০ ফাল্গুন ১৩১৮ তারিখে লেখেন, "এতদিন কলিকাতায় বিস্তর গোলমালে আমার দিন কাটিয়াছে তাই ভারতবর্ষ হইতে বিদায় লইবার পূর্বে কিছুদিন এখানে নির্জন নদীতীরে শান্তি উপভোগ করিয়া লইবার জন্য আসিয়াছি ।" রবীন্দ্রনাথের সাথে শিলাইদহের যেন নাড়ীর টান এসময় কবি সম্ভবত ৭ ফাল্গুনের আগে শিলাইদহে এসেছিলেন কারণ এ পর্যায়ের প্রথম চিঠি ৭ ফাল্গুন এবং শেষ চিঠি ২২ ফাল্গুন (৫ মার্চ) । সম্ভবত শেষ পর্যন্ত ফাল্গুনের শেষেই কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন ।

কিন্তু ১৯ মার্চ সপরিবারে তাঁদের বিলেত যাত্রা করার কথা ছিল । কিন্তু সেদিনই সকালে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন তাই তাদের সেবারকার যাত্রা স্থগিত হয় । ডাক্তারগণ বায়ু পরিবর্তনের কথা বলায় সেইমত তিনি একাই শিলাইদহে চলে আসেন । এ সময় তাঁর অধিকাংশ সময় কাটত ছাদের উপরকার সিড়িঁর ঘরে । এখানে বসেই চলতে থাকে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি । কবি ১৪ থেকে ৩০ চৈত্র শিলাইদহে ছিলেন এবং এ সময়টিতে তিনি রচনা করেন গীতিমাল্যের জন্য ১৮ টি গান । গীতিমাল্যের গানগুলি যথাক্রমেঃ-

১। স্থির নয়নে তাকিয়ে আছি (১৫ই চৈত্র)
২। ভাগ্যে আমি পথ হারালাম (১৬ই চৈত্র)
৩। আমি হাল ছাড়লে তবে (১৭ই চৈত্র)
৪। আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ (১৭ই চৈত্র)

৫। কোলাহলতো বারণ হলো (১৮ই চৈত্র)
৬। নাম হারা এই নদীর পারে (১৯ই চৈত্র)
৭। কে গো তুমি বিদেশী (২০ই চৈত্র)
৮। ওগো পথিক দিনের শেষে (২১ই চৈত্র)
৯। এই দুয়ারটি খোলা (২২ই চৈত্র)
১০। এই যে এরা আঙিনাতে (২৩ই চৈত্র)
১১। অনেক কালের যাত্রা আমার (২৪ই চৈত্র)
১২। আমি তোমায় করব বড়ো (২৫ই চৈত্র)
১৩। এবার তাসিয়ে দিতে হবে (২৬ই চৈত্র)
১৪। যেদিন ফুটল কমল (২৬ই চৈত্র)
১৫। এখনো ঘোর ভাঙেনি (২৭ই চৈত্র)
১৬। ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো (২৮ই চৈত্র)
১৭। তুমি একটু কেবল বসতে দিও কাছে (২৯ই চৈত্র)
১৮। এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে (৩০ই চৈত্র)

এছাড়া গীতাঞ্জলীর ইংরেজী অনুবাদও তিনি এবারই শুরু করেন।

এরপর কবি কলকাতায় ফিরেছিলেন কিনা সঠিক জানা যায় না, তবে ১৩ বৈশাখের (১৩১৯) দিকে তাকে শিলাইদহে পাওয়া যায়। প্রায় মাস খানেক তিনি পূর্ববঙ্গে অবস্থান করেন এবং ৭ জ্যৈষ্ঠ কলকাতায় ফিরে আসেন।

১৩১৯ সালের ৭ জ্যৈষ্ঠ শিলাইদহ ত্যাগের পর তিনি পুনরায় ফিরে আসেন ১৩২০ সালের ফাল্গুন মাসে প্রায় দুবছর পর। এই দীর্ঘদিন পূর্ববঙ্গে না আসার কারণ ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ। এছাড়া দেশে ফেরার পরও বেশ কয়েকমাস তিনি পূর্ববঙ্গে আসার সুযোগ পাননি। প্রকৃতপক্ষে, নোবেল পুরস্কার (১৯১৩) প্রাপ্তির পর কবি নানান কাজে জড়িয়ে পড়েন। এবার ফাল্গুন মাসে শিলাইদহে কবি গীতিমাল্যের ৮টি গান রচনা করেন। গানগুলি হল ঃ-

১। সভায় তোমার থাকি সবার সামনে (১২ ফাল্গুন)
২। যদি জানতেন আমার কিসের ব্যথা (১২ ফাল্গুন)
৩। বেসুর বাঁজেরে (১৪ ফাল্গুন)
৪। তুমি জানো ওগো অন্তর্যামী (১৪ ফাল্গুন)
৫। সকল দাবী ছাড়বি যখন (১৫ ফাল্গুন)
৬। রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি (৫ ফাল্গুন)
৭। মিথ্যা আর কী সন্ধানে (১৫ ফাল্গুন)
৮। আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলায় (১৫ ফাল্গুন)

পাবনার উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন নির্ধারিত ছিল ১৩২০ সালের ২০ ফালগুন। সম্মিলনের সভাপতি কবির ঘনিষ্ঠ বন্ধু নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ। সুতরাং বন্ধুকৃত্য করার জন্যই সম্ভবত 'নোবেল পুরস্কার বিজয়ী' কবিকে এবার পাবনা যেতে হয়। সম্মিলনের কাজ শেষ করেই তিনি যান শিলাইদহে এবং ১৫ ফাল্গুন অবধি সেখানেই থাকেন। এদিনই তিনি কলকাতায় যাত্রা করেন এবং ১৭ ফাল্গুন শান্তি নিকেতনে ফিরে আসেন।

১৯১৩ সালের 'নোবেল পুরস্কার ' প্রাপ্তি কবির শিলাইদহ তথা পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ একটি বিরল ঘটনায় পরিনত করে দিয়েছিল। 'নোবেল পুরস্কার' তাকে এতোটাই ব্যস্ত করে তুলেছিল যে, কবি নিজেই বহু স্থানে ক্ষোভ ও দুঃখের সঙ্গে বলেছেন যে, নোবেল পুরস্কার জীবনের নিভৃত সুখ থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে। ১৩২০ সালের পরে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর জমিদারীতে ফিরে যেতে দেখি প্রায় এক বছর পর ১৩২১ সালের মাঘোৎসবের পর। এবার তাঁর সঙ্গে ছিলেন তিনজন চিত্রকর-নন্দলাল বসু, মুকুল চন্দ্র দে- ও সুরেন্দনাথ কর। এদের সকলকে নিয়ে কবি শিলাইদহে পৌছেন ৩১ জানুয়ারী ১৯১৫। অনেকদিন পর শিলাইদহ আবার কবিকে প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে দেয়। শিলাইদহের বিভৃত নির্জনতা কেবল কবির তাপিত অন্তরকে

সুস্থই করেনি তাঁর সৃজনশীল কবি সত্তাকে জাগিয়ে তোলে। এ সময় কবি 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ১২ টি কবিতা (২২ থেকে ৩০ সংখ্যক) রচনা করেন। ফেব্রুয়ারীর ৯ তারিখে তিনি আবার কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

কয়েকমাস পর জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি আবার শিলাইদহে আসেন এবং ২৯ জুলাইয়ের আগেই পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে কবি শিলাইদহে মোট ১২ দিন ছিলেন। কবির এবারের ভ্রমনে সাহিত্য রচনা বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, সম্ভবত এবারে তিনি জমিদারী কাজেই বেশী ব্যস্ত ছিলেন।

আগষ্ট মাসের শেষের দিকে কবিকে আবার বাংলাদেশে আসতে হয়। জমিদারী তদারকীর ফাঁকে ফাঁকে 'ঘরে বাইরে' লেখার কাজ চলতে থাকে। সপ্তাহ দু'য়েক শিলাইদহে থেকে ১২ সেপ্টেম্বর তিনি কলকাতা ফিরে যান।

পরবর্তী আড়াই মাসের মধ্যে কবি অন্তত একবার শিলাইদহ এসেছিলেন । তার প্রমান পাওয়া যায়- শিলাইদহে বসে লেখা 'বলাকার' ৩৮ ও ৩৯ সংখ্যক কবিতা দুটি রচনা করেন ১২ ও ১৩ অগ্রহায়ণ। তবে এবারে কবির আসা-যাওয়ার দিনক্ষণ সঠিক জানা যায় না। এ সময়ে মীরা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে কবির মনের কথা প্রতিফলিত হয়েছে, 'শিলাইদহের মতো এমন মনের মতো জায়গা তো আর কোথাও দেখলুম না আকাশে আলোতে হাওয়াতে পাখির গানে ফুলের গন্ধে আমার চারিদিকে এবং আমার মগজের ভিতরটা পর্যন্ত ভরে দিয়েছে-এতো শান্তি এত সৌন্দর্য আর কোথাও নেই।'

পরের বছর ১৯১৬ সালের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে কবিকে আবার আমরা শিলাইদহে পাই। ২৩ ফেব্রুয়ারী শিলাইদহ থেকে তিনি এনড্রুসকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা দেখে মনে হয়, তিনি কদিন আগে অল্প দিনের জন্য শিলাইদহে এসেছিলেন এবং কলকাতায় ফিরেও গিয়েছিলেন। চিঠিতে তিনি লেখেন 'কলকাতা থেকে ফিরে আবার আমি নিজের মধ্যেই ফিরে এসেছি' পল্লী বাস যে তাঁর জীবনে আর্শীবাদ স্বরূপ এ বিষয়ে তিনি এ চিঠিতে আরো লেখেন ' প্রতিবারেই যেন নতুন করে নিজেকে আবিস্কার কবি। শহরের ভীড়ের মধ্যে আমরা জীবনের যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গী হারিয়ে ফেলি। অল্প দিনের মধ্যেই সেখানকার সবকিছু আমাকে ক্লান্ত করে। তার একমাত্র কারণ, আমাদের অন্তরে যা সত্য তা সেখানে হারিয়ে যায়।' প্রবল এক মানসিক যন্ত্রনার মধ্যেই যে তিনি শিলাইদহ আসেন এবং কদিন পর পতিসর যান কাদম্বিনী দেবীকে পতিসর থেকে লেখা এক খানি চিঠিতে তা দেখা যায় ' এবারে নানা উপদ্রবে আমার শরীর মন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছে বলে কিছুদিনের জন্য শিলাইদহের পদ্মার চরে আশ্রয় নিয়েছিলেন' । কবি অন্তত ৮ ফাল্গুন পর্যন্ত শিলাইদহে ছিলেন। সেখান থেকে যান পতিসর । পতিসর থেকে ১১ ই ফাল্গুন কাদম্বিনী দেবীকে লেখা উপরোক্ত চিঠিতে তিনি জানান, এ সপ্তাহের গোড়াতেই তিনি শান্তিনিকেতন ফিরে যাবেন। অবশ্য প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে তিনি ফাল্গুনের শেষে ফিরেছিলেন। এবারের শিলাইদহে বাসকালে 'বলাকার' ৪০, ৪১,৪২ সংখ্যক ৩টি কবিতা রচিত হয়।

১৯১৭ সালের ২০ জুলাই পর্যন্ত বছর দেড়েকের মধ্যে কবিকে আর শিলাইদহে দেখা যায়নি। তার একবছর কাটে জাপান ও আমেরিকা ভ্রমনে। এবার তিনি শিলাইদহে আসেন পিয়ার্সনকে সঙ্গে নিয়ে। ২০ জুলাইয়ের একটি চিঠিতে এনড্রুসকে তিনি লেখেন, 'প্রায় বছর দেড়েক বিচ্ছেদের পর আমি আবার আমার পদ্মায় ফিরে এসে নতুন করে তাকে প্রেম নিবেদন করছি। সে তার সদা পরিবর্তনশীলতায় এখনো অপরিবর্তিত' পদ্মার সান্নিধ্য স্বত্বেও কবি এবারে বেশীদিন থাকতে পারেননি। সম্ভবত ৩০ জুলাইয়ের আগেই তিনি কলকাতায় ফিরে গিয়েছিলেন । তার পরবর্তী চিঠি ৩০ জুলাই কলকাতা থেকে কাদম্বিনী দেবীকে লেখা। সুতরাং এ থেকে বোঝা যায় কবি ৩০ জুলাইয়ের আগেই কলকাতায় পৌছেছিলেন।

এরপর প্রায় এক বছরের মধ্যে তিনি আর শিলাইদহে যেতে পারেননি। ১৯১৮ সালের মে মাসে কলকাতা থেকে কাদম্বিনী দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহে আসার কথা জানা গেলেও তিনি কবে শিলাইদহে এসেছিলেন এবং কবে ফিরত গিয়েছিলেন তার কোন তথ্য প্রমান পাওয়া যায় না।

প্রায় বছর দেড়েক পর কবিকে আমরা দেখতে পাই ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে। তবে জমিদারী কাজে শিলাইদহ বা পতিসরে নয় সিলেটবাসীর আমন্ত্রণে কবিকে সিলেটে আসতে হয়। তিনি ১৯ কার্তিক ভোরে সিলেটে পৌেছেন এবং ২২ কার্তিক পর্যন্ত সেখানে তাদের আতিথ্য গ্রহণ করেন। এ যাত্রায় কবির সঙ্গী ছিলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্র বধু প্রতিমা দেবী । ১৯ কার্তিক ভোরে কবিকে ব্রাহ্মমতে অভ্যর্থনা জানানো

হয়। পরের দিন (২০ কার্তিক) জনগন তাঁকে সংবর্ধনা জানায় । এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কবি তাঁর বক্তব্যে বলেছিলেন, "বাঙ্গালীর শক্তি যদি সৃষ্টি শক্তি, যদি আত্মোৎসর্জনের শক্তি হয়, তাহলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন জাতীর বিরাট সত্ত্বাকে গড়ে তুলতে পারবে।"[১৯] এই বক্তব্যটি 'বাঙালীর সাধনা' নামে পরে পত্রিকায় প্রকাশ হয়। মহিলারাও এদিন তাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন- 'তুমি নির্মল কর, মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে' গানটির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। একই দিনে (২০ কার্তিক) কবির ৩য় অনুষ্ঠান হয় টাউন হলে। এ সময় কবি তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় বলেন, 'একদিন পৃথিবীতে এক ধর্ম হবে এবং স্বার্থে স্বার্থে কোন সংঘাত বাধবে না। সূর্য পূর্ব দিকেই উদিত হয়, বাংলাদেশ পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। ভারতবর্ষ আজ বাংলার দিকে আশা করে চেয়ে আছে। বাঙ্গালীকেই আজ জনজাগরণ মঞ্চে পৌরহিত্য করতে হবে।'[২০] একই দিন অপরাহ্নে তিনি মনিপুরী পাড়া পরিদর্শন করেন। মনিরপুরীদের শিল্পকর্ম কবিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে। অবশ্য শুধু মনিপুরীদের শিল্পকর্ম নয় তার থেকেও তিনি বেশী আনন্দ পেয়েছিলেন পরের দিন রাতে মনিপুরীদের নৃত্য দেখে । কবি শান্তিনিকেতনেও মনিপুরী নৃত্য প্রবর্তনের চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। । আসার আগের দিন (২১ কার্তিক) মুরারীচাদ কলেজের ছাত্রাবাসে তিনি একটি প্রতিক্ষা নামক একটি ভাষণে বলেন, 'পুরোপুরি মানুষ হতে হবে এই শিক্ষার জন্যে অপরিমিত আকাংখার দরকার তাকেই শেষ পর্যন্ত জাগিয়ে রাখবার জন্য মানুষের শিক্ষা।'[২১] এই 'প্রতীক্ষা' নামক ভাষণটি পরবর্তীতে "আকাংখা" নামে প্রকাশিত হয়। ২২ কার্তিক সিলেট ত্যাগ করার পর তিনি কলকাতায় ফিরেছিলেন কিনা এ নিয়ে মতান্তর রয়েছে । প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে ৯ নভেম্বর তিনি চাঁদপুর ও গোয়ালন্দ হয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। কিন্তু আবার দেখা যায়, ফেরার পথে ১০ নভেম্বর তিনি আগরতলায় উপস্থিত ছিলেন। এ দিন যে তিনি উমাকান্ত একাডেমী স্কুল পরিদর্শন করেছিলেন, ভিজিটার্স বুকে তার প্রমান রয়েছে। বস্তুত এবারে আগরতলায় যে বাংলোতে অবস্থান করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি তা নিজেই স্মৃতিচারণ করেছিলেন।

কবির সিলেট ভ্রমণ তার মনোজীবন ও সৃষ্টি কর্মে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। সিলেটের মনিপুরী নাচ তাঁর নৃত্য নাট্য রচনা ও পরিচালনায় প্রভুত অনুপ্রেরণা দান করেছিল। শান্তিনিকেতনে ফিরেই কবি আগরতলায় মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মানিক্যকে মনিপুরী নাচ ও শিল্পকর্ম শেখানোর জন্য শিল্পী পাঠাতে অনুরোধ জানান । এই অনুরোধের ভিত্তিতে রাজা বুদ্ধিমন্ত সিংহ নামে একজন শিল্পীকে শান্তিনিকেতন পাঠান। বুদ্ধিমন্ত সিং এর সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের মনিপুরী নাচ শেখানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু এই চেষ্টা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বছর কয়েক পর নবকুমার সিং-এর সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ আবারও শান্তিনিকেতনে মনিপুরী নৃত্য প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। আরো পরবর্তী সময়ে চন্দ্রজিৎ সিংহ সহ প্রমুখ দু-তিনজন শিল্পী শান্তি নিকেতনের ছাত্রদের মনিপুরী নৃত্য প্রশিক্ষনের ব্যাপারে সহায়তা করেন।

সিলেট ভ্রমনের পর দুবছরের বেশী সময় রবীন্দ্রনাথ আর পূর্ববঙ্গে আসেননি। এ সময়ের মধ্যে কবি ইউরোপ এবং আমেরিকায় ভ্রমন করেন। এই দীর্ঘ ভ্রমন শেষে ১৯২১ সালে ২৮ ডিসেম্বর তিনি বিশ্রাম নেবার আশায় শিলাইদহে আসেন। এবারে কবি ৭ দিন এখানে ছিলেন। কলকাতায় ফিরে একটি চিঠিতে তিনি শিলাইদহে আসার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, 'নদীর ছন্দের সঙ্গে আমাদের রক্ত চলাচলের ছন্দ মেলে, আমাদের মনে নিরন্তর যে- চিন্তাস্রোত বয়ে যাচ্ছে সেই স্রোতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে।' এই সাদৃশ্যের আকর্ষণেই তিনি পদ্মার আতিথ্য নিতে গিয়েছিলেন ।

রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মতো শিলাইদহে গিয়েছিলেন ১৯২২ সালে সম্ভবত ২১ তারিখে (৮ চৈত্র)। মোটামুটি দিন পনর কবি সেখানে ছিলেন। তবে এ সময়ে শিলাইদহকে দেখে কবি বড়ই নিরাশ হন। কলকাতায় ফিরে তিনি ইন্দিরা দেবীকে দুঃখ করে লিখেছিলেন, ''শিলাইদহ ঘুরে এলুম'' পদ্মা তাকে পরিত্যাগ করেছে, তাই মনে হল, 'বীণা আছে তার নেই' । তবে পদ্মার শ্রীবর্জিত শিলাইদহের সঙ্গে বোলপুরের তুলনা হয় না । শিলাইদহের সৌন্দর্য যা অবশিষ্ট ছিলো তাই তাঁকে মুগ্ধ করে । একটি চিঠিতে সেই সৌন্দর্য বর্ণনায় তিনি লেখেন,''------- চারিদিকে এতো সরসতা । আমাদের বাড়ির সামনে শিশুবীথিকায় তাই দিনরাত মর্মরধবনি শুনছি, আর কনকচাঁপার গন্ধে বাতাস বিহবল, কয়েতবেলের শাখায়-প্রশাখায় নতুন চিকন পাতাগুলো ঝিলমিল করছে, আর ঐ বেণুবনের মধ্যে চঞ্চলতার বিরাম নেই । সন্ধ্যার সময় টুকরো চাঁদ যখন ধীরে ধীরে উঠতে থাকে তখন সুপুরিগাছের শাখাগুলি ঠিক যেন ছোটো ছেলের হাত

নাড়ার মতো চাঁদ মামাকে টিপ দিয়ে যাবার জন্য ইশারা করে ডাকতে থাকে। নিসর্গের এই সৌন্দর্য কবির মনে গানের সুর জাগিয়ে তোলে। তিনি তাই এ সময়ে কয়েকটি গান রচনা করেন।

১। পূর্বাচলের পানে তাকাই (১০ চৈত্র ১৩২৮)
২। আসা যাওয়ার পথের ধারে (১১ চৈত্র)
৩। কার যেন এই মনের বেদন (১২ চৈত্র)
৪। নিদ্রা হারা রাতের এ গান (১৩ চৈত্র)
৫। এক ফাল্গুনের গান সে আমার (১৪ চৈত্র)

এবার শিলাইদহে ভ্রমণের পর রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ দিনের মধ্যে আর পূর্ববঙ্গে যেতে পারেননি। আসলে তিনি বিশ্বভারতীর ও অন্যান্য কাজে কর্মেই বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

দীর্ঘ চার বছর পর রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে। ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ৭ তারিখে কবি নারায়ণগঞ্জ হয়ে ঢাকায় পৌছেন। কবি বোটে থাকতে ভালবাসতেন বলে বুড়িগঙ্গায় ঢাকার নবারের তুরাগ নামক বোটে কবির থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। ৭ ফেব্রুয়ারী কবিকে দুটি অভ্যর্থনা দেয়া হয়, একটি নর্থব্রুক হলে, অন্যটি করোনেশন পার্কে, ৮ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় একটি মহিলা সমিতি 'দীপালি সংঘ' তাঁকে সংবর্ধনা জানান ব্রাহ্মমন্দির প্রাঙ্গণে। ৯ ফেব্রুয়ারী ঢাকা কলেজ প্রাঙ্গণে একটি সভায় কবি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি হিন্দু মুসলিম সর্ম্পক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

১০ ফেব্রুয়ারী কবি প্রথমে ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা করেন। তারপর কলেজিয়েট স্কুল পরিদর্শন করেন। অপরাহ্নে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ আয়োজিত সংবর্ধনায় কবি কার্জন হলে আসেন। একইদিনে সলিমুল্লাহ্ হলের সংবর্ধনা সভায়ও যোগদান করেন, সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে আসল অনুষ্ঠানটিতে কার্জন হলে "The meaning of Art" শীর্ষক ভাষন প্রদান করেন। ঐ দিনই কবি তুরাগ বোট ছেড়ে ঢাকায় রমেশচন্দ্র মজুমদারের আতিথ্য গ্রহণ করেন।

১১ ফেব্রুয়ারী জগন্নাথ হলের নির্ধারিত সংবর্ধনা ছিলো, কিন্তু অসুস্থতাবশত তিনি এ সংবর্ধনা সভায় যেতে পারেননি।

১৪ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কবি ময়মনসিংহ যাত্রা করেন। প্রচন্ড ব্যস্ততার কারণে এই সময়ে কবি কিছুই রচনা করতে পারেননি। তবে জগন্নাথ হল ম্যাগাজিনের জন্য 'এই কথাটি মনে রেখো' গানটি ঢাকা ত্যাগের পূর্বে রচনা করেছিলেন।

১৫ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনি ময়মনসিংহে নানা অনুষ্ঠানের ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটান এর মধ্যে টাউন হলে ম্যুনিসিপালিটির সংবর্ধনা, ব্রাহ্মসমাজের সংবর্ধনা, মুক্তাগাছার ত্রয়োদশী সম্মিলনীর সংবর্ধনা, আনন্দ মোহন কলেজের সংবর্ধনা, মহিলা সমিতির সংবর্ধনা, বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের সংবর্ধনা এবং সিটি কলেজের সংবর্ধনা ছাড়াও ছিলো ময়মনসিংহবাসীদের পক্ষ থেকে বিপুল এক জনসভায় সংবর্ধনা।

১৯ ফেব্রুয়ারী রাতের বেলায় রবীন্দ্রনাথ কুমিল্লায় পৌছেন। 'অভয় আশ্রমে'র নিমন্ত্রণে তিনি এখানে আসেন। ২২ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনি কুমিল্লায় ছিলেন। এর মধ্যে তিনি 'অভয় আশ্রমের' বার্ষিক উৎসবে যোগদান করেন। এ ছাড়াও তিনি স্থানীয় মহিলা সমিতি, রামমালা ছাত্রাবাস, ভিকটোরিয়া কলেজ নমঃ শূদ্র কনফারেন্স এবং কুমিল্লা বাসীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন।

২২ ফেব্রুয়ারী রাতে তিনি কুমিল্লা থেকে আগরতলায় আসেন। তা ছিলো ৭ম বারের মতো তাঁর আগরতলা ভ্রমণ। এবার তিনি এখানে চারদিন অবস্থান করে ১৪ ফাল্গুন (২৭ ফেব্রুয়ারী) আগরতলা ছেড়ে যান। প্রভাত কুমার মুখ্যোপাধ্যায়ের মতে, কবি যে-কদিন ছিলেন। সে কদিন আগরতলা উৎসব মুখর ছিলো। কবিকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে মহারাজা মনিপুরী নৃত্যের আয়োজন করেন। তিনি এ নৃত্য দেখে খুব খুশি হন এবং ১৯১৯ সালে শান্তিনিকেতনে মনিপুরী নৃত্য প্রবর্তনের যে ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছিল, তা নতুন করে শুরু করার অনুপ্রেরণা লাভ করেন এবং এভাবেই নবকুমারসিংহ শান্তিনিকেতনে মনিপুরী নৃত্যের শিক্ষক হিসেবে গমন করেন।

আগরতলা থেকে কবি চাঁদপুর ও নারায়ণগঞ্জ হয়ে কলকাতায় আসেন। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে, এবারের আগরতলা ভ্রমণকালে 'দোলে প্রেমের দোলনচাঁপা' এবং 'ফাল্গুনের নবীন আনন্দে' গান দুটি রচনা করেন। তিনি অনুমান করেন 'বনে যদি ফুটল কুসুম' 'এসো আমার ঘরে' 'আপনহারা মাতোয়ারা' এবং 'ও গো জলের রানী'-এ চারটি গানও আগরতলায় রচিত হয় বলে তিনি অনুমান করেন। সম্ভবত আগরতলা থেকে চাঁদপুর যাওয়ার পথে 'ফাল্গুনের নবীন আনন্দে' গানটি রচিত হয় (১৫ ফাল্গুন)।

এরপর প্রায় একযুগ কবির সাথে পূর্ববঙ্গের বাহ্যিক যোগাযোগ কার্যত বন্ধ হয়ে যায় । কিন্তু অন্তরের টান কবি মৃত্যুকাল অবধি অনুভব করেছেন পূর্ববাংলার নিসর্গ প্রকৃতি ও মানুষের জন্য । যৌবনের নানা সময়ের নানা সুখ দুঃখের স্মৃতি বিজরিত পল্লী বাংলা ও তার সহজ সরল মানুষের ভালবাসার পিছুটানের আহবানে কবি শেষবারের মত পতিসরে গিয়েছিলেন ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসের তিন চারদিন কবি সেখানে ছিলেন এবং এই সময়েই দরিদ্র প্রজাদের সংবর্ধনা তাঁর কাছে স্বরণীয় হয়েছিল।

এরপরে আর কবি বাংলাদেশে আসতে পারেননি কিন্তু 'এই কথাটি মনে রেখো তোমাদের এই হাসি খেলায় আমি যে গান গেয়েছিলেন' এই গানের রেশ থেকে গেছে বছরের পর বছর যুগের পর যুগ কবি রচিত- ''আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'' গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পেয়েছে ।

তথ্য সূত্র

১. শিলাইদহের স্মৃতি-রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদ, সংকলন ও সম্পাদনা- আবুল আহসান চৌধুরী, , পৃঃ ২০, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯০ ।

২. অচেনা রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ-১৭৩ ।

৩. অচেনা রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ১৪৪

৪. অচেনা রবীন্দ্রনা পৃঃ ১৪৫ ।

৫. অচেনা রবীন্দ্রনা পৃঃ ১৪৬ ।

৬. রবীন্দ্রনাথে পল্লী পুর্নগঠনের চিন্তা-আহমেদ রফিক, রবীন্দ্রনাথ, মোঃ হারুনুর রশীদ, পৃষ্টা-৩২, বাংলা একাডেমী ঢাকা, মে, ১৯৯৪ ।

৭. মানুষের ধর্ম- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্টা-৫২-৫৩, বুক ক্লাব ঢাকা বইমেলা, ২০০৩ ।

৮. ছিন্নপত্র- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৩৩-৩৩, বিশ্বভারতী প্রকাশনা, ভাদ্র ১৩৮২ ।

৯. ছিন্নপত্রাবলী- শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৬১, পত্র -৩১, বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ কলিকাতা সংস্কারণ, চৈত্র ১৩৯৯ ।

১০. ছিন্নপত্রাবলী- শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১৪৭ পত্র-৯৫, বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ কলিকাতা সংস্কারণ, চৈত্র ১৩৯৯ ।

১১. পতিসরে রবীন্দ্রনাথ-ডঃ সাইফুদ্দীন চৌধুরী, পৃঃ -৯, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, জানুয়ারী, ২০০০।

১২. রবীন্দ্ররচনাবলী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৭৪৯, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৌষ, ১৪০২ ।

১৩. পতিসরে রবীন্দ্রনাথ-ডঃ সাইফুদ্দীন চৌধুরী, পৃঃ -১১, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, জানুয়ারী, ২০০০।

১৪. রবীন্দ্র সংগীত বিচিত্রা- শান্তি দেব ঘোষ, পৃঃ১৭৩, আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল ১৯৯৭ ।

১৫. রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্রা শান্তি দেব ঘোষ পৃঃ১৭৭, আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল ১৯৯৭ ।

১৬. রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ-সংকলন -আবুল আহসান চৌধুরী, পৃঃ ২৪-২৫, বাংলা একাডেমী, ১৯৯০ ।

১৭. রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-গোলাম মুরশিদ, পৃঃ-২২৬, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৮১।

১৮. রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-গোলাম মুরশিদ, পৃঃ-২৩১, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৮১।

১৯. শ্রীভূমি সিলেটে রবীন্দ্রনাথ-নগেন্দ্র লাল দাস, পৃষ্টা-৪৯, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ ।

২০. শ্রীভূমি সিলেটে রবীন্দ্রনাথ-নগেন্দ্র লাল দাস, পৃষ্টা-১৮, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ ।

২১. শ্রীভূমি সিলেটে রবীন্দ্রনাথ-নগেন্দ্র লাল দাস, পৃষ্টা-৫৩, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের নিসর্গচিত্র, সমাজ জীবন এবং কবির গানে তার প্রভাব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারী কাজ দেখা শোনার দায়িত্বভার নিয়ে (১৮৯১) পূর্ববঙ্গে আসেন। পূর্ববঙ্গের শিলাইদহ, সাজাদপুর ও পতিসর অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল ঠাকুর পরিবারের জমিদারী। রবীন্দ্রনাথ এ অঞ্চলে জমিদার হিসেবে এলেও তিনি পূর্ববঙ্গকে জমিদারের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখেননি। তিনি পল্লী বাংলাকে দেখেছেন-কবির চোখ দিয়ে, মনে কৌতুহল ও সহমর্মিতা নিয়ে। পল্লীর প্রকৃতি যে কবিকে কতটা বিমোহিত করেছিল তার প্রমান আমরা পাই ছিন্নপত্রাবলীর ছত্রে ছত্রে। জমিদারী কার্যোপলক্ষে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, কখনো ট্রেনে কখনো পালকিতে তবে বেশীর ভাগ সময় নদী পথে বোটে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, আত্রাই এবং আরও অনেক উপনদী, শাখা নদী, খাল, বিল কবি পাড়ি দিয়েছেন তাঁর বোটে করে। নদী পথে চলতে চলতে তিনি বিমুগ্ধ নয়নে অবলোকন করেছেন নদীর দুই তীরে গড়ে উঠা গ্রামের নৈসর্গীক দৃশ্য ও জনমানুষের জীবনযাপন প্রনালী। এসব বৈচিত্রময় দৃশ্য কবির মনকে উৎসুক্যে ভরিয়ে তুলতো। তাই যতোদিন কবি পল্লী বাংলায় ছিলেন, প্রকৃতি ও মানুষের জীবনকে তন্ন তন্ন করে জানবার চেষ্টা করেছেন।

নগর জীবনের বাইরে এক বিশাল জীবন পল্লীর প্রান্তরে। এই পল্লী গ্রামেই বাস করে দেশের ৮০ ভাগ মানুষ। তাদের জীবন যাপন পদ্ধতি ভিন্ন, আচার আচরণ ভিন্ন, এমনকি শহরে মানুষের তুলনায় অনেকটাই ভিন্ন তাদের চিন্তা চেতনা, ভালবাসা কিংবা অসহায়তা। কবি রবীন্দ্রনাথ তার ৩০ বছর বয়সে মুলত জানতে শুরু করলেন মানুষের আসল জীবন, প্রকৃতির বিশালতা। পেলেন জীবন দেবতার খোঁজ। কখনো জমিদারী দায়িত্বপালন করার সময় প্রজাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে করতে কিংবা নদীপথে শিলাইদহ , শাহজাদপুর, পতিসর, রাজশাহী প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমন করতে করতে কবি পল্লী বাংলাকে যেভাবে দেখেছেন এবং তার বর্ণনা দিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে লিখিত পত্রে। তারই আলোকে পূর্ববঙ্গের নিসর্গচিত্র, সমাজ জীবন কবির কাছে কতটা অর্থবহ হয়েছিল বা তার রচনায় কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

কবি যখন জমিদারীর দায়িত্বভার নিয়ে স্থায়ীভাবে পূর্ববঙ্গে বাস করার উদ্ধেশ্যে কলকাতা থেকে রওনা দিলেন (১৭ই জানুয়ারী ১৮৯১) কালীগ্রাম পৌছে তিনি ইন্দিরা দেবীকে চিঠিতে লেখেন-'সব যুদ্ধ খুব ঢিলেঢালা একলা একলা --- । যেন পৃথিবীতে অত্যাবশ্যক বলে কিছুই নেই। এমনকি নাইলে চলে না নাইলেও চলে। ----- একটা ছোট নদী আছে বটে, কিন্তু তাতে কানাকড়ির স্রোত নেই। সে যেন আপন শৈবালদামের মধ্যে জড়ীভূত হয়ে অঙ্গবিস্তার করে দিয়ে পড়ে পড়ে ভাবছে যে, যদি না চললেও চলে তবে চলবার দারকার কি ?' [১] পূর্ববঙ্গে প্রথম প্রথম কবির কাছে মনে হয়েছিল সব কিছুই গতিহীন, ভীষন ভাবে আলস্যে ভরপুর। কলকাতার শহরে জীবনে অভ্যস্ত যে কারো পক্ষেই গ্রামের জীবন যাপন ধীরগতির মনে হওয়াই স্বাভাবিক। সেদিক থেকে বিচার করলে কবি তার কিছুদনি আগেই ইংল্যান্ড থেকে ঘুরে এসেছিলনে। সেই দ্রুতগতির জীবনের তুলনায় হঠাৎ করেই পূর্ববঙ্গে এসে থাকার ব্যবস্থাটা একটু পৃথক ঠেকেছিল। পল্লীবাংলায় এসে রবীন্দ্রনাথ প্রথম ব্যস্ত জীবনের মুখোমুখি হলেন। একদিকে প্রকৃতির অবারিত আমন্ত্রন, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি। এ দুয়ের মাঝখানে কবি বৃহত্তর জীবনের ইঙ্গিতে পেয়েছেন।

"মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্ত দ্বারে
তোমার বিশ্বের সভাতে।"

মুক্তদ্বারের ওপাশের বিশ্বসভাই সম্ভবত কবির বৃহত্তর জীবনের আহবান।

পল্লী বাংলার নিবিড় সবুজ সৌন্দর্য্যে কবি মন্ত্র মুগ্ধের মত নীরবে ঘুরে বেড়ান। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বিষয় তিনি নিরীক্ষন করেন। ' মাঠের শস্য কেটে নিয়ে গেছে, কেবল কাটা ধানের অবশিষ্ট হলদে বিছিলিতে সমস্ত মাঠ আছন্ন। সুর্যাস্তের পর 'সুর্য ক্রমেই রক্তাবর্ণ হয়ে একেবারে পৃথিবীর শেষ রেখার অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে গেল। বহু দূরে একেবারে দিগন্তের শেষ প্রান্তে একটু গাছপালার ঘের দেওয়া ছিল, সেখানটা এমন মায়াময় হয়ে উঠল – নীলেতে লালেতে মিশে এমন আবছায়া হয়ে এল–মনে হল ঐখেনে যেন সন্ধ্যার বাড়ি।'[২] কবি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে অবলোকন করেছেন সুর্যাস্ত। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের শেষপ্রান্তে কিভাবে রক্তিম আভায় বিলিন হয় তেজস্বী সূর্য। কবির মনে হয়, এ যেন সিঁদুর মাথায় নব বধুর মত কার প্রতীক্ষায় আপনার রাঙ্গা আঁচলটি শিথিল ভাবে এলিয়ে দিয়ে বসে আছে। সে বসে বসে তারার মালা গাঁথতে গাঁথতে গুন গুন স্বরে স্বপ্ন রচনা করে।[২] সন্ধ্যার সাথে নববধুর এ বর্ণনা মিলে যায় এ গানটির সাথে – 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা '। একই চিঠিতে কবি ভারতবর্ষের সাথে ইউরোপের তুলনা করেছেন। ' ভারতবর্ষের যেমন বাধাহীন পরিস্কার আকাশ, বহুদুর বিস্তৃত সমতল ভুমি আছে, এমন ইউরোপের কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এজন্যে ভারতবর্ষের মানুষ তথা বাঙ্গালী জাতি দিগন্ত বিস্তৃত সমতল ভুমির মতো অসীম ঔদাস্য আবিস্কার করতে পেরেছে। এই জন্যেই পূরবী বা টৌড়ী রাগের সুরে বিশাল জগতের অন্তরের হাহাকার ধ্বনিত হয়। সেতারে যখন ভৈরবীর মীড় টানে আমাদের হৃদয়ে টান পড়ে।[২] আবাল্য সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে কবি বড়ো হয়েছেন তা ছিল সঙ্গীতের উচ্চ মার্গীয় ধারা এবং কবি তাঁর গানেও এসব রাগরাগিনীর ব্যবহার করতেন। যিনি সুরের সাধক তার জন্য দেশ- কাল-পাত্র সবসময় একই, তাই কবি পল্লী বাংলার একটি বিস্তৃর্ণ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে পুরবীর সুর মনে মনে ভাঁজ ছিলেন আর পৃথিবীর অসীম ঔদাস্য নিজের মধ্যে অনুভব করছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করছিলেন তিনি যেমন পল্লী গ্রামের মানুষদের গভীর ঔৎসুক্যে নিরীক্ষণ করেছেন তেমনি গ্রামের মানুষও জমিদার বাবুর বজরাটির (বোট) দিকে প্রবল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকতো, এমন কি মাঝি মাল্লাদের নানান প্রশ্ন করে কৌতুহল মেটাতো। 'হা গা কাদের বজরা'? ' জমিদার বাবুর'। 'এখানে কেন' ? 'হাওয়া খেতে এসেছেন' ।[৩] অবশ্য কবির মতে তিনি এসেছেন হাওয়ার চেয়েও ঢের বেশী কঠিন জিনিসের জন্য । কবি লক্ষ্য করছেন 'খোড়ো ঘর, কতকগুলি চাল শূন্য মাটির দেয়াল, দুটো একটা খড়ের স্তুপ, কুলগাছ, আমগাছ, বটগাছ, বাঁশঝাড়, গোটাকতক উলঙ্গ ছেলেমেয়ে। ঘাটে কেউ কাপড় কাঁচছে, কেউ নাইছে বা বাসন মাজছে'[৩] এবং তারা সকলেই কবির বোটের দিকে দেখছে। এমনকি 'লজ্জাশীলা বধু দু' আঙ্গুলে ঘোমটা ইষৎ ফাঁক করে ধরে কলসী কাঁখে জমিদার বাবুকে সকৌতুকে নিরীক্ষন করছে'।[৩] এতোকিছুর পরেও কবির চোখ যায় দূরে শস্য শুন্য মাঠে দুই একজন রাখাল শিশু গরুকে ঘাস খাওয়াছে। এই নির্জনতা কবিকে স্পর্শ করে, তিনি অনুভব করেন 'এখানকার দুপুর বেলার মতো এমন নির্জনতা নিস্তব্ধতা আর কোথাও নেই' ।[৩]

আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রাম বাংলা ধীরে ধীরে কবিকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছে। তারঁ চিন্তা চেতনায় পল্লী পরিবেশ, নিজস্ব একটি স্থান করে নিতে সচেষ্ট হচ্ছে। আর কবি তা নির্বাক দৃষ্টিতে অনুধাবন করে চলেছেন' '--- ঐ মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালবাসি---ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা শুদ্ধ দুহাতে

আকড়ে ধরতে ইচ্ছা করে'।[৪] এর সোনালী ফসলের মাঠ, দুকূল ছাপানো নদী আর নদীর ধারে সুখ দুঃখ ময় ভালবাসার লোকালয় কবির মনে গভীর ভাবে ছাপ ফেলে।

কবির শিলাইদহ থেকে সাজাদপুর কিংবা পতিসর যেতে দিনের পর দিন বোটে ভ্রমন করতেন। এমন কি কখন কখনও বোটেই থাকতেন। বোটেই ছিল তার লেখা পড়ার সমস্ত সামগ্রী। সারাদিন মান বোট চলছে আর কবি নেশাতুরের মত নদী তীরের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী অবলোকন করছেন। এর যেন শেষ নেই আর কবিরও কোন ক্লান্তি নেই। 'কেবল গতির কেমন একটা আকর্ষন আছে- দু ধারের তটভূমি অবিশ্রাম চোখের উপর দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে , সমস্ত দিন তাই চেয়ে আছি, কিছুতে তার থেকে চোখ ফেরাতে পারছিনা। '[৫] এই চিঠিতেই কবি কালীগ্রামের মরা নদীটার কথা আবার স্মরণ করেছেন। 'আমি মনে করতুম সে নদীর একেবারে স্রোত নেই। কিন্তু সেখানকার বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি, অত্যন্ত মৃদু একটু খানি স্রোত আছে- আজন্মকাল যারা তীরে বাস করে আসছে কেবল তারাই জানতে পারে।'[৫] এই নদীর স্রোত, এর বয়েচলা বা গতিই হচ্ছে এর জীবন।আর গতি হীনতা মৃত্যু, স্থবির, অচঞ্চল। কবি এই গতিবাদকে প্রকাশ করেছেন তাঁর 'বলাকা' কবিতায়।

যমুনা নদীর মধ্য দিয়ে চুহালির দিকে যেতে যেতে বড় নদী থেকে নৌকা ধীরে ধীরে যমুনার একটি শাখা নদীতে এসে পৌছে। সন্ধ্যের সময় কবির বোট একটি চরে বাঁধা হয়। "বহুদূর পর্যন্ত সাদাবালি ধু ধু করছে , জনমানবের সম্পর্ক নেই। অন্যপাড়ে সবুজ শস্য ক্ষেত্র এবং বহুদূরে একটি গ্রাম।---- এই নদীর উপরে, মাঠের উপরে, গ্রামের উপরে সন্ধ্যেটা কী চমৎকার, কী প্রকান্ড, কী প্রশান্ত, কী অগাধ সে কেবল স্তব্ধ হয়ে অনুভব করা যায়"।[৬] সন্ধ্যার এই দৃশ্য দেখতে দেখতে কবির মনে পড়ে ছেলেবেলায় শোনা রূপকথার গল্পের কথা। সাত সমুদ্র তের নদীর ওপাড়ে রাজপুত্র রাজকন্যার গল্প, তেপান্তরের মাঠে রাজপুত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে রাজকন্যার খোঁজে। কবি বলেন, "মনেকরা যেতেও পারে, আমি সেই রাজপুত্র, অসম্ভবের প্রত্যাশায় সন্ধ্যারাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্চি - এই ছোট নদীটি সেই তের নদীর মধ্যে একটা নদী। এখনো সাত সমুদ্র বাকী আছে - এখনো অনেক দূর অনেক ঘটনা, অনেক অন্বেষণ বাকী - এখনো কত অজ্ঞাত নদী তীরে কত অপরিচিত সমুদ্র সীমায় কত ক্ষীন চন্দ্রালোকিত অনাগত রাত্রি অপেক্ষা করে আছে"।[৬] কবির এ অন্বেষন, এ অনাগত রাত্রির প্রতীক্ষা এ যেন তাঁর আজীবন জ্ঞানের অন্বেষন। যতদুরে যাবেন তিনি যেন আরও বেশী জ্ঞান আহরণ করতে পারবেন। এজন্যেই হয়তো কবি ছুটে বেড়িয়েছেন বাংলার এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত তথা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। কবি তাঁর গানে হয়তো পৃথিবীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন-

"কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করেছ নিকট বন্ধু
পরকে করেছ ভাই ॥"

কবি যেখানেই গেছেন প্রকৃতি তাঁর মনের খোরাক মিটিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পীত চোখ আর মন দিয়ে দেখেছেন বাংলাকে। আষাঢ়ের কালো ঘন মেঘে কবি দেখতে পেয়েছেন 'মাঝে মাঝে চোরা আলো পড়ে রাঙা হয়ে উঠেছে।'[৭] কবি আহবান করেছেন,

'এসো নীপ বনে ছায়াবিথী তলে
এসো কর স্নান নব ধারা জলে।'

চুহালি থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে কবি যে ঝড়ের বর্ণনা দিয়েছেন সেই বর্ণনায় আমাদের চোখের সামনে পরিস্কারভাবে সেই ঝড়ের ছবিটি ফুটে ওঠে। 'যারা মাঠে শস্য

কাটতে এসেছিল তারা মাথায় এক এক বোঝা শস্য নিয়ে বাড়ির দিকে ছুটে চলেছে- গরুও ছুটেছে, --- কতকগুলো ছিন্ন ভিন্ন মেঘ ভগ্ন দূতের মতো সুদূর পশ্চিম থেকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল --- বিদ্যুৎ বজ্রবৃষ্টি সমস্ত এক সঙ্গে এসে পড়ে খুব একটা তুর্কি নাচন নাচতে আরম্ভ করে দিলে।'[৭] কবির এ বর্ণনা মিলে যায় 'কৃষ্ণকলি'র সাথে-

'ঘন মেঘে আঁধার হল দেখে,
ডাকতে ছিল শ্যামল দুটি গাঁই----
আকাশ পানে হানি যুগল ভুরু
শুনলে বারেক মেঘের গুডুগুডু।'

কবি আরও বলেছেন, 'বাঁশগাছ গুলো হাউ হাউ শব্দে একবার পূর্বে একবার পশ্চিমে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল, ঝড় যেন সোঁ সোঁ করে সাঁপুড়েদের মতো বাঁশি বাজাতে লাগল। বজ্রের শব্দে আকাশের কোনখানে যেন একটা আস্ত জগৎ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।'[৭]

প্রকৃতি কবিকে সব সময়ই সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছে। আর বিশেষ করে ঝড় বাদলের দিনগুলিতে প্রকৃতির আন্দোলন কবির মনকেও আন্দোলিত করেছে। রচিত হয়েছে অসাধারণ সবগান-

'বজ্র মানিক দিয়ে গাথাঁ আষাঢ় তোমার মালা', 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিষার', 'আজি ঝর ঝর মুখর বাদর দিনে', 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি' কিংবা 'ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো আমার মুখের আঁচল খানি' ইত্যাদি।

সাজাদপুর বসে কবি একটি জ্যোৎস্না রাত্রির বর্ণনায় ইন্দিরাদেবীকে লিখেছেন, যে এখানে চমৎকার জ্যোৎস্না রাত্রি হয়। অবশ্য তিনি শহরের সাথেও তার তুলনা করেছেন, 'ময়দান' মাঠের ওপর কিংবা গির্জার চুঁড়ায় জ্যোৎস্না ধীরে ধীরে আপন নীরব অধিকার বিস্তার করে। এছাড়াও শহরে রয়েছে 'হার্মনি এবং ডিসকর্ড, আছে টেনিস, ড্রয়িং রুমে গান বাজনার আড্ডা'।[৮] কিন্তু বাংলাদেশের এই গ্রামে নিস্তব্দ রাত্রি ছাড়া আর কিছুই নেই। "একলা বসে বসে আমি যে তার ভিতরে কি অনন্ত শান্তি এবং সৌন্দর্য দেখতে পাই সে আর ব্যক্ত করতে পারিনে--- মাথাটা জানালার উপর রেখে দেই–বাতাস প্রকৃতির স্নেহ হস্তের মতো আস্তে আস্তে আমার চুলে আঙ্গুল বুলিয়ে দেয়, জল ছল ছল শব্দ করে বয়ে যায়, জ্যোৎস্না ঝিক্ ঝিক্ করতে থাকে এবং অনেক সময় 'জলে নয়ন আপনি ভেসে যায়'। অনেক সময় মনের আন্তরিক অভিমান, একটু স্নেহের স্বর শুনলেই অমনি অশ্রু জলে ফেটে পড়ে।"[৮] একাকী সন্ধ্যার এই নিভৃত অন্ধকারে বসে কবির মনের অবস্থাটা তিনি প্রকাশ করেছেন অনেক গানে। উপরে উদ্বৃত একটি লাইন থেকেই আমরা পাই 'নয়ান ভাসিল জলে' গানটি, এছাড়া 'হৃদয়ের একুল ওকুল দুকুল ভেসে যায় হায় সজনী উথলে নয়ন বারি'। এই প্রায় প্রতিটি লাইনে কবির মনের আন্তরিক অভিমান দেখতে পাওয়া যায় কোন একটি স্নেহময় স্পর্শের জন্য। 'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে' কিংবা 'রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে/তোমায় আমায় দেখা হল সেই মোহানার ধারে'– কবির মনের সেই রাতের বিরহী আবেগ এই গান গুলিতে প্রকাশ পেয়েছে।

শাহাজাদপুরের ঘাটে একদিন কবি দেখতে পেলেন একটি নৌকা লেগে আছে এবং গ্রামের অনেক গুলো 'জনপদ বধূ' তার সামনে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। কবি একটু অবাক হলেন, তাই কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য দাঁড়িয়ে দেখছিলেন সেখানে কি হচ্ছে। যখন যাত্রার সময় হলো তখন তিনি বুঝতে পারলেন, একটি বাল্য বধূকে জোরপূর্বক শ্বশুরবাড়ী পাঠানো হচ্ছে। 'গোলগাল হাতে বালা পড়া, উজ্জ্বল সরল মুখশ্রী, মেয়েটিকে নৌকায় তোলবার অনেক চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু সে কিছুতেই যেতে চাচ্ছে না- অবশেষে বহু কষ্টে তাকে টেনে টুনে নৌকায় তুললে।

----- নৌকা যখন ছেড়ে দিলে মেয়েরা ডাঙায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলো, দুই একজন আঁচল দিয়ে ধীরে ধীরে নাক চোখ মুছতে লাগলো।'[৯] কবির মনে হতে লাগলো সকাল বেলার রৌদ্র, নদী তীর এমনকি সমস্ত কিছু গভীর বিষাদে পূর্ণ হয়ে গেলো। মনে হলো সমস্ত পৃথিবীটা এত সুন্দর অথচ এমন বেদনায় পরিপূর্ণ! বিদায় বেলায় একটি নৌকো নদীর স্রোতে ভেসে যাবার মধ্যে যেন আরো একটু বেশী করুনা রয়েছে। অনেকটা যেন মৃত্যুর মত। যারা দাঁড়িয়ে থাকে তারা চোখ মুছে ফিরে যায়, যে ভেসে গেল সে অদৃশ্য হয়ে গেল। সবকিছু বেদনায় ভরিয়ে মেয়েটির এই চলে যাওয়া রবীন্দ্রনাথকে ভেতর থেকে নাড়া দিয়েছিল। হয়তো সেই সহানুভুতি নিয়েই কবি 'হৈমন্তী' চরিত্রটি তৈরী করেছিলেন। এ পর্যায়ে 'সমাপ্তীর' কথাও স্মরণ করা যায়। এই ঘটনা দেখার পর থেকে বাল্যবধূদের প্রতি সর্বদাই কবির বিশেষ করুনা লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া কবির গানে ওপারের ঘাট, খেয়ার নেয়ে প্রভৃতি শব্দ বারবার এসেছে।

'এই খালটাকে যদি নদী বলে জানতুম তাহলে ঢের বেশী ভালো লাগত।'[১০] কবি কখনো কখনো প্রকৃতিকে নিজের মতো করে কল্পনা করতে ভালবাসতেন। 'এই দুই তীরে বড়ো বড়ো নারকোল গাছ, আম গাছ এবং নানা জাতীয় ছায়াতরু, সুন্দর সবুজ ঘাস এবং অসংখ্য নীল পুষ্পিত লজ্জাবতী লতায় আচ্ছন্ন; আবার কোথাও বা কেয়াবন কিংবা যেখানে একটু গাছপালা কম সেখানে একটা ধূ-ধূ মাঠ।'[১০] হয়তো এই ধূ ধূ মাঠটিই বর্ষাকালে শস্যক্ষেত্রে পরিণত হয়। গাঢ় সবুজ শস্যক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে কবি চোখ যেন ডুবে যায়। বর্ষাকালের স্নিগ্ধ মেঘাচ্ছন্ন আনত আকাশের নীচে কিছু দূর পর পর খেজুর ও নারকোল গাছ দিয়ে ঘেরা ছোট ছোট গ্রাম শ্যামচ্ছায়াময় হয়ে আছে। কল্পনায় আচ্ছন্ন হয়ে কিংবা এই রকমই কোন গ্রামের কথা স্মরণ করেই হয়তো কবি লিখেছিলেন 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ/ আমার মন ভূলায়ারে' কিংবা 'এসো শ্যামল সুন্দর'। কবি পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা যে কতভাবে তাঁর গানে কবিতায়, গল্প-উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন তার উদাহরণ দিয়ে হয়তো শেষ করা যাবে না। এই সবুজ শ্যামলীমার সৌন্দর্য্য কবি তার বুকের মধ্যে ধারণ করতে পেরেছিলেন বলেই তার রচনায় এই নিসর্গ প্রকৃতি বার বার চলে এসেছে।

তিরণ থেকে লেখা একটি চিঠিতে কবি ইন্দিরা দেবীকে বলেছেন, 'অনেকদিন পরে কাল মেঘবৃষ্টি কেটে গিয়ে শরতের সোনার রোদ্দুর উঠেছিল। ---- হঠাৎ যখন কাল দশটা এগারোটার পর রোদ্দুর ভেঙ্গে পড়ল তখন যেন একটা নতুন জিনিস দেখে মনে অপূর্ব বিস্ময়ের উদয় হল। দিনটি বড়ো চমৎকার ছিল।'[১১] এমন নয় যে কবি বরফের দেশে আছেন যেখানে ছয়মাস প্রায় সূর্য ওঠেনা। কিন্তু বাংলাদেশে বর্ষাকালে হয়তো দু-তিন দিনের জন্য সূর্য মেঘের নীচে লুকায়, তবু এ ক্ষুদ্র অদর্শনের পরে সুর্য আবার পৃথিবীকে যে ঝলমলে রূপ দিয়েছিল সেটাই কবিকে মুগ্ধ করেছিল। তাই বুঝি কবি লিখতে পেরেছিলেন 'আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে কি জানি পরান কিযে চায়'। কবি দুপুর বেলায় স্নানাহার শেষে বারান্দার সামনে একটি আরাম কেদারার উপরে অর্ধ শয়নে শায়িত হয়ে যতদূর চোখ যায় চেয়ে থেকে জাগ্রত স্বপ্নে বিভোর থাকতেন। শরতের নির্মল আকাশ, পেজা তুলোর মতো মেঘ আর বিস্তির্ণ শস্যক্ষেত্র, 'ঘুঘু ডাক এবং মাঝে মাঝে গোরুর গলার নুপুর শোনা যায়। কাঠ বিড়ালি একবার ল্যাজের উপর ভর দিয়ে বসে মাথা তুলে চকিতের মধ্যে এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করে আবার চট্ করে পিঠের উপর ল্যাজ তুলে দিয়ে গাছের গুঁড়ি বেয়ে ডালপালার মধ্যে অদৃশ্য হচ্ছে।' [১১] বাতাস হুহু করে বইছে, নারকোল গাছের পাতা ঝরঝর শব্দে কাপঁছে। মাঠের ওপর দিয়ে বয়ে আসা বাতাসে মিশে থাকে অনেক রকম গাছের মিশেল গন্ধ। বারান্দায় বসে বসে কবি উপভোগ করেন শরতের এই মিষ্টি আমেজ –'চমৎকার রোদ্দুর উঠেছে এবং শরতের পরিপূর্ণ নদীর জল তল্ তল্ থৈ থৈ করছে।

নদীর জল এবং তীর প্রায় সমতল – ধানের ক্ষেত সুন্দর সবুজ এবং গ্রামের গাছপালাগুলি বর্ষাবসানে সতেজ এবং নিবিড় হয়ে উঠেছে। এমন সুন্দর লাগল কি আর বলব।' ১২ এই মুগ্ধতা থেকেই কবির মনে জেগেছে--- 'কে রয় ভুলে তোমার মোহন রূপে----- শরত আলোর আঁচল টুটে/ কেশের ঝলক নেচে ওঠে/ ঝড় এনেছ এলো চুলে।' কিংবা 'শরত আলোর কমল বনে/বাহির হয়ে বিহার করে / যে ছিল মোর মনে মনে।' কিংবা 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরি খেলা রে ভাই।'

বিকেল কবি পদ্মার ধারে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন, সূর্যাস্তের সময় তিনি দেখেন –' ----- নারকোল বনের মধ্যে সূর্যাস্ত হল। আমার সামনের দিকে দূরে আম বাগানে সন্ধ্যের ছায়া পড়ে আসছে এবং ---নারকোল গাছগুলির পিছনে আকাশ সোনায় সোনালী হয়ে উঠেছে। পৃথিবী যে কি আশ্চর্য সুন্দরী এবং কি প্রশস্ত প্রাণ এবং গভীরভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না।'১২ কবি তাঁর আবেগ প্রকাশ করেছেন 'এই যে তোমার প্রেম ওগো হৃদয় হরণ' গানটিতে। বেশীর ভাগ সময় কবি সন্ধ্যেটা কাটান পদ্মায় বোটে। 'এই লোকনিলয় শস্যক্ষেত্র থেকে ঐ নির্জন নক্ষত্রলোক পর্যন্ত একটা স্বম্ভিত হৃদয়রাশিতে আকাশ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে, আমি তার মধ্যে অবগাহন করে অসীম মানস লোকে একলা বসে থাকি।'১২ এর প্রকাশ দেখতে পাই 'তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যতদূরে আমি ধাই।'

পূজোর আগে, কবি তখন শিলাইদহে ছিলেন। কবি দেখেন প্রবাসীরা পূজোর ছুটিতে বাড়ী ফিরে আসছে। নৌকা ভর্তি পোটলা-পুটলী আর বাক্স-ধামা বোঝাই উপহার সামগ্রী ঘরের লোকেদের জন্য। দেখতে দেখতেই কবি ভাবেন, 'বিদেশ থেকে যে লোকটি এই মাত্র গ্রামে ফিরে এলো তার মনের ভাব, তার ঘরের লোকদের মিলনের আগ্রহ এবং শরৎকালের এই আকাশ,। এই পৃথিবী, সকাল বেলাকার এই ঝির ঝিরে বাতাস' ১৩---- সমস্ত মিশিয়ে কবিকে সুখে দুঃখে একরকম অভিভূত করে ফেলেছিল। পূজোর আনন্দে বাড়ী ফেরা এবং আত্মীয় পরিজনসহ পুরোনো বন্ধুদের সাথে পুনর্মিলনের যে আকাঙ্খা এই ব্যাপারটিই হয়তো কবিকে 'পুরানো সেই দিনের কথা' গানটি লিখতে উদ্বুদ্ধ করে।

'আয় আরেকটিবার আয়রে সখা
প্রাণের মাঝে আয়
মোরা সুখে দুঃখে কথা কব
প্রাণ জুড়াবে তায়।'

এই পুরানো দিনের কথা ভাবতে ভাবতেই কবির মনে পড়ে গেল, বহু কাল আগে ছেলেবেলায় বাবামশাইয়ের সঙ্গে বোটে করে পদ্মায় আসতে আসতে একদিন রাতে বোটের জানালা দিয়ে কবি দেখেছিলেন, 'নদীর উপরে ফুটফুটে জোছনা হয়েছে, একটি ছোট্ট ডিঙ্গিতে একজন ছোকরা একলা দাঁড় বেয়ে চলেছে, এমনি মিষ্টি গলায় গান ধরেছে – গান তার পূর্বে তেমন মিষ্টি কখনো শুনিনি।'১৩ ছেলেবেলাকার এই স্মৃতি মনে পড়ায় কবির ইচ্ছে হচ্ছিলো আবার যদি জীবনটা ঠিক সেই দিন থেকে ফিরে পেতেন, তাহলে 'তাকে আর তৃষিত, শুষ্ক, অপরিতৃপ্ত করে ফেলে রেখে দিইনে – কবির গান গলায় নিয়ে একটি ছিপছিপে ডিঙ্গিতে জোয়াড়ের বেলায় পৃথিবীতে ভেসে পড়ি।'১৩ গান আমায় যায় ভেসে যায় ভেসে যায়/ তোরা চাসনে ফিরে চাসনে দে তারে বিদায়' কিংবা 'ফিরে ফিরে ডাক দেখিরে পরান খুলে ডাক' – কবির মনে সব সময় একটি বাউল সুপ্ত থাকতো, পিছুটানহীন জীবনের প্রতি তাঁর একটা আগ্রহ ছোটবেলা থেকেই লক্ষ্য করা যায়। তিনি জীবনে যৌবনে উচ্ছ্বসিত হয়ে বাতাসের মত একবার হু হু করে বেড়াতে চেয়েছিলেন।

এ পর্যন্ত আলোচিত চিঠি গুলোর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় কবি নিসর্গ প্রকৃতির মধ্যেই বেশীর ভাগ ডুবে ছিলেন। মানুষ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা তাঁর ধীরে ধীরে এসেছে। আসলে পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি কবিকে এতোটা মুগ্ধ এবং ভাবুক করে তুলেছিল যে এই প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকা মানুষ গুলিকে তিনি এর থেকে খুব একটা আলাদা চোখে দেখতে পারেননি। কবির ভাষায়, 'পাঁড়াগায়ে এলে আমি মানুষকে স্বতন্ত্র মানুষভাবে দেখিনে- যেমন নানা দেশ দিয়ে নদী চলেছে, মানুষের স্রোতও তেমনি কলরব- সহকারে গাছপালা গ্রাম নগরের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে চিরকাল ধরে চলেছে-এ আর ফুরোয়না।'[১৪] নদীর বহমান স্রোত ধারার মতো মানুষের জীবনও বয়ে চলে হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার মধ্য দিয়ে। নদীর যেমন একুল ভাঙে ওকুল গড়ে, মানুষের জীবনেরও তেমনই দুটো দিক আছে – মানুষের জীবনের একপ্রান্তে জন্ম অন্যপ্রান্তে মৃত্যু, দুই দিকে দুই অন্ধকার রহস্য। বহু প্রাচীনকাল থেকেই নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠেছে সভ্যতা। পানির সহজ লভ্যতার কারণেই নদী যতই নিষ্ঠুর প্রকৃতি ধারণ করুক না কেন নদীর দুই তীরে গড়ে ওঠে শহর-বন্দর, গ্রাম-গঞ্জ। তাই মানুষের সাথে আত্মীক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে নদীর। এদের দুজনের মধ্যেও আছে বহু মিল। নদীর যেমন ভাঙাগড়ার খেলা তেমনি মানুষের জীবনেও রয়েছে উত্থানপতন। তবুও এরই মাঝে নদীর মতোই বয়ে চলে মানুষের বিচিত্র কর্মলীলা এবং কলধ্বনি- ফসলের ক্ষেতে কৃষক চাষ করতে করতে গান গাইছে, জেলেদের নৌকা ভেসে চলেছে, বেলা বাড়ছে - ঘাটে কেউ স্নান করছে, মেয়েরা ঘড়া ডুবিয়ে জল নিচ্ছে, ছোট ছোট ছেলেরা খেলছে, দুপুর বেলা রাখাল একাকী বসে বিরহী সুরে গান ধরেছে। কবির সুর অবশ্য একটু ভিন্ন- 'এইতো ভাললেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়/ শালের বনে ক্ষ্যাপা হাওয়া এই যে আমার মনকে মাতায়'।

কবি এই সমস্ত ঘটনার মধ্যেই সুর খুঁজে পান। নদীর ছলছল করা স্রোতে, নৌকার ছপ ছপ শব্দে, পাখির কিচির মিচির ডাকে, মৌমাছির গুনগুন, নারকোল পাতার ঝিরঝির শব্দে হাওয়ার দোলায় বোটটা আস্তে আস্তে বেঁকে যেতে যেতে তারও এক ধরনের কাতর সুর কবির অলস মধ্যাহ্নে সুরের নতুন দিগন্ত দেখায়। তাঁর মনে সুরের ঢেউ খেলা করতে থাকে। হয়তো এমনি এক মূহুর্তে কবি রচনা করেছিলেন, 'মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে' গানটি।

সুরের নেশা কবির বহু পুরানো । তরুন বয়স থেকেই পিয়ানোয় সুর তৈরী করে তাতে কথা বসাতেন তিনি। আবার কখনো জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তৈরী সুরেও কথা বসাতেন। গান তৈরীর তৃষ্ণা সর্বক্ষন তাঁর মনে মনে থাকতো। শিলাইদহে দাঁড়িয়ে কোজাগর পূর্নিমার দিন নদীর ধারে হাঁটতে হাঁটতে কবি ভাবছিলেন, 'একী, এ কিসের জন্যে, এ কিসের উদ্বেগ, এ নিরুদ্দেশ নিরাকুলতার নাম কি, অর্থ কি– হৃদয়ের মাঝখানটা বিদীর্ণ করে কবে সেই সুর বেরোবে যার দ্বারা এর সংগীত ঠিক ব্যক্ত হবে![১৫] কবির এই আকাঙখার প্রকাশ আমরা পাই অনেক গানে– 'পূর্ন চাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে', 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গেছে' , কিংবা 'আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে'।

বাংলার নিসর্গ প্রকৃতি কবিকে মুগ্ধ করে রাখলেও জমিদার হিসেবে প্রজাদের সাথে তার যোগাযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গরীব দুঃখী প্রজাদের নানা দুঃখ কষ্ট কবি ধীরে ধীরে জানতে পেরেছেন, যে কারনে কবির মনে তাদের প্রতি একধরনের মায়ার সৃষ্টি হয়। তিনি প্রকৃতির পাশাপাশি জন জীবনের নিগুঢ় রহস্য অনুধাবন করতে চেষ্টা করেন। নদীর মাঝখানে বেঁধে রাখা বোটে বসে বসে কবি অবলোকন করতেন নদীর দুই পাড়ের জনজীবন। 'আমার ডান দিকের পারে চরের উপর চাষারা চাষ করছে এবং মাঝে মাঝে গরুকে জল খাইয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমার বাম পারে শিলাইদহের নারকোল এবং আম বাগান ঘাটে মেয়েরা কাপড় কাঁচছে, জল তুলছে ,

স্নান করছে এবং উচ্চৈস্বঃরে বাঙ্গাল ভাষায় হাস্যালাপ করছে'। [১৬] অল্প বয়সী মেয়েরা একবার স্নান সেরে উপরে উঠে আবার জলে ঝাপিয়ে পড়ে। কিন্তু পুরুষরা গম্ভীর ভাবে এসে গোটা কতক ডুব মেরে স্নান সমাপ্ত করে। এদিকে 'মেয়েদের যেন স্নান শেষ হতেই চায় না। মেয়েদের যেন জলের সঙ্গে বেশী ভাব। পরস্পরের যেন একটা সাদৃশ্য ও সখিত্ব আছে- জল এবং মেয়ে উভয়েই বেশ ছল ছল জল জল করতে থাকে।--- সকল পাত্রে আপনাকে স্থাপন করতে পারে'।[১৬] দুঃখে শোকে তারা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে পারে, কিন্তু আঘাতে একবারে ভেঙ্গে দুখানা হয়ে যায়না। পরের চিঠিতে কবি বাংলার মেয়েদের নিয়ে সরল ছন্দে সুন্দর সরস করে লেখার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। 'ছোট নদীর কলোরবের মতো, ঘাটের মেয়েদের উচ্চ হাসি মিষ্টি কণ্ঠস্বর এবং ছোট খাটো কথাবার্তার মতো --- প্রস্ফুটিত শস্য ক্ষেতের গন্ধের মতো বেশ সাদাসিধে অথচ সুন্দর এবং শান্তিময়'। [১৭] এই আগ্রহই কবিকে রচনা করতে সাহায্য করেছে- 'রমনী', 'বধু', 'হৃদয় যুমনা' সহ আরও অনেক কবিতা।

বেশ কিছুদিন বোলপুর থেকে কবি আবার শিলাইদহে ফিরে আসেন। তখন আষাঢ় মাস শুরু হয়েছে। কবির ভাষায় 'মেঘদূত লেখার পর থেকে আষাঢ়ের প্রথম দিনটা একটা বিশেষ চিহ্নিত দিন হয়ে গেছে- নিদেন আমার পক্ষে'। [১৮] হয়তো কবির কথাই ঠিক, আষাঢ় তার আগমনের প্রথম দিনে আকাশ জুড়ে তার সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিয়ে উদয় হয় কবির সামনে। 'এই সমস্ত রং, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোক ভূলোকের মাঝখানে সমস্ত-শূন্য-পরিপূর্ন করা শান্তি এবং সৌন্দর্য, এর জন্য কি কম আয়োজন চলছে !' [১৮] প্রকৃতির এ বিশাল আয়োজন বৃথা যায়নি। কবি লিখেছেন–'নববর্ষা', 'আষাঢ় সন্ধ্যা', 'বর্ষামঙ্গল', 'আষাঢ়', 'বর্ষার রূপ' ইত্যাদি কবিতা। গানও রচনা করেছেন অনেক–'আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে', 'ও আষাঢ়ের পূর্নিমা আমার', 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল', 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে' ইত্যাদি। প্রকৃতির প্রাচুর্য্যপূর্ণ আয়োজনে কবিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, 'আমার জীবনে কোনটি সুর্যোদয় সুর্যাস্তে রাঙ্গা, কোনটি ঘন ঘোর মেঘে স্নিগ্ধ নীল, কোনটি পূর্নিমার জ্যোৎস্নার সাদা ফুলের মতো প্রফুল্ল, এগুলি কি আমার কম সৌভাগ্য!'[১৮] একথা ভেবে কবি পৃথিবীর দিকে আবারও ভাল করে চেয়ে দেখেন। তিনি চান জীবনের প্রত্যেক সূর্যোদয়কে স্বজ্ঞান ভাবে অভিবাদন করতে এবং প্রত্যেক সূর্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মতো বিদায় দিতে, এমন সুন্দর দিন রাত্রি গুলি যে জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে, তিনি চান তার সবটুকু রস গ্রহন করতে। তিনি বলেন, 'সৌন্দর্য আমার পক্ষে সত্যিকার নেশা'।[১৮] এজন্যেই কবি রচনা করতে পেরেছেন, 'আকাশ ভরা সুর্যতারা বিশ্ব ভরা প্রান/ তাহারই মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান/বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান'। কিংবা 'জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রন/ধন্য হল মানব জীবন'। আরও বলা যায়–'বিশ্ববীনা রবে বিশ্বজন মোহিছে/স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে নদী নদে গিরি গুহা পারাবারে'।

কবির বোট নদীর দুই তীরের মাঝখান দিয়ে ভেসে যেতে যেতে গ্রাম-গঞ্জ, শস্যক্ষেত্র, চর, বিচিত্র সব ছবি কবির সামনে দেখা দিচ্ছে আবার চলে যাচ্ছে। আকাশের মেঘ তারই মতন ভেসে চলেছে, সন্ধ্যের সময় নানা রকম রঙ ফুটছে, জেলেরা মাছ ধরছে, সর্বদাই জলের এক প্রকার তরল শব্দ শোনা যাচ্ছে। দিন শেষ হয়ে রাত্রি নেমে আসছে বিস্তৃত, শ্রান্ত জলারাশির উপর। রাতের আকাশ সমস্ত তারার আলো জ্বালিয়ে মাথার উপর জেগে আছে। গভীর রাতে যে দিন ঘুম নেই, সেদিন কবি বসে বসে চারিদিক প্রত্যক্ষ করেন– 'অন্ধকারাচ্ছন্ন দুই কূল নিদ্রিত – মাঝে মাঝে কেবল গ্রামের বনে শৃগাল ডাকছে এবং পদ্মার নীরব খরস্রোত ঝুপঝাপ করে পাড় খসে খসে পড়ছে– এই সমস্ত পরিবর্তমান ছবি যেমন যেমন চোখে পড়তে থাকে অমনি

মনের ভিতরে একটা কল্পনার স্রোত বইতে থাকে'।[১৯] কবি ভাবেন তার ছোট বেলার কথা, যখন তিনি আরব্য উপন্যাস পড়তেন , কিংবা সিন্দাবাদের সাথে নতুন নতুন দেশে ঘুরে বেড়াতেন, ঠিক এখন যেমন নৌকায় করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সিন্দাবাদ বানিজ্য করতে যেতেন, আর কবি জমিদারী কাজে। একই চিঠিতে কবি আরো লিখেছেন 'ছেলেবেলায় যদি আরব্য উপন্যাস রবিনসন ক্রুসো না পড়তুম, কোন রুপকথা না শুনতুম, তাহলে নিশ্চয় বলতে পারি, ঐ নদী তীর এবং মাঠের প্রান্তের দূর দৃশ্য দেখে ঠিক এমন ভাব মনে উদয় হতো না'। [১৯] এই ভাবে বাস্তবের সাথে কল্পনাকে জড়িয়ে জড়িয়ে কবি রচনা করেছেন নানা উপন্যাস, গল্প, কবিতা । প্রতিদিন তাঁর নিজেরই অজ্ঞাতে জড়িয়ে গেছে ঘটনার সঙ্গে গল্পের, গল্পের সঙ্গে ছবির, গেঁথে গেছে সামান্যের সঙ্গে বড়। এভাবেই ধীরে ধীরে ভারী হয়েছে তাঁর রচনাবলী।

যে কবি বাংলায় সাহিত্য রচনা করে এ ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন, বাংলাকে বিশ্বের দরবারে পরিচিতি দিয়েছেন– তিনি রবীন্দ্রনাথ। বাংলার যিনি মাথার মুকুট, তিনি তাঁর লেখায় অনেক স্থানে নিজেকে এই বৃহৎ পৃথিবীর কাছে অতিক্ষুদ্র এবং এই বিপুল মানব সংসারে বড়ই অসহায় ও তুচ্ছ প্রতিপন্ন করেছেন। 'আমার কাছে আমি যত বড়ই হই আমাকে দিয়ে সমস্ত বিশ্ব পরিপূর্ণ করতে পারিনে- অধিকাংশ জগৎই আমার অজ্ঞাত, অজ্ঞেয় --- তাই এই প্রকান্ড জগতে আপনাকে অত্যন্ত খাটো, পরিত্যক্ত এবং প্রান্তবর্তী বলে মনে হয়'।[২০] কবির এ ভাবনার সাথে মিলে যায় 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভূ' গানটি।

শাহজাদপুর বসে ইন্দিরা দেবীকে লেখা পত্রে (২৯ জনু ১৮৯২) কবি তাঁর 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পের মূল চরিত্র পোষ্টমাষ্টারের কথা বলেছেন, যদিও চিঠির কোথাও তার নাম নেই। রবীন্দ্রনাথের শাহজাদপুর কুঠিবাড়ির একতলাতেই ছিল পোষ্টঅফিস আর এই পোষ্টমাষ্টার প্রায়ই করিব সঙ্গে গল্প করতে আসতেন। লোকটির বেশ মজার চরিত্র ছিল এবং রবীন্দ্রনাথ তাতে প্রভাবিত হয়েই লিখেছিলেন গল্পটি।

গ্রামীন প্রেক্ষাপটে একটি পল্লী বালিকার জীবন চরিত নিয়ে লেখা ছোটগল্প 'সমাপ্তী' কিংবা 'চোখের বালি' উপন্যাসে কবি মেয়েদের বিয়ের পর নতুন জীবনে প্রবেশ এবং এই জীবনকে তারা কিভাবে মানিয়ে নেয় এই সমস্ত ভাবনা মেয়েদের মতো করে ভাবতে চেষ্টা করেছেন। ৩০ জুন ১৮৯২ শাহ্জাদপুর থেকে কবি ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিতে এ বিষয়ে তার মনোভাব প্রকাশ করেছেন, 'আমার পক্ষে কল্পনা করা দুরূহ-একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে অপরিচিত স্থানে দিনরাত কেমন করে কাটে! মনে করলে অসহ্য শ্রান্তি বোধ হয়। তার কারণ আমি নিজে পুরুষ মানুষ'।[২১]

পূর্ববঙ্গে এবার কবির দ্বিতীয় বছর। শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহে তিনি ইন্দিরা দেবীকে লিখেছিলেন -'তোরা যখন এসেছিলি তখন নদীতে প্রায় একতলা সমান উঁচু পাড় দেখেছিলি, এখন সে সমস্ত ভরে গিয়ে হাত খানেক দেড়েক বাকী আছে মাত্র'। [২২] কবি নদীর রোখকে লেজ দোলানো কেশর ফোলানো ঘাড় বাঁকানো তাজা বুনো ঘোড়ার সাথে তুলনা করেছেন। নদীর বড় বড় ঢেউ ফুলে ফুলে উঠছে। এই ক্ষ্যাপা নদীর উপরে ভরা নদীর কলোরব শুনতে শুনতে কবির বোট দুলতে দুলতে চলেছে। তার ছল ছল খল খল শব্দে ভারী একটা যৌবনের মত্ততার ভাব। কবি ভাবছেন, 'এ তবু গড়ুই নদী। এখান থেকে আবার পদ্মায় গিয়ে পড়তে হবে – তার বোধহয় আর কুল কিনারা দেখবার জো নেই। সেই মেয়ে বোধহয় একেবারে উন্মাদ ক্ষেপে নেচে বেড়িয়ে চলেছে'।[২২] বর্ষার পদ্মাকে কবি কালীর মূর্তির সাথে তুলনা করেছেন। নৃত্য করছে, ভাঙছে, চুল এলিয়ে ছুটে চলেছে। নদীর দুই তীর একেবারে অবহেলায় ছার খার করে দিয়ে চলেছে। এসময় না দেখলে নদীর আনন্দ বোঝা যায় না। এ প্রচন্ড নদীতে বোটে ঘুরতে ঘুরতে কবি অনেক সময়

দুর্ঘটনার শিকারও হয়েছেন। তার পরেও তিনি বলেন, ---- তাকে (নদীকে) আমি এক কানাকড়ি কেয়ার করিনে – তা তিনি জলে ঢেউই তুলুন আর আকাশ থেকে ফুঁই দিন। আমি আমার পাল তুলে চললুম'।২২ কবির এই কথার সাথে সাথে 'ওগো নদী আপন বেগে পাগল পারা', কিংবা 'তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে' গান গুলোর কথা মনে পড়ে যায়। দ্বিতীয় গানটির আভোগে কবি লিখেছেন – 'ঝড়কে আমি করবো মিতে/ ডরবো না তার ভ্রূকুটিতে/ দাও ছেড়ে দাও ওগো আমি/ তুফান পেলে বাচি', এ চারটি লাইন যেন কবির চিঠির শেষ লাইনেরই কাব্যিকরূপ।

কবি তখন শিলাইদহে। তিনি ভাবছিলেন, 'জলের মধ্যে এমন অগাধ পরিপূর্ণতা, স্থলের মধ্যে এমন শ্যামশ্রী, আকাশে এমন নির্মল নিলীমা স্বর্গে-মর্ত্যে একটা বৃহৎ-গভীর-অসীম প্রেমাভিনয়।'২৩ প্রেমের এমন একটা গুণ আছে, যার কাছে জগতের বড় বড় ঘটনাকেও তুচ্ছ মনে হয়। এখানকার আকাশের মধ্যে তেমনি একটি ভাব পরিব্যাপ্ত, এর কাছে কলকাতার দৌড় ঝাপ, হাস-ফাঁস ভারী ক্ষুদ্র মনে হয়। 'কি জানি পরান কি য়ে চায়'২৩ কথাটি হয়তো তিনি শহরে থাকলে বলতেন না কিন্তু এখানে বলতে কোন বাঁধা নেই। অনেক পুরোনো রসহীন কবিতা কলকাতায় যেটি উপহাসের পাত্র সেটি এখানে আসা মাত্র রসপূর্ণ, পল্লবিত, মুকুলিত হয়ে ওঠে। কবির মতে, 'কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী', ২৪ জোড়াসাকোর পুকুরের ধার, বটতলা, বাড়ীর ভেতরের বাগান ও অনাবিস্কৃত ঘরগুলির থেকে শুরু করে বাইরের জগৎ এবং ভৃত্যদের মুখে শোনা রূপকথা গল্প কিংবা ছড়া গুলো কবির অন্তরে ছেলেবেলা থেকেই নানা কল্পনার জগৎ সৃষ্টি করত। এই কল্পনার রাজ্যটি প্রকাশ পায় কবিতায় । এই মুহুর্তে মনে পড়ে যায় 'বীরপুরুষ' কবিতাটি। 'মনে কর যেন বিদেশ ঘুরে , মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে' সেই কল্পনা প্রবন ছোট্ট রবি হয়ত কখনও ভাবেননি, কবিতাই তাঁকে নোবেল পুরস্কারের সম্মানে ভূষিত করবে আর বাঙ্গালী চিরকাল তাঁকে বলবে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ।

কবি দিনের পর দিন জলি বোটে রাত কাটিয়েছেন। কিন্তু কখনোই এর প্রতি তাঁর বিরক্তি আসেনি। বরং বোটের উপরে বিছানা পেতে চিৎ হয়ে শুয়ে তারাখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে ভেবেছেন, আবার কি এ আকাশের নীচে জন্মগ্রহন করব? 'কখনও এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায় এই নিস্তব্ধ গোরাই নদীটির উপর বাংলাদেশের এই সুন্দর একটি কোণে এমন নিশ্চিত মুগ্ধ মনে জলি বোটের উপর বিছানা পেতে পড়ে থাকতে পাব ?'২৫ কবির বুকে দীর্ঘ শ্বাসের মতো জমা হয়, আর কোন জন্মে এমন একটি সন্ধ্যা তিনি হয়তো ফিরে পাবেন না। গোরাই নদীর ওপরে বাংলাদেশের এই সুন্দর একটি কোণে নিশ্চিত মুগ্ধ মনে আকাশ দেখা হয়তো আরও কখনো হবে না। মৃত্যু ভাবনা সর্বদাই কবিকে তাড়িত করে তাই অনেক সুন্দর এবং আনন্দের মাঝে থেকেও কবির মনে হারাবার বেদনা জাগে। 'যখন পড়বেনা মোর পায়ে চিহ্ন এই বাটে /আমি বাইব না মোর খেয়া তরী এই ঘাটে ' কিংবা 'আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে', 'তুমি তো সেই যাবেই চলে', 'যদি হায় জীবন পুরণ নাই হল' ইত্যাদি অসংখ্য গানে কবি বেদনার হাহাকার তাঁর বুকের মধ্যে ধরে রাখতে চেয়েছেন। হয়তো এই বেদনা বোধ না থাকলে রবীন্দ্রনাথ কবি হয়ে উঠতে পারতেন না। তাই কবির কাছে এই বেদনার মূল্য অনেক, কখনো তিনি দুঃখ বেদনা থেকে পালিয়ে বেড়াতে চাননি বরং বেদনাকে নিজের মধ্যে লালন করেছেন-

'বেদনা কী ভাসায় রে মর্মে মর্মে
মর্মরিয়া ওঠে গুঞ্জরী ক্ষণে ক্ষণে'।

বেদনাকে বুকে জড়িয়ে কবি সুখের কথা ভেবেছেন, 'প্রত্যেক খন্ড অবস্থাই আমাদের কাছে বড় বেশী প্রাধান্য ধারন করে।'২৬ অর্থাৎ যখন সুখ তখন অধিক সুখ আর যখন দুঃখ তখন

তা একান্ত তীব্র হয়ে ওঠে। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কখন যে সুখ আর কখন যে দুঃখ এর কোন ঐক্য বা সামঞ্জস্য নেই। তাই খন্ড খন্ড বিচ্ছিন্ন সুখ-দুঃখ নিয়েই জীবন পার করতে হয়।

কবি তাই সুখ ব্যাপারটি পুরোপুরি ঈশ্বরের ওপর ছেড়ে না দিয়ে নিজস্ব উপায়ে সুখের সময়টা কিছুটা দীর্ঘ স্থায়ী করার চেষ্টা করেছেন। 'কোন জিনিস যথার্থ উপভোগ করতে গেলে তার চতুর্দিকে অবসরের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিতে হয়-তাকে বেশ অনেক খানি মেলিয়ে দিয়ে, ছড়িয়ে দিয়ে, চতুর্দিকে বিছিয়ে দিয়ে, তবে তাকে ষোল আনা (সুখ) আয়ত্ব করা যায়'।[২৭] যা কিছু ভাল লাগে অতি লোভে তার সমস্তটা একত্রে ভোগ করতে গিয়ে সেই সুখ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। সুখের ইচ্ছেটার দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে যেতে অনেক সময় সুখটাকে ডিঙ্গিয়ে চলে যায়। কবির রচনায় তাই পাই-'এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মিলে না'।

কিন্তু যাদের জীবনে দুবেলা দুমুঠো খেতে পেলে আর মাথার ওপরে একটু খানি চাল থাকলেই সুখ, তাদের এত অল্প চাহিদা সত্ত্বেও দুঃখই যেন বেশীর ভাগ জায়গা দখল করে থাকে। সুখ যখন আসি আসি করছে, মাঠ ভর্তি ফসল আর তখনই অতি বৃষ্টিতে সমস্ত মাঠ-ঘাট ডুবে যায়। চর থেকে ধান কেটে আনবার জন্য চাষারা 'কেউ টোগা মাথায়, কেউ বা একখানা কচুপাতা মাথার উপর ধরে ভিজতে ভিজতে খেয়া নৌকায় পার হচ্ছে-বড়ো বড়ো বোঝাই নৌকোর মাথার উপর মাঝি হাল ধরে বসে বসে ভিজছে, আর মাল্লারা গুন কাঁধে করে ডাঙ্গার উপর ভিজতে ভিজতে চলেছে'।[২৮] এমন দুর্যোগপুর্ন আবহাওয়া তবু পৃথিবীর কাজকর্ম বন্ধ নেই। রাখাল মাঠে গুরু চরাচ্ছে, মাঝি নৌকা বাইছে, চাষি ধান কাটছে, এমন কি জেলেরা ফুলে ওঠা টইটুম্বুর নদীর মাঝে জীবন সংশয়ের আশংকা থাকা সত্ত্বেও জাল ফেলে মাছ ধরছে। জীবিকা নির্বাহের কাজ বন্ধ থাকাবার জো নেই, শুধু পুরুরাই নয় বাড়িতে মেয়েরাও সমস্ত দিন ভিজে ভিজে গৃহ কর্ম করে চলেছে। কবি ভেবে অবাক হন- 'এত জলও আকাশে ছিল'![২৯] তাঁর বোটের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া চাষাদের কাঁচা ধান বোঝাই নৌকো থেকে হাহাকার ধ্বনি শুনতে পান। কাঁচা ধান কেটে আনা চাষাদের পক্ষে যে কি মর্মান্তিক তা কবি অনুধাবন করেন। রবীন্দ্রনাথ এদের জন্য দুঃখিত হন। এই নির্দোষ হতভাগ্যদের নালিশ কোথাও গিয়ে পৌছুচ্ছে না – বৃষ্টি যেমন পড়ছিল তেমনি পড়ছে। নদী যেমন বাড়বার বেড়েই চলছিল।

বর্ষার এই রনরঙ্গিনী স্রোতশ্বিনী পদ্মার ওপর দিয়ে কবির বোট চলেছে শাহজাদপুরের দিকে। ছোট খাট গ্রাম, ঘাট , বাজার, বাঁশঝাড়, আম-কাঠাল-কুল-খেঁজুরের গাছ আরও অনেক লতাগুল্মের ঝোপঝাড় পেরিয়ে নিমগ্ন প্রায় ধান এবং পাটের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ক্রমাগত এঁকেবেঁকে সন্ধ্যের দিকে শাহজাদপুরে পৌছেন (৭ জুলাই ১৮৯৩, ২৪ আষাঢ় ১৩০০)। পরদিন সকালের একটু খানি রোদ আর চঞ্চল বাতাসে নানান জাতের পাখির কিচির মিচির শুনতে শুনতে কবি শাহজাদপুর কাছারীর দোতলায় একটি ঘরে জানালার ধারে বসে লোকালয়ের কর্ম প্রবাহ নিরীক্ষণ করছিলেন। উলঙ্গ ছেলেমেয়েদের খেলার কল্লোল , রাখালের করুন সুরের গান, কলুর খানি তীক্ষ্ণ স্বর, দাঁড়ের ঝুপঝাপ ধ্বনি, পাখির ডাক এবং পাতার সরসর-সব কিছু মিলিয়ে কবির কাছে মনে হচ্ছিল এ সমস্ত কর্মকোলাহল যেন 'একটা বড়ো সোনাটার অন্তর্গত।'[৩০]

এ সময় শাহজাদপুরে বসেই 'বড়ো বেদনার মতো' গানটি তিনি কিভাবে লিখেছিলেন তা ইন্দিরা দেবীকে লেখেন- 'ও গানটা আমি নাবার ঘরে অনেকদিন একটু একটু করে সুরের সঙ্গে সঙ্গে তৈরী করেছিলুম --- মাথায় এক টিন জল ঢেলে পাঁচ মিনিট গুন্ গুন্ করলে কর্তব্যজ্ঞানে বিশেষ আঘাত লাগেনা' – [৩১] সর্বদাই তখন তিনি গানটি গুন গুন করতেন এবং গাইতে গাইতে তাঁর মধ্যে বেশ একটা ভাবের জন্ম নিতো। সুতরাং বোঝা যায় এটি কবির অত্যন্ত প্রিয় একটি

গান সে ব্যাপারে সন্দেহ নেইা। কবি লিখেছেন, 'আমি একলা খুব মুগ্ধ ও তদগত চিত্তে অর্ধনিমীলিত নেত্রে গেয়ে থাকি' ; [৩১] জীবনটা ও পৃথিবীটা তখন তাঁর কাছে একটি রৌদ্রজ্জল অশ্রুবাষ্পে আবৃত হয়ে রংধনুর সাত রঙে রঞ্জিত হয়ে দেখা দেয় – প্রতিদিনের সত্যকে চিরদিনের সৌন্দর্যের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া যায়, যার মধ্যে কষ্ট গুলো আভাময় হয়ে উঠে।

কবি বোটে করে শাহজাদপুর থেকে পতিসর আসবার পথে ঠিক গোধুলীর সময় আর একটি নৌকো তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। বেশ কয়েকজন ছোকরা ঝপঝপ করে দাড় ফেলছিল। আর সেই তালে তালে গান গাইছিল-

'যোবতী ক্যান বা কর মন ভারী ?
পাবনা থাক্যে আন্যে দেব
ট্যাকা দামের মোটরী'-[৩২]

গ্রাম্য কবির লেখা এই গানের ভাবে পৃথিবীর প্রায় সকল কবিই কিছুনা কিছু হয়তো লিখেছেন। আকাশের চাঁদ , তারা থেকে শুরু করে সিন্ধু সেঁচে মুক্ত এমন কি নীল পদ্ম- এমনই যা কিছু সহজ লভ্য নয় কবিরা তার প্রেয়সিকে তাই দিতে চেয়েছেন। কিন্তু গাঁয়ের এ সহজ সরল যুবতী মাত্র এক টাকা দামের মোটরীতেই খুশি, একথা ভেবে কবি মুগ্ধ হন। আরো একটি বিষয় কবিকে আন্দোলিত করে, 'যুবতীর মন ভারী হলে জগতে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, এই বিলের প্রান্তেও তার একটা সংবাদ পাওয়া গেল'। [৩২]

বিলের মধ্য দিয়ে কালীগ্রামের দিকে চলতে চলতে রবীন্দ্রনাথ কবিতা এবং নদীর দু-তীরের কথা ভাবছিলেন । দুই দিকে দুই তীর দিয়ে বাধা না থাকলে জলস্রোতের তেমন শোভা থাকেনা - কারন ডাঙ্গা বা তীর ছাড়া শুধু জল বড়ো একঘেয়ে। সে রকম ভাষাকে ছন্দের বাঁধনে বাধলে ছন্দ তীরের কাজ করে, ভাষাকে একটি বিশেষ আকার দেয় যাতে ঐ ছন্দোবদ্ধ রূপটির একটি সুন্দর চোহারা ফুটে ওঠে। 'তীরবদ্ধ নদীগুলির যেমন একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে,---- ছন্দের দ্বারা কবিতা সেই রূপ এক একটি মুর্তিমান অস্তিত্বের মতো দাঁড়িয়ে যায়'।[৩৩] নদীর যেমন স্রোত আছে, বেগ আছে - ছন্দ কবিতাকে তেমনি একটি গতিতে নিয়ে আসে। ছন্দে বাঁধা কবিতার নদী স্রোতের মতো একটি বেগ আছে। 'একটি সুনির্দিষ্ট বন্ধনের মধ্যে দিয়ে বেগে প্রবাহিত হয়ে মনের মধ্যে আঘাত করে বলেই সৌন্দযের এমন অনিবার্য শক্তি',[৩৩] বন্ধনের মধ্যে থাকলে শুধু গতির সৌন্দর্যই নয়, ধ্বনির সৌন্দর্য তথা আকারের সৌন্দর্য। এ প্রসঙ্গে দাদরা ৩/৩ ছন্দে একটি গানের উদাহরণ দেওয়া যায়। 'আমি তখন ছিলেম মগন গহন' প্রায় প্রতিটি শ্বদ ছন্দের সাথে মিলিয়ে ৩ অক্ষরের। অনেক সময় তিনি নতুন ছন্দও আবিস্কার করেছেন এবং সে ছন্দের গান বেঁধেছেন- কাপিছে দেহলতা থরথর (৩/৪/৪)।

এই ছন্দোবন্ধনের সৌন্দর্য কেবল কবিতাই নয়, এ সৌন্দর্য কবি নারী পুরুষের মধ্যেও খুঁজে পেয়েছেন। 'মেয়েরা একটি স্বাভাবিক ছন্দের বন্ধনে সম্পূর্ন সুন্দর হয়ে তৈরী হয়ে এসেছে। আর, পুরুষরা গদ্যের মতো বন্ধনহীন এবং সৌন্দর্যহীন, তাদের আগা গোড়ার মধ্যে কোন একটি ছাদ নেই'।[৩৪] মেয়েদেরকে প্রকৃতি মা হিসাবে তৈরী করেছে। কিন্তু পুরুষের সেরকম কোন বন্ধন নেই। কবির মতে, সে কারনেই পুরুষ বিক্ষিপ্ত, শতমুখী, এবং উচ্ছৃংখল প্রবৃত্তি। তাই চিরকাল কবি সাহিত্যকেরা মেয়েদের সাথেই গানের সুর, কবিতা ছন্দ, ফুল, লতা কিংবা নদীর তুলনা করেছেন। কবি আরও বলেছেন, 'প্রকৃতির সমস্ত সুন্দর জিনিস যেমন সুসম্পন্ন, সুসম্বন্ধ, সুসংহত, সুসংযত, মেয়েরাও সেই রকম'।[৩৪] কবি নিজেও তার প্রচুর কবিতা ও গানে নারী সৌন্দর্যের কথা লিখেছেন-

'দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ

পড় দেহ ঘেরি মেঘ নীল বেশ
কাজল নয়নে যুঁথি মালা গলে' কিংবা
'কাপিঁছে দেহলতা থরোথরো
চোখের জলে আখি ভরভর', আরও বলা যায়,
'কালো তা সে যতই কালো হোক
দেখেছি তার কালহরিন চোখ, কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' ।
'আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ ভাসে' ইত্যাদি ।

সৌন্দর্যের পূজারী রবীন্দ্রনাথ। পূর্ববঙ্গের নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ পরিবেশে কবিবন্ধু পাতাতেন সন্ধ্যা তারাটির সাথে, চাঁদের সাথে কিংবা ভোরের সুখতারাটির সাথে। শেষ বিকেলে পদ্মার চরে ভ্রমন করতে করতে কিংবা কাজ শেষে ফেরার পথে সন্ধ্যে বেলা যখন তিনি সন্ধ্যা তারাটি দেখতে পেতেন তখন ঘরে ফিরবার তাগিদ অনুভব করতেন। '-----সন্ধ্যা তারাটি এই আমার ঘরের গৃহলক্ষী, আমি কখন ফিরে আসব এই জন্য সে উজ্জ্বল হয়ে সেজে বসে আছে' ।[৩৫]

অনেক সময় কবি বোটেই রাত্রিযাপন করতেন। সন্ধ্যে পেরিয়ে আকাশে চাঁদ উঠতেই তিনি বোটে শুয়ে নদীর ওপর চাঁদের ঝিকিমিকি আলোর স্রোত উপভোগ করতেন গভীর রাত পর্যন্ত। 'চাঁদের খন্ড অনেক ক্ষণ হল উঠেছে - চতুর্দিক একেবারে নিস্তব্ধ নিদ্রিত,--- আমার এই বোটে কেবল বাতি জ্বলছে, আর সব জায়গায় আলো নিবেছে'। [৪২] এমনি কোন রাতের স্মৃতি বুকে নিয়ে হয়ত কবি লিখেছিলেন-

'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গেছে
উছলে পড়ে আলো,
ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধ সুধা ঢালো'

এমনি করেই নদীর মিষ্টি হাওয়ার দোলায় কবি ঘুমিয়ে পড়েন। খুব ভোরে পাখির ডাকে কবি জেগে দেখেন শুক তারাটি তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে- 'ভোরের বেলায় প্রথম বৃষ্টিপাতেই শুকতারাটি দেখে, তাকে আমার একটি বহু পরিচিত সহাস্য সহচারী না মনে করে থাকতে পারিনে- সে যেন একটি চিরজাগ্রত কল্যানকামনার মতো সঠিক আমার নিদ্রিত মুখের উপর প্রফুল্ল স্নেহ বর্ষণ করতে থাকে' ।[৩৫]

১৮৯৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে (শিলাইদহ) ছোট গল্প লেখার প্রতি কবির বিশেষ ঝোক দেখা যায়। কবি ইন্দিরাদেবীকে চিঠিতে লিখেছেন, 'গল্প লেখবার একটা সুখ এই - যাদের কথা লিখব তারা আমার দিন রাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধ ঘরের বিরহ দুর করবে এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের পরে বেড়িয়ে বেড়াবে' ।[৩৬] সম্ভবত এই সময়ে কবির একাকীত্ব ভারী হয়ে উঠেছিল, আর তা ভরিয়ে তুলবার জন্যই নতুন কিছু সৃষ্টির এবং তারমধ্যে ডুবে থাকাটাই কবির উদ্দেশ্য। আবার দেখাযাচ্ছে তাঁর একাকীত্বে কেউ প্রবেশ করুক সেটাও কবির কাম্য নয়। 'আমি আমার কাজের অবসর গুলি কল্পনা দিয়ে ভরাট করে নিয়েছি - সে জায়গায় হঠাৎ মানুষ এসে পড়লে ভারী একটা গোলযোগ বেঁধে যায়' ।[৩৭] কবি তার নির্জনতার একাকী থাকতে চান। তাঁর কল্পনার রাজ্যে, ভাবের রাজ্যে তিনি নিমগ্ন মনে একাগ্রচিত্তে থাকতে চান। যেখানে আর কারো প্রবেশ কবির কাম্য নয়। কারন যখন তিনি একা থাকেন বিশ্বভ্রহ্মান্ডের নানা বিষয় নিয়ে ভাবেন। এই ভাবনার মধ্য দিয়েই তিনি আবিস্কার করেন জীবনের অনেক গুঢ় রহস্য।

'তুমি কি কেবলই ছবি, শুধু পটে আঁকা' কবির এ গান - অনেক চিন্তা, অনেক বিশ্লেষনের ফল। কবি বলেন সুন্দর জিনিসটা আসলে স্বপ্নের মতো এবং এ কারনেই তা ছবির মতো। মুলত

ছবিতে আমরাও কোন জিনিসের কেবলমাত্র একটি অংশ দেখতে পাই এবং সেই অংশটা আর্টিষ্ট সবচেয়ে সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছেন বলে সেটা আমাদের কাছে মুল উপভোগের বিষয়। কবি লিখেছেন, 'আর্ট মাত্রেরই কাজ হচ্ছে, বিশ্বের যেটুকু আমাদের মনোহরণ করে সেই টুকুকে সযত্নে তার অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমাদের কাছে অবিমিশ্র উজ্জ্বল করে ধরা'।[৩৮] এই জন্যে কবির মতে বিশুদ্ধ আর্ট হচ্ছে, ছবি এবং গান। মানুষের ভাষার তুলনায় তার তুলি এবং কন্ঠের সুর অনেক বেশী সুন্দরের দাবী রাখে। সে জন্যেই আমরা সুন্দরের বর্ণনা করতে গিয়ে ছবির মতো, গানের মতো, কিংবা স্বপ্নের মতো সুন্দর কথা গুলি বার বার ব্যবহার করি।

১৮৯৪ সালের আগষ্ট মাস কবি তখন শিলাইদহে, সমস্ত রাত অঝোড় ধারায় বৃষ্টি হয়ে গেছে। এমন কি ভোরবেলাতেও বৃষ্টি কম হবার কোন লক্ষন নেই। 'আউষ ধানের ক্ষেতের উপর খুব সজল শ্যামল অবনত মেঘ স্তুপে স্তুপে স্তরে স্তরে জমে রয়েছে---- পদ্মার খোলা জলরাশি ছায়ায় আছন্ন হয়ে এসেছে, নদীর এক তীর থেকে আর এক তীর পর্যন্ত মেঘের সঙ্গে মেঘ আবদ্ধ হয়ে সমস্ত আকাশ অধিকার করে নিয়েছে'।[৩৯] আকাশে মেঘের এই তুমুল আয়োজন আর অবিশ্রান্ত বর্ষন হয়তো কবিকে

'মেঘের পরে মেঘ জমেছে', কিংবা
'আজি বরিষন মুখরিত শ্রাবন রাতি' কিংবা
'আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে,
গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে' ইত্যাদি

গানগুলি রচনা করতে কবিকে উৎসাহ দিয়েছিল। কবি মনে করেন, প্রকৃতির মধ্যে যা ঘটছে তা শুধু চোখে দেখে নয় একাগ্র চিত্তে অনুভব করে তাকে বুঝতে হবে। 'যদি কোন সৃজনে প্রবৃত্ত হবার পূর্বে বুদ্ধি শক্তি, কল্পনা শক্তি তাজা রাখা আবশ্যক হয় তা হলে অনেক ক্ষণ নীরব থাকা প্রয়োজন'।[৪০] এই নীরবতার সম্মুখে যদি প্রকৃতিকে পাওয়া যায় এবং সেই প্রকৃতিতে যে সৃজনশীল চোখে অনুভব করবে একমাত্র সেই প্রকৃতির মনের কথা জানতে পারবে। কবি বলেন, 'আমাদের দুটো জীবন আছে- একটা মনুষ্যলোক, আর একটা ভাবলোক। সেই ভাবলোকের জীবন বৃত্তান্তের অনেকগুলি পৃষ্ঠা আমি এই পদ্মার উপরকার আকাশে লিখে গেছি'।[৪০] এই লেখাগুলি তখনই তিনি দেখতে পান যখন তিনি একাকী নিভৃত চিত্তে ঐ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

১০ আগষ্ট ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিতে কবির সঙ্গীত সম্পর্কে একটি মন্তব্য পাওয়া যায়। কবি ভারত বর্ষীয় সঙ্গীত এবং ইউরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পার্থক্য করতে গিয়ে দিন ও রাতের সাথে তাদের তুলনা করেছেন। কবি বলেছেন, 'দিনের জগৎটা য়ুরোপীয় সঙ্গীত। সুরে বেসুরে খন্ডে অংশে মিলে একটা গতিশীল প্রকান্ড হার্মনির জটলা - আর রাত্রের জগৎটা আমাদের ভারতবর্ষীয় সংগীত, একটি বিশুদ্ধ করুন গম্ভীর অমিশ্র রাগিনী'।[৪১] এই প্রকারের সঙ্গীতই আমাদের নাড়া দেয় কিন্তু তারা দুটোই পরস্পর বিরোধী। দিনের বেলাটা কর্মচঞ্চল্য মুখর পাখির কলকাকলী, মানুষ সহ অন্যান্য জীবের আওয়াজ, গাড়ীঘোড়ার শব্দ অর্থাৎ যতক্ষন দিনের আলো ততক্ষণ জাগ্রত মানুষের নানা কোলাহল কবিকে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের কথা মনে করিয়ে দেয়। এদিকে নিস্তব্দ অন্ধকারে প্রদীপ শিখায় মনে হয় ভারত বর্ষীয় সঙ্গীত-শান্ত সমাহিত। যেন হৃদয় ছুঁয়ে কর্ণে প্রবেশ করে সহজেই মানুষকে আপ্লুত করতে পারে। কবি তাঁর গানে ভারতবর্ষীয় রাগরাগিনীর ব্যবহার করেছেন - 'আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি' (রাগঃ মিশ্র গোরী), 'তব প্রেম সুধা রসে মেতেছি' (রাগঃপরজ),'কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল' (রাগঃ

গান্ধারী) আরো অনেক। তিনি রাগসঙ্গীতে সকল ক্ষেত্র তার গানে ব্যবহার করেছেন। এমনটি কোন কোন গানে মিশ্র রাগের ব্যবহারও পাওয়া যায়। পাশাপাশি তার বেশকিছু গান তিনি ইংরেজী গানের আদলে তৈরী করেছেন। গানগুলি হুবহু ব্যবহার না করে নিজের ভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

-'কতবার ভেবেছিনু আপনা ভূলিয়া'
-'সকল ফুরালো স্বপন প্রায়,
-'পুরানো সেই দিনের কথা' ইত্যাদি।

তখন শুক্লপক্ষ চলছিল । আগস্টের মাঝামাঝি (১৮৯৪) শিলাইদহে কবি প্রতিদিন সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরোন, বেড়ানো শেষে ক্লান্ত শরীরে বোটে ফিরে কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে ডুবে যান নিজের মধ্যে। বর্ষাকাল তাই নদীর জল বেড়ে প্রায় ডাঙ্গা সমান হয়েছে । তাই বোটে বসেই কবি জল এবং স্থলের সমস্ত দৃশ্য দেখতে পান । দক্ষিণে আউস ধানের মাঠ, সবুজ ঘাস, একপ্রান্তে পায়ে পায়ে তৈরী হয়েছে মেঠো পথ । পূর্ব দিকে হাটের গোলাঘর এবং সামনে স্তুপাকৃতির খড় জমা করা। জ্যোৎস্নায় এ দৃশ্য অপরুপ সুন্দর ছবির মতো মনে হয়। 'সন্ধ্যা বেলাটি ---- আমার পায়ের তলায়, আমার চতুর্দিকে এমন সুন্দর, এমন শান্তিময়, এমন নির্জন নিস্তব্ধ, এমন নিবিড়ভাবে আমার নিকটবর্তী হয়ে আসে যে, আকাশের নক্ষত্রলোক থেকে আর পদ্মার সুদূর ছায়াময় তীর রেখা পর্যন্ত সমস্ত বৃহৎ দৃশ্যটি আমার চতুর্দিকে একটি নিভৃত আরামের গোপন গৃহের মতো ছোট হয়ে ঘিরে দাড়ায় '।[৪২]

'সমুখ আকাশে চড়াচড় লোকে/এই অপরুপ আকুল আলোকে/দাঁড়াও হে, আমার পরান পলকে পলকে/চোখে চোখে তব দরশ মাগে'। কবির এই বর্ণনার পর 'দাঁড়াও আমার আখিঁর আগে গানটির এই লাইন গুলির কথা মনে পড়ে। কবি চোখ বুজে, কান পেতে, দেহ প্রসারিত করে দিয়ে মুখের ওপর জ্যোৎস্নার শুভ্র হস্তে আদরের স্পর্শ পেতে থাকেন। গানটির দ্বিতীয় লাইনে কবি বলেছেন - 'তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে'। মৃদু মন্দ হাওয়ার কোমল স্পর্শ কবি তাঁর চুলের মধ্যে অনুভব করেন। স্নিগ্ধ রাত্রি তাঁর রোমে রোমে পৌঁছে দেহের উত্তাপ জুড়িয়ে দেয়। 'নিবিড় অমাতিমির হতে বাহির হল/জোয়ার স্রোতে শুক্করাতে চাঁদের তরনী' । এমন সুন্দর পরিবেশ ছিলো বলেই কবি গানটি রচনা করতে পেয়েছিলেন।

বোটে বসে বসেই কবি বুঝতে পারেন পদ্মার জল আরো বেড়েছে। কবি কুষ্টিয়ার পথে চলেছেন এবং যেতে যেতে লক্ষ্য করলেন পদ্মা একেবারে বুক ফুলিয়ে চারিদিক জাকিয়ে বয়ে চলেছে। বোট থেকে ওপারটা দেখাচ্ছে কাজলের নীল রেখার মতো , যতদূর চোখ যায় নিবিড় সবুজ শস্যক্ষেত্র বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। আর এ দিকটা অপার উদার জলরাশি যা একটা প্রকান্ড প্রচন্ড গতিতে ধাবমান। কবি এই জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবেন, 'বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গতিকে যদি কেবল গতি ভাবেই উপলব্দি করতে ইচ্ছা করি তা হলে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়। কারন---নদী আগাগোড়াই চলছে - সেই জন্যে আমাদের মনের সঙ্গে, আমাদের চেতনার সঙ্গে তার একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়'।[৪৩] আমাদের শরীর বিশ্রাম নিয়ে চলে কিন্তু মন অনবরত স্বভাব সুলভ চলছে মনের ইচ্ছা মতো। এই ইচ্ছার কোন গন্ডি নেই সে পাখির মতো উড়ে চলে, মেঘের মতো ভেসে বেড়ায় দেশ থেকে দেশান্তরে। যার মন হয়তো সে নিজেই টের পায় না তার মন কখন কোথায়, তাই বুঝি কবি লিখেছেন, 'দূরে কোথায় দুরে/আমার মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে' কিংবা 'আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী'।

কবি শাহজাদপুরে এসে পৌঁছান। শাহজাদপুরের বাড়ীটি কবির খুব পছন্দের ছিল। বড় বড় জানালা দরজা খুলে দিলে অবারিত আলো হাওয়ায় ঘর ভরে যেতো। সেই সাথে ছিল পাখির

ডাক আর কামিনী ফুলের মিষ্টি গন্ধ । শাহজাদপুর এলেই কবির লেখবার ভাব এবং ইচ্ছা দুই-ই জাগ্রত হত। তিনি পুরো বাড়ির সমস্ত দরজা গুলো খুলে লিখতে বসতেন, এ যেন 'দুয়ার মোর পথ পাশে সদাই তারে খুলে রাখি'

গানটির মতো। কবি বলেন - 'বাইরের জগতের একটা জীবন্ত প্রভাব আমার সমস্ত মুক্ত দ্বার দিয়ে অবাধে প্রবেশ করতে থাকে - আলোতে, আকাশে, বাতাসে, শব্দে, গন্ধে, সবুজ হিল্লোলে এবং আমার মনের নেশায় মিশিয়ে অনেক রকম গল্প তৈরী হয়ে উঠতে থাকে'।[৪৪] বিশেষ করে এখানকার দুপুর বেলার নির্জনতায় কবি বিশেষ একটি মোহ খুঁজে পান। রৌদ্রের উত্তাপ, নীরব একাকীত্ব; পাখীর কলকাকলী সব মিলিয়ে একটা সুদীর্ঘ সুন্দর অবসর কবিকে ভারী উদাস এবং আকুল করে।

বিলের মধ্যদিয়ে কবি বোটে করে চলেছেন। আসলে এগুলি ধানের ক্ষেত, বানের জলে ভরে গেছে। ধানের ডগাগুলি পানির ওপর খানিকটা মাথা তুলে রয়েছে। দূরে দূরে জলে অর্ধ নিমগ্ন কুটিরগুলি গ্রামের পরিচয় দিচ্ছে। আশে পাশে উড়ে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন জলচর পাখি। ভাদ্র মাসের গুমট গরমে কবির বোটটি অলস মন্থর গমনে উদাসীনের মতো চলেছে। এই সুবিস্তীর্ণ জলরাজ্যের মধ্যে শরতের উজ্বল রৌদ্রে কবি বোটের জানালার কাছে বসে গুন গুন করে চলেছিলেন ভৈরবীর সুর। "আজ সমস্ত সকাল নিতান্ত সাদাসিধা ভৈরবী রাগিনীতে যে গোটা দুই তিন ছত্র ক্রমাগত আবৃত্তি করছিলুম, 'ওগো তুমি নব নব রূপে এসো প্রানে/এসো গন্ধ বরন গানে !/ আমি যে দিকে নিরখি তুমি এসো হে/আমার মুগ্ধ মুদিত নয়ানে ![৪৫]

বোয়ালিয়ার পথে যেতে যেতে সেদিন খুব সুন্দর রোদ উঠল। শরতের এই সোনালী রোদ নদীর দুই ধারের গাছপালা এবং গ্রাম গুলির ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। আকাশ ভরা এই রৌদ্রটি কবির মনের উপরও সম্পূর্ণ বিস্তারিত হয়েছে । কবির মনে হয়, 'আমার স্মৃতিপথ ক্রমেই অস্পষ্টতর হয়ে কুহেলিকাময় অনাদিকালের দিকে চলে গেছে, এবং এই সমস্ত বৃহৎ মানস রাজ্যের উপর যখন মেঘমুক্ত সুন্দর প্রভাতের রৌদ্রটি এসে পড়ে তখন আমি যেন আমার এক মায়া অট্রালিকার বাতায়নে বসে এক সুদুর বিস্তৃত মায়াময়ী মরীচিকা রাজ্যের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকি।'[৪৬] বাংলাদেশের মাঠের দৃশ্য , নদী তীরের দৃশ্য কবি খুবই ভালবাসেন। যখন সন্ধ্যা শান্তি নিয়ে উপর থেকে নামতে থাকে তখন সমস্ত আকাশ 'একটি নীলকান্ত মনির পেয়ালার মতো আগাগোড়া পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে।'[৪৬] যখন শ্রান্ত, নিস্তব্দ মধ্যাহ্ন তার সোনার আঁচল সমস্ত পৃথিবীর ওপর বিছিয়ে দেয় তখন সে চেয়ে চেয়ে দেখে আর দেখে দেখে মনটা ভরে নেয়। কবির এ মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়েই হয়তো কবি লিখেছেন

'আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব।' কিংবা
'তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভূবন
মুগ্ধ নয়ন মম,
পুলকিত মোহিত মন'।

প্রায় দুমাস কলকাতা এবং শান্তিনিকেতন ঘুরে কবি নভেম্বরের শেষের দিকে শিলাইদহ ফিরে দেখলেন পদ্মায় বিশাল চর জেগেছে। 'দিগন্তের শেষ সীমা পর্যন্ত সাদা বালির চর ধু ধু করছে ; তাতে না আছে ঘাস, না আছে গাছ, না আছে বাড়ি ঘর, না আছে কিছু',[৪৭] আকাশের শূণ্যতার মধ্যেও মেঘ আছে, সুর্য ,চন্দ্র , গ্রহ, নক্ষত্র আছে; বিশাল সমুদ্রে ঢেউ থাকা সত্বেও একটা শূন্যতা আছে। কিন্তু ভুমির শূন্যতা এ যেন বড় বেশী শূন্য বলে মনেহয়- এ যেন প্রকৃতির বন্ধ্যাত্ব। এই বিরান চরের পাশ দিয়ে পদ্মা বয়ে চলেছে, ওপারে গ্রাম, ঘাটে বাঁধা নৌকা,

মানুষের কোলাহল, আমের বাগান, নারকোল বাগান আরো কত কি ! ‘কোথাও গাঢ়নীল, কোথাও পান্ডুনীল, কোথাও সবুজ আর মাঝখানে এই রক্তহীন মৃত্যুর মতো ফ্যাকাশে সাদা - নিস্তব্দ নিশ্চেষ্ট, জনহীন’।[৪৭] তবুও সন্ধ্যের সময় কবি এ চরে হেটে বেড়ান, এবং অদ্ভুত ভাবে তিনি তারঁ সমস্ত অন্তঃকরণে একটা পরম প্রসারতা অনুভব করেন। কেউ নেই কিছু নেই কবি কেবল একেলা একটি অবাধ স্বাধীনতায় মনের যত কথা এই শুন্য ধরণীর ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলতে পারেন নিঃসংকোচে নির্দ্বিধায় এই জনহীন, প্রানীহীন ধু ধু প্রান্তরে তিনি আপনার মুখোমুখি হতে পারেন, আপনার কথা গুলোকে সাজিয়ে উঠতে পারেন।

‘আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা সুন্দর বিকাশে আহা’,
‘মধুর রূপে বিরাজো হে বিশ্বরাজ’, অথবা
‘জীবন মরনের সীমানা ছাড়ায়ে বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে’, কিংবা
‘রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে
তোমায় আমায় দেখা হল সেই মোহানার ধারে’,

বাস্তবিক কবি সে সময় কি ভাবতেন তার আন্দাজ করা দুঃসাধ্য, তবে এ সময় তিনি লেখার কথা ভাবতেন তা তাঁর সগোক্তি থেকেই জানা যায় - ‘মফস্বলে আমার সেই শক্তি খুব বিকশিত হয়, আমি দেশকালের ব্যবধানকে আমার কল্পনার দ্বারা পরিপূর্ন করে তুলতে পারি, কিন্তু কলকাতার আবিলতার মধ্যে সেই মায়া শক্তি কোথায় অর্ন্তধান করে, তখন ইন্দ্রিয়ের দ্বারে শরনাপন্ন হয়ে ক্রন্দন করে মরতে হয়’।[৪৭]

‘বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো’- সন্ধ্যে বেলায় কবি চরের মধ্যে হাটতে হাটতে অনুভব করেন, ‘নিস্তব্ধ নক্ষত্র লোক থেকে শান্তি নেমে এসে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করে তুললে। যে সভার মধ্যে অনন্ত কোটি জ্যোতিস্ক নীরবে সমাগত হয়েছে আমিও সভার এক প্রান্তে স্থান পেলুম’।[৪৮] ঐ অসীম মহাশুন্যে তারাদের যেমন একটি স্থান আছে, পদ্মার ধারে দিগন্ত বিস্তীর্ণ বালুচরে একাকী কবিরও তেমনি একটি স্থান আছে বলে তিনি অনুভব করেন । অস্তিত্ব আসলেই পৃথিবীর একটি মহাশ্চর্য যেখানে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সকলেরই স্থান রয়েছে।

সূর্যাস্তের সময় আকাশে অল্প অল্প মেঘের টুকরা ভাসছে। পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়া সুর্যের আলো ছোট ছোট কোঁচানো কোঁকড়ানো মেঘের ওপর পড়ে সোনালী হয়ে উঠে এবং নতুন রকম শোভা ধারণ করেছিল। নীল আকাশে কমলা রঙের সূর্য, কিছু মেঘ সূর্যের আভায় স্বর্নময়, পাশাপশি ছেড়া ছেড়া সাদা মেঘের ভেলা, সব মিলিয়ে কত রকমের রঙ যে দেখা দিয়েছিল- পদ্মার জলে এবং বালির চরে রঙের ইন্দ্রজাল তৈরী হয়েছিল। এযেন একেবারে ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা/তুমি আমার সাধের সাধনা’ গানটির মতো। ‘নীল পদ্মার জল উত্তরে বাতাসে আগাগোড়া অল্প অল্প কম্পিত শিহরিত হচ্ছিল - সেই জন্যেই সমস্ত নদীতে সুর্যরশ্মির সমস্ত বর্নের এবং আভার এমন একটি আশ্চর্য স্পন্দন হচ্ছিল যে, আমার মনের মধ্যে বিস্ময়ের সীমা ছিল না’।[৪৯] পদ্মার মাঝে স্থানে স্থানে ডুবন্ত চর ছিল তাই সেখানে পানির স্রোত শান্ত ছিল। সেই জলের নীচের মসৃন বালি সোনার মতো উজ্জল কোমল দেখাচ্ছিল। আর স্বচ্ছ পানিতে দেখা যাচ্ছিল ঢেউ খেলানো স্তরে স্তরে কোচানো বালিতে স্রোতের দাগ। তার ওপর ‘নানা রঙের চিকন আভা পড়ে ঠিক যেন একটা প্রকান্ড সাপের নানা রঙা খোলষের মতো দেখাচ্ছিল’।[৪৯] কবি ভাবলেন, পদ্মা তো আসলেই একটা নাগিনী, বর্ষার সময় তার ঐ নাগিনী ফনার ছোবল দেখা যায় - যা এখন শীতকালে ক্ষীণ আকার ধারণ করেছে।

কবির সাথে সান্ধ্যভ্রমনে একজন পৌঢ়সঙ্গী তিনি পেয়েছিলেন (১৮৯৫)। তার সাথে জগত সংসার এবং সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করতে করতে একদিন কবি বলেছিলেন, 'আমার যে নিত্য ধর্ম, এর উপাসনা নিত্য উপসনা'।[৫০] রাস্তার ধারে ঘাসের ওপর একটি ছাগমাতা তার শাবকটিকে নিয়ে শুয়েছিল, শাবকটি পরম নির্ভরতার সাথে তার মায়ের সাথে ঘেঁষে গা এলিয়ে ছিল। এই দৃশ্য কবি মনে সুগভীর প্রীতি ও বিস্ময়ের সঞ্চার করে, আর এটাই কবির কাছে ধর্মালোচনা। কোন রকম মিথ্যা অনুমান বিচার মিশিয়ে তিনি স্ব-চক্ষে দেখা সত্যটি সংশয়াপন্ন করতে চান না। 'এই সমস্ত ছবিতে চোখ পড় মাত্র জগতের ভিতরকার আনন্দ এবং প্রেমকে আমি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎভাবে আমার অন্তরে অনুভব করি। আমি এইটুকু জানি যে, জগতে একটা আনন্দ এবং প্রেম আছে-তার বেশী জানবার কোন দরকার নেই'।[৫০] কবির এ বিশ্বাস থেকেই হয়তো রচিত হয়েছিল- 'এই যে তোমার প্রেম ওগো হৃদয় হরণ', 'আনন্দ ধ্বনি জাগাও গগনে' কিংবা 'আনন্দলোকে-মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর', 'প্রেমে প্রানে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে' ইত্যাদি গানগুলি ।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন কবিতা বা কোন সুন্দর সাহিত্যকে বোঝার জন্য এরং উপভোগ করার জন্য নির্জনতা এবং শান্তিময় পরিবেশ প্রয়োজন কারণ এটা তাড়াহুড়ো করার কোন ব্যাপার নয়। কাজের ভিড়ে চোখ বুলিয়ে নেবার মত জিনিস ও নয়। এটি রস গ্রহন করবার বিষয় - প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি লাইনের মর্ম উপলব্দি করার বিষয়, সেজন্যেই চঞ্চল মতি লোকেরা কবিতার রস গ্রহন করতে পারে না। তাদের দেহের কিংবা মনের অবসর নেই। এ ব্যাপারে কবি বলেছেন, 'মফস্বলে না এলে কলকাতায় কোন কবিতার বই খুলতে আমার ভয় হয়। মনে হয় সে জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে, কলকাতায় কবিতার মতো জিনিস বড়ো সংকুচিত হয়ে যায় - সেখানে তাকে বড়ো সামান্য মনে হয়। এখানে নির্জনের তার অতল স্পর্শে গভীরতা এবং সত্যতা ঠিক মনের সঙ্গে উপলব্দি করতে পারি'।[৫১] 'ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে- আমারে তাঁর কথা সে যায় শুনিয়ে' এগানটির উৎস বোধ হয় পদ্মার ওপরে বাঁধা কবির বোটখানিতে। শিলাইদহে বসন্তের (ফেব্রুয়ারী ১৮৯৫) মধ্যাহ্নে 'সাধনার' জন্য কবি গল্প লিখছিলেন। সেই সময় গোটা দু'এক ভ্রমর --- আমার বোটের চারদিকে এবং আমার বোটের মধ্যে এসে অত্যন্ত চঞ্চল ভাবে ব্যর্থ গুঞ্জনে এবং বৃথা অন্বেষনে ঘুর বেড়াচ্ছে । -----তাড়াতাড়ি একবার আমার টেবিলের কাছে, ডেস্কের নীচে, রঙ্গিন সার্শির উপরে, আমার মাথার ধারে ঘুরে আবার হুস করে বেরিয়ে যায়'।[৫২] কবি যে এদের গুন গুন করে উড়ে বেড়ানো যথেষ্ট উপভোগ করেছেন তা বলাইবাহুল্য।

এই যে ভোমরের গুঞ্জন, প্রজাপতির রঙীন পাখনা, হাসনাহেনার গন্ধ, দখিনা বাতাস, এ সমস্ত বিষয়েই কবিরা যুগে যুগে লিখেগেছেন। কিন্তু একজন কবির সেই পুরাতন বিষয় গুলোকে ভাষায়, ছন্দে, বলবার নতুনত্বের দ্বারা সাধারনের মনকে আকর্ষন করে, আর তাই আমরা তার রসাস্বাদন করতে পারি। চিরকালের শোনা কথাটা নতুন আঙ্গিকে বলার কারণে কিংবা গাইবার কারনে তা আবার আমাদের অনুভূতিকে নাড়া দেয, আমাদের কানের মধ্যে, মনের মধ্যে বাজতে থাকে। 'কবিদের একটা প্রধান কাজ, পৃথিবীটাকে সর্বদা তাজা রেখে দেওয়া গাছের সবুজ, আকাশের নীল, সন্ধ্যাবেলাকার সোনালী এ সমস্ত কল্পনার অমৃত সিঞ্চন করে তাকে অনন্ত কাল সজীব সরস করে রাখা। সে নতুন জিনিস কিছুই দেয়না কেবল মনটাকে নতুন করে রাখতে চেষ্টা করে'।[৫৩] সেজন্যেই বুঝি ভালবাসা কিংবা ভালবাসি শব্দটি আজো পুরোনো হল না।

'সৌন্দর্য এবং ভালবাসার মধ্যে আমি যতটা অনন্ত গভীরতা হৃদয়ের সঙ্গে অনুভব করি এমন আর কিছুতে না'[৫৪] - কবি সর্বদাই সুন্দরের পুজারী ছিলেন । তবে নিজে যে খুব পরিপাটি

হয়ে থাকতেন তা নয় বরং অন্যের সৌন্দর্য কিংবা প্রকৃতির সৌন্দর্য দুই চোখ, প্রান মন ভরে উপভোগ করতেই ভালবাসেন। সুন্দর মানুষ বোঝাতে কবি মানুষটি ভেতরে কতটা সুন্দর তার প্রাধান্যই বেশী দিতেন। কবি আরো বলেন, 'কেবল চক্ষুকে কল্পনাকে নয়- সৌন্দর্য যখন একেবারে সাক্ষৎভাবে আত্মাকে স্পর্শ করতে থাকে তখনই তার ঠিক মানেটা বোঝা যায়। আমি যখন একলা থাকি তখন প্রতিদিনই তার সুস্পষ্ট স্পর্শ অনুভব করি',[৫৪] এ পর্যায়ে কবির দুটি গান মনে পড়ে যায় - 'তোমায় চেয়ে আছি বসে পথের ধারে সুন্দর হে', 'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর'। কবির কলকাতা যাবার সময় আসন্ন , 'এই দু চার দিন জ্যোৎস্না লোকে আমার পদ্মাপারের চরটাকে যতটা পারি অন্তরের মধ্যে বোঝাই করে নিয়ে যেতে হবে। খুব সম্ভব আসছে বারে যখন এখানে আসব তখন এই বিস্তীর্ণ শুভ্র চরখানি আর থাকবে না' ।[৫৫] কবি যে কয়দিন শিলাইদহে থাকেন প্রতিদিনই তিনি এই চরে বেড়াতে আসেন তা আমরা আগের চিঠি গুলোর আলোচনায় দেখেছি। প্রথম দিকে তিনি একাকী বেড়ালেও পরবর্তীতে তার সঙ্গী জুটেছিল যে কারনে প্রকৃতির সাথে কথা বলাটা তার কমে এসেছিল। তারপরেও 'এক একবার অল্পক্ষনের মতো সমস্ত জ্যোৎস্না মন্ডিত শান্তিপূর্ন দৃশ্যটি এবং অনন্ত আকাশ পূর্ণ নিস্তব্দতা আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়',[৫৫] তখন কবি তাঁর মনের মধ্যে আশ্চর্য পরিপূর্নতা অনুভব করেন। একটা নিঃশব্দ নিস্তব্দ, একান্ত প্রেম তার বিশাল কোমল গভীর আলিঙ্গনে নক্ষত্র লোক থেকে এসে আবৃত করে দেয়। কবি তার দুই সঙ্গীর সাথে কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না মগ্ন জগৎ তাকে জানিয়ে দেয় - কবির দুই সঙ্গীর সাথে এই আকাশ এই পৃথিবীও তার বন্ধু হয়ে থাকবে চিরদিন। কবির ভাষায়- 'আমি নিশিদিন হেথা বসে আছি তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো।'

কলকাতা থেকে ফেরার পথে কবি প্রতিবারই ভাবেন এবার বুঝি পদ্মাতীর পুরোনো হয়ে গেছে। কিন্তু 'আশ্চর্য এই, যেই এখানে পা ফেলি অমনি দেখতে পাই সবই সেই প্রথম শুভ দৃষ্টির সময়টির মতোই উজ্জ্বল বিস্ময়পূর্ণ হয়ে আছে।'[৫৬] এমনকি কি রোজ সন্ধ্যায় কবি যে চরের মধ্যে হেটে বেড়াতেন- 'অন্যদিন যেটা আমার কাছে নতুন বলে ঠেকেছিল আজও ঠিক সেইটে আমার কাছে নতুন ঠেকছে।'[৫৬] ভাবটা ঠিক এমন যে কবি আজই এখানে নতুন এসেছেন। এমনকি তিনি পূর্ববঙ্গে বসে ইন্দিরাদেবীকে যে সমস্ত চিঠি লিখেছেন তার অধিকাংশ চিঠির বিষয়বস্তু প্রায় একই- পল্লী প্রকৃতি, গ্রাম বাংলা আর মানুষের জীবন। যদিও প্রতিটি চিঠি লেখার সময়ই কবি এ সমস্ত বিষয় গুলিকে নতুনভাবে অনুধাবন করেছেন। কবি বলেন, 'আমার অনেক দিনকার সঞ্চিত অনেক সকাল দুপুর সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে---- আমার পুরাতন পরিচিত দৃশ্যগুলির মাঝখান দিয়ে---- কতদিন কত মুর্হুতকে আমি ধরে রাখবার চেষ্টা করেছি, সেগুলো বোধ হয় তোর চিঠি বাক্সের মধ্যে ধরা আছে - আমার চোখে পড়লেই আবার সেই সমস্ত দিন আমাকে ঘিরে দাঁড়াবে।'[৫৬] এগুলো মধ্যে সমস্তই কবির ব্যক্তিগত সঞ্চয়, সেগুলো কোন সাহিত্য সৃষ্টি নয়, তাই অন্য কারো কাছে তার তেমন মূল্য না থাকলেও কবির কাছে তা দুরমূল্য সম্ভোগের সামগ্রী, জীবনের অসামান্য উপার্জন । এর মর্যাদা কেবল তিনিই বুঝবেন , জগতের আর কেউ নয়।

দেড় মাস পর (১জুন ১৮৯৫) কবি পতিসরের পথে রওনা হন। অনেক দিন পর বোটে ফিরে এসে তিনি প্রতিবারের মতোই পুলকিত বোধ করেন। নির্জনতা যেন কবির সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিয়েছে। ছোট নদী দিয়ে নৌকা চলেছে, 'দুই তীরে সবুজ ঘাসে ছেয়ে আছে, গরু চরছে, মেয়েরা গা ধুচ্ছে, উলঙ্গ ছেলেগুলো বোট দেখে চিৎকারস্বরে দূরস্থ সঙ্গীদের ডাকাডাকি করছে'।[৫৭] একের পর এক ছোট বড় অনেক গ্রাম-গঞ্জ কবি দেখতে দেখতে যান আর ভাবতে থাকেন - গ্রাম গুলো কবির কাছে একটি দৃশ্যমাত্র কিন্তু যারা এই গ্রাম গুলিতে বসবাস করেন তাদের বাড়ী আছে, পুকুর আছে, ফসলের মাঠ আছে, প্রতিবেশীর সাথে প্রতিবেশীর হৃদ্যতা

আছে আবার মনোমালিন্যও আছে, সব মিলিয়ে তারা বৃহৎ জনগোষ্ঠী। এলাকার যারা প্রভাবশালী কিংবা জমিদাররা নিজেদের বড়ো মনে করলেও এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে তারা কতটা ছোট তা কবি ভাবতে ভাবতে উপলব্দি করতে পারছিলেন।

'গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া' লাইনটি দিয়ে করি ইন্দিরাদেবীকে পতিসর থেকে (৩ জুন ১৮৯৫) চিঠিটি লেখা শুরু করেন। এই লাইনটি কবি মনে এসেছিল তার কারণ তখন প্রচন্ড ঝড়,বৃষ্টি হচ্ছিল। বাতাস কেশর ফুলিয়ে রাগান্বিত হয়ে সমস্ত আকাশ জুড়ে গোঙ্গাচ্ছে, বিদ্যুৎ আর বজ্রপাতও চলছে অবিরাম । কবি বোটের জানালার শার্সি সমস্ত বন্ধ করে ছোট খড়খড়ি খুলে দিয়ে লিখছেন ঝড়ের কারনে কেন জানি কবির চিত্ত খুব প্রফুল্ল। তিনি কিছু একটা লেখার জন্য হাসফাস করছেন, কিন্তু কি লিখবেন বা কি করবেন তা সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। 'মনের ভিতর ভারী একটা উল্লাস হচ্ছে - এই ঝড়ের আঘাতে, মেঘের ছায়ায়, বৃষ্টির ঝরঝর শব্দে, বজ্রের গর্জনে আমার বুকের ভিতর একটা তুফান উঠছে - একটা কিছু করতে ইচ্ছে করছে, নিদেন খুব সুখের ভাবনা খুব অসম্ভব কল্পনা ভাবতে ইচ্ছে করছে, নিদেন খুব গলা ছেড়ে দিয়ে একটা কানাড়া কিংবা মল্লার গেয়ে দিলেও সময়টা বেশ কাটে।'[৫৮] এরকম কোন একটি বৃষ্টির দিনেই হয়তো অতি উৎফুল্ল চিত্তে একটু দ্রুত ছন্দে কবি রচনা করেছিলেন

'এসো হে সজল শ্যাম ঘন দেয়া', কিংবা
'আজি ঝরঝর মুখর বাদল দিনে' গানগুলি।

জুনের শেষদিকে আর একটি গল্প লিখছেন কবি 'সাধনা'র জন্য। প্রকৃতির সমস্ত আলো , ছায়া, শব্দ, বর্ণ, একে একে মিশে যাচ্ছিল কবির লেখার সাথে। কবি যে সকল দৃশ্য, চরিত্র ও ঘটনা কল্পনা করছেন তার চারদিকে এই রৌদ্র বৃষ্টি, নদীর স্রোত , শরবন, মেঘ মুক্ত আকাশ, ছায়া সুনিবিড় গ্রাম, শস্য ক্ষেত সব মিলে ঘিরে দাঁড়িয়ে পুরো গল্পটি তাদের সত্যে ও সৌন্দর্যে জীবন্ত করে তুলেছে। কিন্ত কবির আক্ষেপ পাঠকেরা এর অর্ধেক জিনিসও পাবে না। 'তারা কেবল কাটা শস্য পায়', শস্য ক্ষেতের সতেজতা, হাওয়ার দোলায় সোনালী ধানের কেঁপে ওঠা, নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেসে যাওয়া সব কিছু থেকে তারা বঞ্চিত হয়। কবি ইচ্ছা করেন, 'আমার গল্পের সঙ্গে যদি এই মেঘমুক্ত বর্ষাকালের স্নিগ্ধ রৌদ্ররঞ্জিত ছোট নদীটি এবং নদীর তীরটি, এই গাছের ছায়া এবং গ্রামের শান্তিটি, এমনি অখন্ড ভাবে তুলে দিতে পারতুম তাহলে গল্পটি কেমন সুমিষ্ট সজীব হয়ে দেখা দিত!'[৫৯] তাহলেই পাঠক পুরো কাহিনী মর্মে মর্মে উপভোগ করতে পারতো ।

১৮৯৫ সনের ৫ জুলাই শাহজাদপুর থেকে কবি লিখেছেন,'কাল অনেক রাত নহবতে কীর্তনের সুর বাজিয়েছিল- সে বড়ো চমৎকার লাগছিল, আর ঠিক পাড়াগাঁয়ের উপযুক্ত হয়েছিল- যেমন সাদাসিধে তেমনি সকরুন।'[৬০] রাতের মৃদু মন্দ হাওয়া আর আকাশ ভরা জ্যোৎস্নার আলোয় নহবতটি করুন সুরে বাজছিল। জানালা খুলে সেই বাজনা শুনতে শুনতে কবি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। খুব ভোরে আবার সেই বাজনার আওয়াজেই তিনি জেগে ওঠেন। এসময় তাঁর ছেলেবেলারকার স্মৃতি ভেসে ওঠে, তারা পেনেটির বাগানে থাকতেন তার পাশেই দক্ষিনেশ্বরের শিব মন্দির থেকে দিনেরাতে তিন চার বার করে নহবত বজত। এই বাজন কবির এতোই ভাললাগত যে কৈশরের তিনি ভাবতেন বড় হওয়া মাত্রই এই রকম নহবত রাখবেন। সে রাতে গান শুনে কবি বুঝতে পারেন যে, সঙ্গীতের জন্য মনটা তৃষ্ণার্ত হয়েছিল। কবি অনুধাবন করেন প্রতিদিন কিছুটা সঙ্গীতের ছোঁয়া থাকলে- 'তুচ্ছ জীবনটা এখনকার চেয়ে ঢের রমনীয় হয়ে ওঠে এবং দিনের কাজকর্ম গুলোতে দুঃসহ ক্লান্তি এবং বৈরাগ্য আনয়ন করে না।'[৬০]

আগষ্টের মাঝামাঝি কোন কারনে কবির কুটিরে বসবাসের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। যদিও টেবিল , ক্যাম্প খাট ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থা হয়েছিল সে কারনে সত্যিকার কুটিরবাস তেমন ভাবে হয়ে ওঠেনি। তবুও কবি এই ভেবে খুশি হয়েছিলেন যে সর্বদা দূর থেকে দেখা গ্রাম গুলির চিত্র তিনি গ্রামের মধ্যে বসেই দেখতে পাচ্ছেন। সমস্ত দিন ভেজা ঘাসে গরু ছাগলের চড়ে বেড়ানো আর রাখালদের দেখে দেখে সময় কাটত কবির । গ্রামের লোকেদের মেটেবাড়ী, গোয়ালঘর, ,উঠোন, ধান কাটা , ধান শুকোনো , নৌকায় খেয়া দেওয়া , জল তোলা, কাপড় কাঁচা ইত্যাদি সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটা মাধুর্য্য অনুভব করেন। অনেকে বলেন, আমরা যে রকম কল্পনা করি আসলে তারা ততটা সুখী নয়। কিন্তু কবি বলেন, ‘ওরা অনেকটা ছেলেমানুষের মতো, সেই জন্যে ওরা সমগ্র হৃদয় দিয়ে সুখ সন্তোষ উপভোগ করতে পারে। আমাদের সুখ বড় জটিল এবং বহুল পরিমানে কৃত্রিম হয়ে পড়েছে।’[৬১] তাই বুঝি কবি রচনা করেছেন-‘ব্যর্থ প্রানের আবর্জনা পুরিয়ে ফেলে আগুন জ্বালো’।

বর্ষাকাল শেষ হয়ে প্রকৃতিতে শরতের আগমন হচ্ছে। নদীর জল কমতে শুরু করেছে, মেঘে কেটে গিয়ে সোনালী সূর্যের আভা দেখা দিয়েছে, জেলেরা কোমর জলে নেমে মাছ ধরছে, গরু গুলো নদীর ধারে তাজা ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে- একটি সুন্দর সমুজ্জল প্রশান্তি জলে স্থলে বিরাজ করছে। এই রকম দিনে সকাল বেলায় কবি অতীত দিনের সুমধুর স্মৃতির সঙ্গে এই দিনটিকেও মিলিয়ে নিয়ে বাংলাদশের সমস্ত স্মৃতিগুলোকে একবারে দেখতে চাচ্ছিলেন। কবি ইন্দিরা দেবীকে লিখেছিলেন, ‘আমার ইচ্ছে করে আমার সমুদয় চিঠি গুলো থেকে সমস্ত তুচ্ছ ব্যক্তিগত কথা বাদ দিয়ে, কেবল মতামত বর্ণনা এবং সৌন্দর্য সম্ভোগ, কেবল চিন্তা এবং কল্পনাগুলিকে বেছে নিয়ে একত্র গেঁথে গেলে আমার অধিকাংশ জীবিত কালের সমস্ত মাধুর্য্য একেবারে ঘনীভূত ভাবে পাওয়া যেতে পারে।’[৬১] যদি কখনো এই শস্য শ্যামল পদ্মা তীর ছেড়ে চলে যেতে হয় তাহলে ঐ চিঠি গুলির মধ্যে কবি আশ্রয় খুঁজে পাবেন। কবি বলেন, ‘বিশ্বজগতের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ আত্মিয়তার কথা আমার অন্য কোনো লেখায় তেমন যথার্থ সত্যভাবে নেই, যেমন আমার চিঠির মধ্যে আছে।’

‘প্রকৃতির মধ্যে যে গুঢ় গভীর আনন্দ পাওয়া যায়, সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা সুবৃহৎ আত্মীয়তার সাদৃশ্য অনুভব করে’,[৬২] এই সবুজ তরুবর, সরস তৃণলতা, জলধারা , বায়ু প্রবাহ, অনন্ত, আকাশের জ্যোতির্মন্ডলী, ছায়ালোকের আবর্তন, ঋতুচক্র, এই সমস্ত কিছুরই আমাদের ও চলাচলের সাথে যোগ সূত্র রয়েছে। সমস্ত বিশ্বচরাচরের সাথে আমরা একই ছন্দে আবদ্ধ হয়ে চলেছি। ‘প্রকৃতির সমস্ত অনুপরমানু যদি আমাদের সগোত্র না হয়ে থাকত, তাহলে কখনো এই বাহ্য জগতের সংসর্গে আমাদের এমন একটা আন্তরিক আনন্দ ঘটত না।’[৬২] এমনকি জড় বস্তুত এই জগতের বাইরে নয়, বিশ্বের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র পরমানুটির সাথে আমাদের কোন জাতি ভেদ নেই। তাহলে জীব এবং জড়ের জন্য আলাদা পৃথিবীই তৈরী হতো। এই সব ভাবতে ভাবতেই কবি হয়তো লিখছিলেন –

‘বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।’

২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫ কবি শিলাইদহে, সেদিন আকাশময় মেঘ ছড়ানো, পূর্ব দিক থেকে জোড় হাওয়া বইছে। ঝড়ের ভাব কিছুটা কমলেও রৌদ্র উঠবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। নদীর ওপারের কাশবন হাওয়ার দাপটে ক্রমাগত দুলছে। কবি দুদিন ধরে গুণ গুণ করছিলেন যে গানটা, বাইরের পৃথিবীটা ঠিক সেই রকম হয়ে আছে।

'ঝর ঝর বরষে বারিধারা
ফিরে বায়ু হাহা স্বরে
জনহীন অসীম প্রান্তরে
অধীরা পদ্মা তরঙ্গ আকুলা
নিবিড় নীরদ গগনে' - [৬৩] ইত্যাদি লাইন গুলি।

'আমি কাল-পরশু প্রায় মাঝে মাঝে সেই গানটা গাচ্ছিলুম। হাওয়ার দরুন বৃষ্টির ঝর ঝর, বাতাসের হাহাকার, গোরাই নদীর তরঙ্গ ধ্বনি একটা নুতন জীবন পেয়ে উঠতে লাগল --- সঙ্গীতের মতো এমন আশ্চর্য ইন্দ্রজাল বিদ্যা জগতে আর কিছুই নেই'- [৬৩] উপরোক্ত গানটি সম্ভবত এই রকম পরিবেশেই রচিত হয়েছিল, তবে বিশ্বভারতী কৃত গীতবিতানে গানটি আমরা একটু অন্যরকমভাবে পাই। পুরো গানটির বর্তমান রূপ এই রকম ঃ- (রাগ, মিশ্রমল্লার, তাল ঃ কাহারবা)

'ঝর ঝর বরিষে বারিধারা
হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা-
ফিরে বায়ু হাহাস্বরে, ডাকে কারে জনহীন অসীম প্রান্তরে ।
রজনী আঁধারা।
অধীরা যমুনা তরঙ্গ আকুলা অকুলারে তিমির দুকুলা রে
নিবিড় নীরদ গগনে গর গর গরজে সঘনে
চঞ্চলা চপলা চমকে, নাহি শশীতারা'।

ঝড়ের লক্ষণ কেটে গেছে আকাশে হালকা কিছু মেঘ, নদীও খুব শান্ত, নির্মল রৌদ্রজ্জ্বল দিনে স্রোতের মুখে বোট ভেসে চলেছে। মৃদুমন্দ বাতাসে শরীর ও মনে পুলক ছড়িয়ে পড়ছে। 'এখানে প্রকৃতি এত নিকটবর্তী, তার হৃৎকম্প এবং তার নিঃশ্বাস হিল্লোল এত কাছে অনুভব করা যায় যে, সঙ্গীত ছাড়া আর কোনো রকম চেষ্টাসাধ্য উপায়ে ভাবপ্রকাশ করতে ইচ্ছা হয় না'।[৬৪] কবি যেন বলতে চান- 'গান আমার যায় ভেসে যায়', কিংবা 'গান গুলি মোর শৈবালেরই দল'। ঠিক এই ধরণের তালের গান গুলো মনে হচ্ছে যেন বাতাসের দোলায় ছন্দে ছন্দে ভেসে চলেছে। কারণ গানের ভেতরকার আবেগ, বিরহ বেদনা কেবল গানের সুরের মধ্যে প্রকাশ পায়। সে জন্যে কবি যত বারই বর্ষায় পদ্মার ওপর দিয়ে চলেন মেঘমল্লারে নতুন গান রচনা করতে চেষ্টা করেন। 'মেঘ মল্লারে সারাদিনমান বাজে ঝরনার গান,

মনহারাবার আজি বেলা পথ ভুলিবার খেলা (মন চায়)
হৃদয় জড়াতে তার চিরদিনে আজ ঝরঝর মুখর বাদর দিনে।' কিংবা,
'বিশ্ব যখন নিদ্রামগন গগন অন্ধকার
কে দেয় আমার বীনার তারে এমন ঝংকার '।

কবি একদিন ভাবছিলেন তার ভেতর থেকে কেউ একজন তাকে দিয়ে লেখায়। তাকে নিবিষ্ট মনে প্রকৃতির সৌন্দর্য সম্ভোগে উৎসাহিত করে। স্থিরকর্ণে বিশ্বের সমস্ত কিছুর মধ্যে যে সঙ্গীত রয়েছে তা শুনতে প্রবৃত্ত করে। বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের রহস্য উদঘাটন করতে আগ্রহী করে তোলে। 'নয়নে ঘুম নিল কেড়ে উঠে বসি শয়ন ছেড়ে' - সেই মানুষটি কবিকে অলস জীবন যাপন করতে দেয়না, তাঁর হৃদয়ে অতৃপ্তি জাগিয়ে তোলে। তাইতেই কবি সৃজনশীল হয়ে ওঠেন। কবি বলেন, 'তপস্যা আমার স্বেচ্ছাকৃত নয়, সুখ আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়, তবু বিধাতা যখন বল পূর্বক আমাকে তপশ্চরনে প্রবৃত্ত করিয়েছেন তখন বোধ হয় আমার দ্বারা তিনি একটা বিশেষ

কিছু ফল পেতে চান' -[৬৫] 'গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া প্রাণ উঠিল পুরে জানিনে কোন বিপুল বানী–বাজে ব্যাকুল সুরে।'

কবি জল পথে শিলাইদহের দিকে আসছেন, বোটে আসা যাওয়ার পথে যতখানি সময় লাগে এই সময়টুকুতে কোন বৈষয়ীক কাজ নয়। এসময়টা কবির পক্ষে অবিমিশ্র ছুটি - নিজের ইচ্ছামত লেখা, পড়া, গুণ গুণ করা আর নদীর পারের দৃশ্যের দিকে চেয়ে থাকা। ৮ ডিসেম্বর ১৮৯৫ এমনি এক অলস দিনে কবি তাঁর খসড়া কবিতার খাতায় দু চার লাইন করে লিখছিলেন। 'আজ ভোরে চারটের সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল - উঠে---- বাতি জ্বেলে উর্বশী নামক একটা কবিতা শেষ করে ফেললুম, --- এমনি করে এই দুই দিনে দুটি বেশ বড়ো সড়ো রকমের কবিতা শেষ করে ফেলেছি।'[৬৬] সময়মতো রোদ এবং বৃষ্টি হলে প্রকৃতি যেমন ফুল ফোটায় আর সেই ফুল থেকে ফল হয় কিংবা শস্য হয় তেমনি নির্বিঘ্ন অবসর পেলে কবি বেশ রসিয়ে, রঙে রঙে সাজিয়ে কবিতা লিখতে পারেন। তাই তিনি ভাবেন - সংসারের, জমিদারীর সমস্ত কাজকর্ম ভুলে যদি মাস দেড়েকের জন্য বোটে চড়ে 'পশ্চিমে' যেতে পারতেন তাহলে অনেক লেখা শেষ করতে পারতেন। তাঁর মতে, 'লেখার চেয়ে প্রবলতর কর্তব্য আমার আর কিছুই নেই।'[৬৬]

চরে সন্ধ্যে ভ্রমন শেষ করে কবি নৌকোয় করে ফিরছিলেন। ওপারের গাছপালার ওপরে সে ছিল এক অপরূপ সুন্দর সন্ধ্যা আর এর চেয়েও সুন্দর ছিল কবির মনের প্রশান্তি। তখন বেশ একটু রাত- কোন এক নৌকা থেকে 'প্রথমে পূবরী ও পরে ইমন কল্যানে আলাপ শোনা গেল'।[৬৭] সুরের তরঙ্গে নিস্তরঙ্গ নদী, স্তব্ধ আকাশ আর কবির হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আগে কবি ভাবতেন জগতে সন্ধ্যা প্রকৃতির সাথে আর কোনো কিছুরই তুলনা হয় না। কিন্তু পূরবীর তান যখনই বেজে উঠল তখন তিনি অনুভব করলেন- 'সন্ধ্যার সমস্ত ইন্দ্রজালের সঙ্গে এই রাগিনী',[৬৭] 'এক আশ্চর্য গভীর এবং অসীম সুন্দর ব্যাপার'।[৬৭] ফিরে এসে তিনি একা একাই অনেকগুলো গান গাইলেন- এমনকি ঐ মুহুর্তে বেশ কিছু গান তৈরীর ইচ্ছেও প্রকাশ করেছেন তিনি।

বস্তুত পূর্ববঙ্গে আসার পরে ১৮৯৫ সালের অক্টোবর মাস থেকে কবির গানের ঝর্ণাধারা স্রোতস্বিলা হয়। বিগত পাঁচ বছর কবি প্রকৃতি থেকে নির্যাস সংগ্রহ করেছেন, আকাশের সাথে, নক্ষত্রমন্ডলীর সাথে, জ্যোৎস্নার সাথে, ভাবের আদান প্রদান করেছেন। বুক পেতে নিয়েছেন প্রকৃতির ভালবাসার দান আর প্রকৃতিও এক সৌন্দর্য্য প্রেমিককে তার অর্ন্তহীন সৌন্দর্য্য অকাতরে দান করেছে। মহাবিশ্বের সৌন্দর্যকে বুকে ধারণ করে কবি হয়ে উঠেছিলেন ঐশ্বর্যশালী এবং উদার। কবি শিলাইদহ থাকা কালে অজস্র কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, প্রহসন প্রভৃতি লিখেছেন কিন্তু গানের ঝর্ণাধারা পাঁচ বছর পর থেকেই শুরু হয়।

১৮৮৭ সালে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নিজের রচনাগুলি সম্বন্ধে নিজেই সমালোচনা করে লিখেছিলেন- 'বয়স ত্রিশ হতে চলল, কিন্তু পাকা কথা কিছু বেরোলো না'। এ চিঠিতে কবির বেশ একটা আফসোসের সুর ছিলো। লেখক মোহাম্মদ আনসারুজ্জামান এর একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখ্য,- 'মানসী' কাব্য রচনা পর্যন্ত যদি কবি প্রতিভার বিশ্লেষণ করা যায় তবে রবীন্দ্রনাথ হয়তো অন্যতম বাঙ্গালী কবি হিসেবে বিবেচনার যোগ্যতা রাখেন, কিন্তু মহৎ কবির অভিধা পাওয়ার দূর্লভ সম্মান তখনো হাতের মুঠোয় নয়'।[৬৮]

কবির সাহিত্য প্রতিভার প্রকৃত উম্মোচন ঘটে নব্বইয়ের দশকে পূর্ববঙ্গে। যদিও এ সময়ে আগের মত দায়িত্বহীণ জীবন তার নেই, নানা রকম গুরুদায়িত্বে তাঁর জীবন বাঁধা পড়েছে। তবে এসমস্ত দায়িত্ব পালন করতে করতে কবি জীবনটাকে দেখেছেন খুব কাছে থেকে। লেখার তাগিদ এসেছে অন্তর থেকে। নানা কাজের ভীড়েও তিনি প্রশান্তি অনুভব করেছেন এই জন্য যে

এতোদিনে তাঁর মন স্থির হয়েছে, তিনি বুঝতে পেরেছেন যে লেখাটাই তার জীবনের প্রধান কাজ- যার মাধ্যমে তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। নব্বয়ের দশকের প্রথম পাঁচটি বছর ছিলো কবির জীবনের স্বর্ণময় এক অধ্যায়। এ সময়কার মতো এমন উদ্বেগহীন প্রশান্তির জীবন কবি আর কখনো যাপন করেননি। বলা যায়, পরবর্তী জীবনের প্রতি এটা ছিল তার জন্য এক মহা প্রস্তুতির পর্যায়। এই পাঁচ/সাত বছরের সঞ্চয়ই পরবর্তীকালে তার রচনায় নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথ কবি থেকে হয়েছেন বিশ্বকবি। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ এবং তার সাহিত্য সৃষ্টি পূর্ববাংলার প্রকৃতি ও মানুষের কাছে অনেকাংশে ঋণী। রবীন্দ্রনাথ অনেক দিন পরে শিলাইদহ পল্লী সাহিত্য সম্মেলনের সম্পাদককে লিখিত একটি চিঠিতে (১ চৈত্র ১৩৪৬) একথা স্বীকার করেছেন। 'আমার যৌবন ও পৌঢ় বয়সের সাহিত্যরস সাধনার তীর্থস্থান ছিল পদ্মা প্রবাহ চুম্বিত শিলাইদহ পল্লীতে।---- সেই পল্লীর স্নিগ্ধ আমন্ত্রণ সরস হয়ে আছে আজও নিভৃত স্মৃতিলোকে; সেই আমন্ত্রণের প্রত্যুত্তর অশ্রুতিগমা করুন ধ্বনিতে আজও আমার মনে গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে।'[৬৯]

রবীন্দ্রনাথের দাম্পত্য জীবনের এক মধুময় অংশ ১৮৯৯ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত এই দুই বছর কাটিয়েছেন শিলাইদহে। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি এবং হৃদয় মনের প্রভূত বিকাশ ঘটে এই সময়ে। শহরের যান্ত্রিকতা ও কর্ম কোলাহল থেকে দূরে প্রকৃতির নিবিড় সংস্পর্শে তাঁর পারিবারিক জীবন নির্মল আনন্দ ও সুখে ভরপুর ছিলো। একান্নবর্তী পরিবারের জটিলতা থেকে আলাদা শুধুমাত্র নিজের সংসারে এবার কবি নিজেকে স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ পরিপূর্ণ মানুষ বোধ করেন। তার এই মানসিক প্রশান্তিই তাকে অমর সাহিত্য সৃষ্টির কাজে অবদান রেখেছে। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ বলেছেন,'আমার ধারনা বাবার গদ্য ও পদ্য দুরকম লেখার উৎসই যেন খুলে গিয়েছিল শিলাইদহে। এমন আর কোথাও হয়নি। এই সময় তিনি অনর্গল কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প লিখে গেছেন- একদিনের জন্যও কলম বন্ধ হয়নি। শিলাইদহের রূপবৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি লেখার অনুকূল পরিবেশ পেয়েছিলেন।'[৭০] রথীন্দ্রনাথ 'শিলাইদহের স্মৃতি' প্রবন্ধে আরও লিখেছেন- 'বাবা সমস্ত দিন ধরে লিখতেন তার ঘরে--- সেখানে আমাদের প্রবেশ নিষেধ---মা বারণ করে দিয়েছিলেন। লেখার ঝোঁক যখন বেশী চাপত তখন খাওয়া দাওয়া এক রকম ছেড়ে দিতেন।----- খেতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হয়, তাই খাওয়া দাওয়া ছেড়ে সমস্ত দিন ধরে লিখতে লাগলেন।'[৭০] এই সময়ে পাঁচ ছেলে মেয়েই বেঁচে ছিলেন এবং পরিবারের অন্য সকলের থেকে দূরে পল্লীর শান্ত, প্রশস্ত পরিবেশে ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা ও মাকে অনেক বেশী কাছাকাছি পেয়েছেন।

রথীন্দ্রনাথের 'শিলাইদহের স্মৃতি' প্রবন্ধ থেকে আরও জানা যায়, সেই সময় সন্ধ্যের পর জলিবোট নিয়ে নদীর মাঝখানে নোঙর ফেলে গানের জলসা বসতো। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কলেজ থেকে ছুটি পেলেই শিলাইদহে চলে আসতেন। তাঁর কাছ থেকে হাসির গান শোনা যেতো। কলকাতা থেকে আসতেন চিত্তরঞ্জদাসের ভাগ্নী অমলা দেবী। রবীন্দ্রনাথ আর অমলাদেবী পালা করে একের পর এক গান গেয়ে চলতেন। "সে সব রাত আজ স্বপ্নের মতো মনে হয়। কিন্তু আজও যখন-

'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে',
'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা,

তুমি আমার সাধের সাধনা' প্রভৃতি গান শুনি, সেই সব রাত্রির কথা মনে পড়ে যায়- যে রাত্রে গানের সুর, জলের কলধ্বনি ও ফুরফুরে দক্ষিণের হাওয়ার সঙ্গে এক হয়ে যেত, যে রাত্রে চাঁদের আলোর বন্যায় নদীর জলে ও নদীর চরে অপূর্ব এক ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করত।"[৭১]

রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' নামক গ্রন্থে অমলাদেবী সম্পর্কে আরও লিখেছেন যে, ১৮৯৬/৯৭ সালে অমলাদেবী রবীন্দ্রনাথকে গান লিখতে উৎসাহিত করেছিলেন। অমলাদেবীর গানের গলা শুনে কবি তাকে রাঁধিকা গোস্বামীর কাছে ওস্তাদী গানে তালিম নেওয়ার জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। এমনকি তার গানের গলার উপযোগী গান তিনি রচনা করেছিলেন, যেমন---

'চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না-----'
'এ পরবাসে রবে কে হায়------- '
'কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে ভুবনেশ্বর প্রভূ।'

যতীন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'শিলাইদহে রবীন্দ্রবাবু' নামক একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, বরীন্দ্রবাবুর হাতে প্রায়ই একখানি অতিক্ষুদ্র লাল খাতা থাকে, তিনি ইচ্ছামত তাহাতে লিখিয়া যান। গুণ গুণ করিয়া গাণ করা তাঁহার খুব অভ্যাস। তিনি যখন ঢিলা ইজের ও পাঞ্জাবী পারিয়া গুণ গুণ করিতে করিতে এ ঘর ও ঘর ঘুরিয়া বেড়ান, তখন লিখিবার কিছু মনে হইলে ঘড়ির চেনে সংলগ্ন সোনার পেন্সিলটি দিয়া সেই ছোট লাল খাতায় লিখিয়া ফেলেন।[৭২]

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টির একটি শ্রেষ্ঠ অংশ রচিত হয়েছে শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে, পদ্মা ও গড়াই নদীর ওপর বোটে। কবির ছোট গল্প লেখার সুচনা এখানেই। জমিদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে তিনি পল্লী মানুষের কাছাকাছি আসেন এবং এদের কাছ থেকে লেখার অনেক রসদ পান। শিলাইদহের একটি সত্য ঘটনার ওপর ভিত্তি করে তাঁর ছোট গল্প 'জীবিত ও মৃত'। সর্বক্ষেপী নামক একজন বৈষ্ণবীর জীবন নিয়ে তিনি লিখেছেন 'বোষ্টমী' নামক গল্পটি।

এছাড়া তাঁর বিখ্যাত কাব্য সোনার তরী (১২৯৮ বাংলা), মানস সুন্দরী (১২৯৯ বাংলা), উর্বশী (১৩০২ বাংলা) চিত্রা, ক্ষনিকা, চৈতালী, কথা ও কাহিনী, কল্পনা, নৈবেদ্য, কণিকা, গীতাঞ্জলী ও গীতিমাল্যের অনেক কবিতা ও গান শিলাইদহে রচিত হয়েছিল।

এদিকে কাব্য নাট্য চিত্রাঙ্গদা, কাহিনী, মালিনী, তিনখন্ড গল্পগুচ্ছের চুরাশিটি গল্পের মধ্যে চুয়াল্লিশটি ছোট গল্প। পঞ্চভুতের ডায়রী, মেয়েলী ছড়া, ছিন্নপত্রাবলী, প্রহসন- চিরকুমার সভা আর উপন্যাসের মধ্যে চোখের বালি ও ভারতী পত্রিকার জন্য লেখা বহু প্রবন্ধ এ সময় প্রকাশিত হয়।

কবির পূর্ববঙ্গে স্থায়ী বসবাসের সময়কালে ১৮৯১ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত এই দশ বছরে খুব বেশী গান রচনা হয়নি। তবুও উপরোক্ত সময়কালে রচিত রবীন্দ্রনাথের গানগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল ঃ

গান গুলি হল ঃ

১। শুধু যাওয়া আসা (স্বর বিতান- ১০) (অজ্ঞাত)
২। খাঁচায় পাখি ছিল (স্বর- ৩৩) (১৯ আষাঢ়/ ১৮৯২) শাহজাদপুর।
৩। আমার মন মানেনা (স্বর- ১০) (অজ্ঞাত)
৪। তুমি নতুন কি তুমি চিরন্তন (স্বর- ?) (অজ্ঞাত)
৫। ঝর ঝর বরিষে বারিধারা (স্বর- ১১) (১৩০১ সাল)।
৬। ফিরে এস ফিরে এস (স্বর- ?) (অজ্ঞাত)
৭। ওলো সই,ওলো সই (স্বর-৩৫, রাগ-বিভাস, তাল-খেমটা) (৫ আশ্বিন-১৩২০শিলাইদহ)
৮। মধুর ধ্বনি বাজে (স্বর- ১০, রাগ- ভুপালি, তাল- কাওয়ালী) (৬ আশ্বিন ১৩০২ শিলাইদহ)
৯। বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে (স্বর- ১০, রাগ পূরবী, একতাল,

(৮ আশ্বিন ১৩০২ শিলাইদহ)

১০। বিশ্ব বীনা রবে বিশ্বজন (স্বর- ৫০, রাগ- শঙ্করাভরণ, ঝাঁপতাল, ৪ও ৯ আশ্বিন)
১১। কে দিল আবার আঘাত (স্বর- ১১, রাগ- কেদারা তাল কাওয়ালী, বিজয়াদশমী, ১২ আশ্বিন ১৩০২ শিলাইদহ)
১২। এস গো নতুন জীবন (স্বর- ? ১৩ আশ্বিন ১৩০২)
১৩। পুষ্পবনে পুষ্প নাহি (স্বর- ১০, কালাংড়া ১৪ আশ্বিন ১৩০২)
১৪। আহা জাগি পোহাল বিভারবী (স্বর-৫০, রাগ-রামকেলী ১৫ আশ্বিন ১৩০২)
১৫। ওহে অনাদি অসীম সুনীল (স্বর- ? ১৬ আশ্বিন ১৩০২)
১৬। তোমার গোপন কথাটি (স্বর- ১০ ১৮ আশ্বিন ১৩০২)
১৭। চিত্ত পিপাসিত রে (স্বর- ১০ ২৩ আশ্বিন ১৩০২)
১৮। আমি চিনি গো চিনি (স্বর- ৫০ ১৫ আশ্বিন ১৩০২)
১৯। আমরা লক্ষীছাড়ার দল (স্বর- ৫১ ২৯ আশ্বিন ১৩০২)
২০। ওগো ভাগ্য দেবী পিতামহী (স্বর-৫১, ১কার্তিক ১৩০২ রাগ-ভুপালী তাল-খেমটা)
২১। সে আসে ধীরে (স্বর ১০ রাগ-দেশ,একতাল, ২১ কার্তিক ১৩০২)
২২। ওহে সুন্দর মম (স্বর- ১০ রাগ-খাম্বাজ, একতাল, ২৩ কার্তিক ১৩০২)
২৩। তুমি যেয়ো না এখনি (স্বর- ১০, তাল-কাওয়ালী,২৪ কার্তিক ১৩০২)
২৪। আকুল কেশে আসে (তাল-কাওয়ালী, ২৫ কার্তিক ১৩০২)
২৫। হৃদয় শশী হৃদী গগণে (স্বর-৪, ২৯ কার্তিক ১৩০২)
২৬। কি রাগিনী বাজলে হৃদয়ে (স্বর-১০, রাগ-সিন্ধুকানাড়া, ২৯ কার্তিক ১৩০২)

তালিকার বেশ কিছু গানে, যেমন- বিশ্ব বীণা রবে, ইত্যাদিতে আমরা পূর্ববাংলার নিসর্গ প্রকৃতির ছোঁয়া পাই। পূর্ববঙ্গের নিসর্গ প্রকৃতিকে কবি যেভাবে অনুভব করেছেন এবং পল্লীর মানুষের সমাজ জীবন যেভাবে কবিকে প্রভাবিত করেছে তা এই আলোচনার ক্ষুদ্র পরিসরে পুরোপুরি বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। নানা ভাবে, নানা রূপে তা ছড়িয়ে আছে কবির সমস্ত রচনায়, বিশেষতঃ গানে- কখনো গানের বাণীতে, কখনো সুরে। পল্লীর বসবাসের এই সকল অভিজ্ঞতা কেবল এই ১০ বছরেই নয় কবিকে আমৃত্যু প্রভাবিত করেছে। সেকারনেই পূর্ববঙ্গের স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে কবির জীবনের শেষার্ধের অনেক রচনায়।

তথ্যসূত্র

১. ছিন্নপত্রাবলী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশনী-বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ কলকাতা, মূদ্রণ-অক্টোবর ১৯৬০, পত্র নং- ৯, পৃষ্ঠা নং- ২৭- ২৮।
২. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১০ পৃষ্ঠা নং- ২৯- ৩০।
৩. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১১ পৃষ্ঠা নং- ৩০- ৩১
৪. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১৩ পৃষ্ঠা নং- ৩৩- ৩৪
৫. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১৪ পৃষ্ঠা নং- ৩৪- ৩৫
৬. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১৯ পৃষ্ঠা নং- ৪৩
৭. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ২০ পৃষ্ঠা নং- ৪৪
৮. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ২২ পৃষ্ঠা নং- ৪৬- ৪৭
৯. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ২৬ পৃষ্ঠা নং- ৫৩- ৫৪
১০. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ২৯ পৃষ্ঠা নং- ৫৭- ৫৮- ৫৯- ৬০
১১. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ৩০ পৃষ্ঠা নং- ৬০- ৬১
১২. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ৩১ পৃষ্ঠা নং- ৬১- ৬২
১৩. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ৩২ পৃষ্ঠা নং- ৬২- ৬৩
১৪. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ৩৪ পৃষ্ঠা নং- ৬৫- ৬৬
১৫. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ৩৫ পৃষ্ঠা নং- ৬৬- ৬৭
১৬. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ৪১ পৃষ্ঠা নং- ৭২- ৭৩- ৭৪
১৭. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ৪২ পৃষ্ঠা নং- ৭৪- ৭৫
১৮. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ৫৫ পৃষ্ঠা নং- ৯০- ৯১- ৯২
১৯. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ৫৮ পৃষ্ঠা নং- ৯৫- ৯৬
২০. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ৫৯ পৃষ্ঠা নং- ৯৬- ৯৭
২১. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ৬৩ পৃষ্ঠা নং- ১০২- ১০৩
২২. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ৬৮ পৃষ্ঠা নং- ১০৭- ১০৮
২৩. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ৬৯ পৃষ্ঠা নং- ১০৯
২৪. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ৯৪ পৃষ্ঠা নং- ১৪৫- ১৪৬
২৫. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ৯৮ পৃষ্ঠা নং- ১৫১- ১৫২
২৬. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১০০ পৃষ্ঠা নং- ১৫৩- ১৫৪
২৭. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১০১ পৃষ্ঠা নং- ১৫৪- ১৫৫
২৮. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১০২ পৃষ্ঠা নং- ১৫৫- ১৫৬
২৯. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১০৩ পৃষ্ঠা নং- ১৫৬- ১৫৭- ১৫৮
৩০. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১০৫ পৃষ্ঠা নং- ১৫৯- ১৬০
৩১. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১০৬ পৃষ্ঠা নং- ১৬১
৩২. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১০৮ পৃষ্ঠা নং- ১৬৬
৩৩. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১০৯ পৃষ্ঠা নং- ১৬৭- ১৬৮
৩৪. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১১০ পৃষ্ঠা নং- ১৬৮- ১৬৯- ১৭০
৩৫. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১১৮ পৃষ্ঠা নং- ১৭৯- ১৮০
৩৬. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১২৩ পৃষ্ঠা নং- ১৮৮- ১৮৯- ১৯০

৩৭. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১২৫ পৃষ্ঠা নং- ১৯৩- ১৯৪- ১৯৫

৩৮. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১৩১ পৃষ্ঠা নং- ২০৩- ২০৪

৩৯. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১৩৯ পৃষ্ঠা নং- ২১১- ২১২

৪০. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১৪০ পৃষ্ঠা নং- ২১২- ২১৩

৪১. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১৪২ পৃষ্ঠা নং- ২১৫- ২১৬

৪২. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১৪৫ পৃষ্ঠা নং- ২১৯- ২২০

৪৩. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১৪৭ পৃষ্ঠা নং- ২২২- ২২৩

৪৪. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১৪৯ পৃষ্ঠা নং- ২২৪- ২২৫- ২২৬

৪৫. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১৫২ পৃষ্ঠা নং- ২৩০- ২৩১

৪৬. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১৫৪ পৃষ্ঠা নং- ২৩৩- ২৩৪- ২৩৫

৪৭. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১৭৯ পৃষ্ঠা নং- ২৬৭- ২৬৭

৪৮. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১৮১ পৃষ্ঠা নং- ২৭০

৪৯. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১৮৪ পৃষ্ঠা নং- ২৭২- ২৭৩

৫০. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১৮৭ পৃষ্ঠা নং- ২৭৬

৫১. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১৮৯ পৃষ্ঠা নং- ২৭৭- ২৭৮- ২৭৯

৫২. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১৯১ পৃষ্ঠা নং- ২৮১- ২৮২- ২৮৩

৫৩. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১৯৫ পৃষ্ঠা নং- ২৮৬- ২৮৭

৫৪. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১৯৭ পৃষ্ঠা নং- ২৯০- ২৯১

৫৫. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ১৯৯ পৃষ্ঠা নং- ২৯৩- ২৯৪

৫৬. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ২০০ পৃষ্ঠা নং- ২৯৪- ২৯৫

৫৭. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ২১২ পৃষ্ঠা নং- ৩০৭

৫৮. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ২১৩ পৃষ্ঠা নং- ৩০৮

৫৯. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ২১৪ পৃষ্ঠা নং- ৩০৮- ৩০৯

৬০. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ২১৬ পৃষ্ঠা নং- ৩১১

৬১. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ২১৮ পৃষ্ঠা নং- ৩১২- ৩১৩

৬২. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ২২৬ পৃষ্ঠা নং- ৩২০- ৩২১

৬৩. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ২২৭ পৃষ্ঠা নং- ৩২১- ৩২২

৬৪. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ২২৯ পৃষ্ঠা নং- ৩২৪- ৩২৫

৬৫. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ২৩২ পৃষ্ঠা নং- ৩২৬- ৩২৭

৬৬. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ২৩৬ পৃষ্ঠা নং- ৩৩১- ৩৩২

৬৭. দ্রষ্টব্য- ১। পত্র নং- ২৪৮ পৃষ্ঠা নং- ৩৪৪- ৩৪৫

৬৮. রবীন্দ্রনাথ, সম্পাদনা মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ, প্রবন্ধ শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ- মোহম্মদ আনসারুজ্জামান, পৃষ্ঠা- ১৬ প্রকাশক- বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রকাশ কাল বৈশাখ ১৪০১ (বাংলা) মে ১৯৯৪ (ইংরেজী)।

৬৯. রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ'- সংকলন ও সম্পাদনা আবুল আহসান চৌধুরীম প্রবন্ধ- 'শিলাইদহ পরিচয় শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, পৃষ্ঠ- ১৩, প্রকাশক- বাংলা একাডেমী, ঢাকা প্রকাশকাল- ২৫ বৈশাখ ১৩৯৭ (বাংলা) ৯ মে ১৯৯০ (ইংরেজী)।

৭০. 'রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ- সংকলন ও সম্পাদনা- আবুল আহসান চৌধুরী, প্রবন্ধ- 'শিলাইদহের স্মৃতি'- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা- ২৬ বৈশাখ ১৩৯৭ (বাংলা) ৯ মে ১৯৯০ (ইংরেজী)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৭১. 'রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ- সংকলন ও সম্পাদনা- আবুল আহসান চৌধুরী, প্রবন্ধ- 'শিলাইদহের স্মৃতি'- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা- ২৫ বৈশাখ ১৩৯৭ (বাংলা) ৯ মে ১৯৯০ (ইংরেজী)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৭২. রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ- সংকলন ও সম্পাদনা-আবুল আহসান চৌধুরী। প্রবন্ধ- শিলাইদহে বরীন্দ্রবাবু- যতীন্দ্রনাথ বসু। পৃষ্ঠা- ৩২। প্রকাশক- বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রকাশকাল- ২৫ বৈশাখ ১৩৯৭ (বাং) ৯ মে ১৯৯০ ইং।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলার বাউল গান ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র মননে বাউলের দর্শণ ও আধ্যাত্মবাদ কিরূপ প্রভাব ফেলেছিল-তা আলোচনা করার আগে আমরা যদি তার ছেলেবেলার দিকে তাকাই, দেখা যাবে তিনি ছিলেন স্কুল পালানো ছেলে। চাকরদের তোষাখানায় রবির সমবয়সী ছোটদের আটকে রাখা হলেও তাঁর মন থাকতো জানালার ওপাশে মুক্ত পৃথিবীর দিকে। কোন রকম বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে তিনি একেবারেই টিকতে পারতেন না। কিন্তু পৃথিবীকে জানার আগ্রহ ছিল তাঁর প্রচন্ড রকম। বাবার ঘরের আলমারিতে রাখা মোটামোটা জ্ঞানের বই তিনি পড়ে ফেলেছিলেন অনেক ছোটবেলাতেই আর ঠাকুর বাড়ীতে সেকালের জ্ঞানীগুণীদের যাতায়াত ছিল সর্বদাই। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে গান শুনে শুনেই আত্মস্থ করে ফেলতেন তিনি। ছোটবেলা থেকেই সাহিত্য, সংস্কৃতিতে প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে।

কিশোর বয়সে তাঁর পরিচয় হয় বৈষ্ণব সাহিত্যের সাথে। হয়তো ঐ বয়সে তিনি বৈষ্ণবের দর্শণ ও তত্ত্ব তেমন ভাবে উপলব্ধি করতেও পারেননি। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যে আকৃষ্ট এবং প্রভাবিত হয়েছিলেন। হয়তো এই আকর্ষণের প্রধান কারন ছিল, ব্রজবুলির বৈশিষ্ট্য ও ধ্বণিগুন।[১] এ কারনেই তিনি ভানুসিংহের পদাবলী রচনার সময় ব্রজবুলির মতন একই ভাষা ব্যবহার করেছেন। সম্ভবত অনুকরণ করে রচনা করেছিলেন বলে কবি সেগুলোকে নিজের নাম দিতে চাননি। তাই ছদ্ম নামে এই গান গুলিকে প্রকাশ করেছিলেন।

বৈষ্ণব সাহিত্য ও ধর্ম দর্শন কবিকে ২০/২১ বছর বয়সে কতটা প্রভাবিত করতে পেরেছিলো তার প্রমান পাওয়া যায়- মেঘদূত কাব্যে, বিদ্যাপতির রাধিকা, বৈষ্ণব কবির গান, চন্ডিদাস ও বিদ্যাপতি, বসন্ত রায় ইত্যাদি প্রবন্ধে,[২১] এমনকি ঐ সময়ে রচিত অনেক গানে এবং কবিতায়। তবে প্রবন্ধের মত গান ও কবিতায় বৈষ্ণবতত্ত্ব নয় এবং বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি ভক্তি ও আত্মিক সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে। রাঁধার জবানিতে লেখা রবীন্দ্রনাথের যা গান ও কবিতা এসময় প্রকাশিত হয় অন্যকোন সময়ে সম্ভবত এতো প্রকাশিত হয়নি।[৩]

এদিকে ঠাকুরবাড়ীর ধর্মচর্চা ছিল ভিন্নরূপ। পরিবার থেকে যে ধর্মীয় আদর্শের শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন, তা শান্ত সমাহিত।[৪] কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মে ভক্তি ও উচ্ছাস একটু বেশী মাত্রায় দেখানো হয়। এই ভক্তি ও উচ্ছাসের বাহুল্যই কবিকে বৈষ্ণব ধর্ম থেকে সরিয়ে এসেছে। লেখক গোলাম মুরশিদ এ বিষয়ে আলোচনা প্রসংগে বলেছেন- 'বৈষ্ণব ধর্মের দ্বৈতাদ্বৈত ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার একটি সূক্ষ্ম যোগাযোগ একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বৈষ্ণব প্রভাব থেকে সরে এসেছেন। 'মানুষের ধর্ম'- পর্যায়ে তাঁর যে রচনাগুলি পাই সেখানে বৈষ্ণব ধর্মের দর্শন প্রায় কোন ছায়াপাত করেনি।[৫]

শৈশবকাল থেকেই কবি ব্রাহ্মধর্ম মতে দিক্ষিত হয়েছিলেন। ব্রাহ্মমতে তাঁর উপনয়ন হয়েছিল। উপনিষদের বাণী, 'অন্তরতর যদয়মাত্মা' কবির অন্তরে গ্রথিত হয়েছিল। কবি ৩০ বছর বয়সে জমিদারী দায়িত্বভার নিয়ে পূর্ববঙ্গে (১৮৯১) এসে এখানকার গ্রাম্য, সুর সাধকের মুখে শুনলেন 'মনের মানুষ' কথাটি। বিস্ময়ে বিদ্যুতপৃষ্ট হয়ে কবি উপলদ্ধি করলেন উপনিষদের সেই বাণীর সহজ বাংলা সংস্করণ।

শিলাইদহে থাকাকালে (১৮৯১-১৯০১) রবীন্দ্রনাথ সেখানকার অনেক বাউল, ফকির ও বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর সাথে পরিচিত হন। এখানেই বাউলের গান, বাউলের ধর্ম, দর্শন প্রভৃতির সাথে কবির আন্তরিক পরিচয় ঘটে। বাউলদের সাথে সংস্পর্শ লাভের বিষয়ে কবি 'হারামনি'র ভূমিকায় বলেছেন, 'শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদের সাথে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হতো। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহন করেছি। বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।' অন্য একটি পত্রে কবি আরো বলেছেন, "বাউলের গান শিলাইদহের খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি। নিঃসংশয়ে জানি, বাউল গানে একটা অকৃত্রিম বৈশিষ্ট্যতা আছে

যা চিরকেলে আধুনিক। আমার অনেক গান বাউলের ছাঁচের, কিন্তু জাল করতে চেষ্টাও করিনি, সেগুলো স্পষ্টত রবীন্দ্র বাউলের রচনা।[৬]

রবীন্দ্রনাথের প্রাণ ধর্মের প্রেরণা আর বাউলের প্রেরণার উৎস ছিল অভিন্ন, তাই বাউলের 'মনের মানুষ' তত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা'-র একটি সামঞ্জস্য সহজেই আবিস্কার করা যায়। বাউল গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানববাদী জীবনচেতনা ও প্রেরণা অনুভব করেছিলেন। বাউলের গান আর সহজ সাধনার ভাব একসময়ে রবীন্দ্র মানসে নিবিড় ভাবে মিশে গেছে। এভাবেই ধীরে ধীরে তিনি রূপান্তরিত হয়েছেন রবীন্দ্র বাউলে। বাউলের গানের সুর, বাণী ও তত্ত্বকথা তাকে যেমন আকৃষ্ট করেছে, তেমনি বাউলের বেশভূষায়ও তিনি প্রভাবিত হয়েছেন- বাউলের আলখাল্লা তার পোষাকের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।[৭]

বাউলেরা যেমন এগ্রাম থেকে সেগ্রামে ঘুরে বেড়ান তাঁর মনের মানুষকে খুজঁতে তেমনি রবীন্দ্রনাথও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে খুজেঁ বেড়িয়েছেন তাঁর জীবন দেবতাকে। সেরকম গুছিয়ে সংসারীও হতে পারেননি তিনি। কোন এক অজানাকে জানার জন্য অধরাকে ধরার জন্য ছুঁটেবেড়িয়েছেন তিনি। অবশেষে সভ্যসমাজ থেকে দূরে বাংলাদেশের এক অজপাড়াগাঁ শিলাইদহে এসে তিনি খুজেঁ পেলেন তাঁর জীবনদেবতাকে। 'আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন-/ সকল মন্দিরের বাহিরে/ আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল/ দেবলোক থেকে মানবলোকে,/ আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে/ আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।'

হৃদয় গভীরে 'মনের মানুষে'র ইঙ্গিত নিয়ে তারুণ্যদীপ্ত রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এসেছিলেন। শিলাইদহ তাঁর জল-হাওয়া দিয়ে ছোট চারাগাছকে বৃক্ষে পরিণত করল। পদ্মার উদ্দাম তরঙ্গ হিল্লোলে বৃক্ষ ফুলে ফলে সুশোভিত হল। সকল সৌন্দর্যরসে পূর্ণতা লাভ করে রবীন্দ্রনাথ- রবীন্দ্রবাউল হয়ে উঠলেন।

শিলাইদহে গগন হরকরা, কাঙাল হরিনাথ, গোঁসাই রামলাল, গোঁসাই গোপাল, সর্বক্ষেপী বোষ্টমী ও লালনের শিষ্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক পরিচয় ঘটে। এদের সাথে তিনি নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করতেন। শিলাইদহ ও ছেঁউড়িয়া অঞ্চল থেকে রবীন্দ্রনাথ লালন ফকির ও গগন হরকরার গান সংগ্রহ করেন এবং তা সুধী সমাজে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তিনি ছেঁউড়িয়ার আখড়া থেকে লালনের গানের দুটো পুরাতন খাতা সংগ্রহ করেন। যা এখন বিশ্বভারতীয় 'রবীন্দ্রভবনে' সংরক্ষিত আছে। এছাড়া শিলাইদহে ঠাকুর এস্টেটের কর্মচারী বামাচরণ ভট্টাচার্যকে দিয়ে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ ও লালনের কিছু গান সংগ্রহ করান। শিলাইদহ অঞ্চল থেকে তিনি লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ ও লোকশিল্পকলার বিভিন্ন নিদর্শনও সংগ্রহ করেছিলেন।

১৩২২ বৈশাখ মাসে 'প্রবাসী' নামক পত্রিকায় এসব সংগ্রহীত লোকসঙ্গীত প্রকাশের জন্য 'হারামনি' নামে একটি নতুন বিভাগ চালু করা হয়। 'আশ্বিন থেকে মাঘ এই চার মাসে কবির সংগ্রহ করা লালন শাইয়ের ২০টি গান প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। এগুলোর মধ্যে মাত্র আটটি গান রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত খাতা থেকে নেয়া।[৮] সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে ঐ খাতা দুটির বাইরেও লালনের অনেক গান কবি সংগ্রহ করেছিলেন। এমনকি বাউল গান সংগ্রহ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি অন্যদেরও উৎসাহ দিতেন। জানা যায় একই সময়ে ক্ষিতিমোহন সেনও তাঁর সংগ্রহ করা বাউল গান প্রবাসীতে প্রকাশ করেন।

কলকাতার বাঙালীদের মধ্যে লালন শাহ্ এবং তাঁর গান সম্পর্কে আগ্রহ জাগিয়ে তোলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনিই প্রথম লালনের গান প্রকাশ করেন ১৩১৪ সালে প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 'গোরা' উপন্যাসে। এছাড়া 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ' অধ্যায়ে তিনি 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়' লালনের এই গানের কথা উল্লেখ করেছিলেন। '১৯২৫ সালে ভারতীয় দর্শণ মহাসভার অধিবেশনে 'The Philosophy of our people' শীর্ষক সভাপতির ভাষণে তিনি 'অচিন পাখি'র গানের উল্লেখ করেন। .... এরপর ১৩৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত 'ছন্দের প্রকৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে কবি লালন ফকিরের দুটি সম্পূর্ণ গান ও একটি গানের অংশবিশেষ উদ্বৃত করে এর ছন্দের সুষমার প্রসংশা করেছেন।'[৯] প্রবন্ধটি পরবর্তীকালে ছন্দ গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত হয়। লালনের গানের প্রচার ও প্রসারে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হয়। লালনের গান প্রচারে কবি এতোকিছু করেছিলেন এই জন্য যে, এই গানগুলির সহজ সরল ও উচ্ছাঙ্গের তত্ত্বকথা তাঁকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেছিল। লালন ফকির-এর শিষ্যদের মাধ্যমে তিনি লালনগীতি শোনার সুযোগ পান। এছাড়া শিলাইদহের আর এক মরমী কবি গগন হরকরার কাছে তিনি লালনের গান শোনেন।

লালনের পর গগনের গানেই রবীন্দ্রনাথ বিশেষ অনুপ্রাণিত হয়েছেন। লালনের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি'র মত গগনের 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যেরে'- গানটি রবীন্দ্রনাথের অন্তস্থলে স্পর্শ করেছে। গগন বাউলের পরিচয়ের আগেই তিনি অন্য গায়কের মুখে তাঁর গান শুনেছেন এবং সেই গানের ভাবগভীরতা উপলব্ধি করে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ ও বিস্মত হয়েছেন। শিলাইদহ পোষ্ট অফিসের ডাকহরকরা ছিলেন এই গগন বাউল তাঁর পুরোনাম গগন চন্দ্র দাস, জন্মস্থান শিলাইদহের আড়পাড়া গ্রামে। সুন্দর কণ্ঠ এবং তার রচিত অসাধারণ বাউল গানের জন্য অত্র এলাকায় তাঁর বেশখ্যাতি ছিল। পোষ্ট অফিসের চিঠি বিলি করার কাজে তাকে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হতো। তিনি ছিলেন প্রাণচাঞ্চলে উদ্দাম ক্ষ্যাপা প্রকৃতির মানুষ। তিনি প্রাণের আনন্দে নেচে নেচে গান গেয়ে চিঠি বিলি করতেন। গ্রামের লোকেরা তাকে আদর করে গগন হরকরা নামে ডাকত। চিঠি বিলি করতে গিয়েই কবির সঙ্গে তাঁর পরিচয়। এরপর শিলাইদহে অবসর সময়ে কবির নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছিলেন গগন হরকরা। কবি তাঁর গানের বিশেষ ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন- 'সে সময় মাঠের মধ্যে, নদী তীরে ইনি প্রাণের আনন্দে মরমী সঙ্গীত গেয়ে শান্ত প্রকৃতিকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দিতেন, পল্লীর কুটীরে-কুটীরে রস তরঙ্গ জেগে উঠত। চিঠি বিলি করার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রায় প্রত্যহ-ই তাঁকে যেতে হত, সেখানে চলত রসালাপ, গানের পর গান, সুরতরঙ্গ। অনেকদিন সন্ধ্যার পর নির্জনে বোটের ছাদে বসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীত সুধা পান করতেন।[১০]

সরলা দেবী 'ভারতী' পত্রিকায় (ভাদ্র ১৩০২) গগনের বেশ কিছু গান প্রকাশ করেছিলেন। এদিকে রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত গগন হরকার বিখ্যাত "আমি কোথায় পাব তারে" গানটি দিয়েই 'প্রবাসী' পত্রিকার 'হারামনি' বিভাগের সুচনা হয় (বৈশাখ ১৩২২)। এছাড়া হিবার্ট লেকচার, কমলা বক্তৃতা, 'হারামনির' ভূমিকা 'An Indian Folk Religion' ইত্যাদি বক্তৃতাগুলোতে রবীন্দ্রনাথ গগনের বিভিন্ন গানের উদাহরণ দিয়েছেন এবং তাঁর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। .... 'হারামনি'র ভূমিকায় গগনের গানটি উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- 'কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে, 'তৎ বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যু পরিব্যথা'- যাঁকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণ-বেদনা। পন্ডিতের মুখের এই কথাটিই শুনলুম, তাঁর গেঁয়ো সুরে, সহজ ভাষায় যাকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকেই সকলের চেয়ে না জানবার বেদনা- অন্ধকারে যাকে দেখতে পাচ্ছ না যে শিশু; তারই কান্নার সুর- তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে।'[১১]

লালন ফকির ও গগন হরকরা মূলত এই দুইজনই রবীন্দ্রমানসে বাউলের চেতনা সঞ্চারিত করেছিলেন। বাউলের তত্ত্ব ও ভাবদর্শণ সম্পর্কে কবির ধারনা গঠনে 'আমি কোথায় পাব তারে' গানটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। গগনের গানটি প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ অবিকল এই গানের সুরে রচনা করেছিলেন 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালাবাসি'। স্বদেশী যুগের বিখ্যাত এই গানটি পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পেয়েছে।

শিলাইদহের আর এক মহিলা বাউল সর্বক্ষেপী বোষ্টমীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ও পরে একটি আন্তরিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাকে কুড়ি-বাইশ বিঘা জমি দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের থাকলে তিনি দুবেলা তাঁর সাথে দেখা করতে যেতেন ফুলের মালা নিয়ে। বোষ্টমী কবিকে ডাকতেন 'গৌরসুন্দর মোর'। জগতের সকল বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিলো, সেকারনে গাঁয়ের লোক তাঁর নাম দিয়েছিল সর্বক্ষেপী। তিনি ফুল খুব ভালবাসতেন। তাঁর আশ্রমেও প্রচুর ফুলের গাছ ছিল। এমনকি তিনি সর্বদাই আঁচলে একরাশ গন্ধরাজ ফুল নিয়ে ঘুরতেন বলে জানা যায়।

শিলাইদহে একসময় প্রচুর বাউল ও বৈষ্ণবদের আনাগোনা ছিল এবং এদের সাথে রবীন্দ্রনাথেরও ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন- 'In the same village [selaidah] I come into touch with some Baul singers. I had known them by their names, occasionally seen them singing and begging in the street, and so passed them by, vaguely classifying them in my mind under the general name of vairagis, or ascetics.'

শিলাইদহ কুটিবাড়ীর খুব কাছাকাছি দুই বাউলের আখড়া ছিল গোঁসাই রামলাল এবং গোঁসাই গোপাল। এদের সাথেও কবির যোগাযোগ ছিল। তবে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি জমিদারী ভারগ্রহন করে শিলাইদহে বসবাস শুরু করার কয়েক বছরের মধ্যেই গোঁসাই রামলাল মৃত্যুবরণ করেন। গোঁসাই গোপালের সাথে কবির বিশেষ যোগাযোগ ছিল। এঁর কাছ থেকেই বাউল সম্প্রদায়ের ধর্মদর্শন ও সাধন ভজন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সবিশেষ ধারনা জন্মায়। গোসাই গোপালের কণ্ঠ ও তাঁর সাধনা তত্ত্ব বিষয়ক গানগুলির বিশেষ ভক্ত ছিলেন কবি। মাঝে মাঝে গান শোনাবার জন্য কবি তাকে কুঠিবাড়ীতে আমন্ত্রন করতেন। জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ গোসাই গোপালেরও কিছু গান সংগ্রহ করেছিলেন। ঠাকুর এস্টেটের কর্মচারী বামাচরণ ভট্টাচার্য একসময় লোকসাহিত্য সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করেছিলেন, সম্ভবত তিনিই এই বাউলের গানগুলি কবিকে দেন। তবে গোঁসাই গোপালের সেই গানগুলি কোথাও প্রকাশিত হয়নি বলে জনা যায়। শিলাইদহ ও কুমারখালী অঞ্চলের গোঁসাই রামলাল ও গোসাই গোপালের শিষ্যদের মধ্যে গোঁসাই রামচন্দ্র, গদাধর ক্ষ্যাপা, ঠাকুরদাস ও পাঁচু ক্ষ্যাপা এদের সাথে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে লালন ফকিরের শিষ্যবৃন্দের সাথেও রবীন্দ্রনাথের দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হতো। এদের মধ্যে পাঁচু শাহ, শীতল শাহ, ভোলাই শাহ, মলম শাহ, মানিক শাহ ও মনিরুদ্দীন শাহ প্রমুখ কবির শিলাইদহে বসবাস কালে তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন। কবির পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দুই দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে লালন শাহ-র চেনাপরিচয় ছিলো, সম্ভবত তখনও রবীন্দ্রনাথ জমিদারী ভার নিয়ে শিলাইদহে যাননি। শোনা যায়, লালনের ছেঁউড়িয়ার আখড়াতেও কবি গিয়েছিলেন।

বাউলদেরকে সাধারণ লোকেরা ক্ষ্যাপা বা পাগলা বলে কারন এরা সামাজিক নিয়মকানুন, জাত-পাত মানে না। এরা কেবল এদের অন্তরের ডাক শোনে- অন্তরের ধর্মকেই তারা ধর্ম বলে মানে। বাউলের ধর্ম নিজেকে জানার ধর্ম, সহজ মানুষের ধর্ম, শাস্ত্রাচারহীন ধর্ম। রবীন্দ্রনাথও বাউলদের মতোই প্রাণ ধর্মকে মানতেন। তাই তাকে বলতে শোনা যায়- 'আমার ধর্ম কী, তা যে আজও আমি সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট করে জানি, এমন কথা বলতে পারিনে- অনুশাসন আকারে তত্ত্ব আকারে কোন পুঁথিতে লেখা ধর্ম সেতো নয়।'

কোন শাস্ত্রীয় বিধিমালা নয়, হৃদয়ধর্মই তাঁর কাছে প্রাধান্য পেয়েছে সর্বদা। বাউলের যে 'মনের মানুষ' অন্বেষণ, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ভাবনাও তাই। এ বিষয়ে তিনি আরও বলেছেন- 'বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহ-চন্দ্র তারায়। জীবন দেবতা বিশেষ ভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে, মনের মানুষ। এই মনের মানুষ এই সর্বমানুষের জীবনদেবতার কথা বলবার চেষ্টা করেছি 'Religion of Man' বক্তৃতাগুলিতে।' এই বক্তৃতা গুলিতে যে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ করেছেন তা কোন সমালোচক হিসেবে নয় বরং বাউল তত্ত্বকে বিশ্বাস করে। তিনি বাউলের গানে শুধুমাত্র একটা গভীর ধর্মতত্ত্বই আবিস্কার করেননি নিজের চিন্তা চেতনার সঙ্গে বড় ধরনের মিল খুঁজে পেয়েছেন। যার মধ্যে তার উপনিষদিক শিক্ষা, বাউলের তত্ত্ব-দর্শন ও তাঁর আপন চিন্তা ভাবনার সমন্বয় ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এখানেই যে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রীতি কিংবা পাশ্চাত্য রীতির মত বাউলের তত্ত্বকেও তিনি নিজের মতো করে গ্রহন করেছেন।

বাউলের দর্শন কবির অপূর্ণ ভাবনাকে অনেক সময়ই পরিপূর্ণতা দিতে সাহায্য করেছে। গীতালি, গীতিমাল্য ও গীতাঞ্জলী রচনার সময়কালে রবীন্দ্রনাথের ধর্মীয় শাস্ত্র এবং লৌকিকতা বিষয়ে যে দ্বন্দ্ব কাজ করছিল পরবর্তী সময়ে বাউল ধর্ম দর্শন সে সমস্ত দ্বন্দ্ব সমাধানের পথ দেখিয়েছিল। শাস্ত্রীয় ও লৌকিক ধর্ম যখন তার অন্তরে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করছিলো এমন সময় তিনি মদন বাউলের একটি গান শোনেন-

'ওগো সাঁই, তোমার পথ চাইক্যাছে মন্দিরে মসজিদে
ও তোর ডাক শুনে সাই, চলতে না পাই-
আমায় রুখে দাড়াঁয় গুরুতে মুরশেদে।'

এই গান শুনে কবি বিস্মিত হলেন, এ যেন তার-ই অন্তরের কথা তিনি বাউলের মুখে শুনছেন। 'এ গান শুনে এতো দিনে শাস্ত্রীয় ও মানব ধর্মের টানাপোড়েনের অবসান হয়। তিনি যেন আপন ভাবনারই সমর্থন খুজেঁ পেলেন এ গানের কথায়।'[12] এরপর থেকে মানুষের ধর্ম সাধনায় তিনি এগিয়ে গেছেন এবং

বাউলের দর্শন তাঁর এই পথ চলায় সাহায্য করেছে ১৮৯২-৯৩ সাল থেকে শুরু করে পরবর্তী চার/ পাঁচ বছর পর্যন্ত।

১৮৯০ দশকে বাউলদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল শিলাইদহে এবং এদের তত্ত্ব ও দর্শন কবিকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল তা আমরা এতোক্ষণ আলোচনা করলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কবির ঐ সময়কার রচনায় বাউলের প্রভাব তেমন একটা দেখা যায় না। এমন কি কবি তাঁর যত গানে বাউলের সুর ব্যবহার করেছেন সেই গান গুলিও সমসাময়িক রচনা নয়। তবে 'ওগো তোমরা সবাই ভালো' ও 'ক্ষ্যাপা তুই আছিস' এই দুটি বাউল সুরে রচিত গান সম্ভবত ১৮৯২ সালে রচিত।

মূলত ১৯০১ সালে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করার পরেই বাউল সুর তাঁর রচনায় প্রভাব ফেলতে শুরু করে। পূর্ববঙ্গের পর রবীন্দ্রনাথ স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে থাকতে শুরু করেন। কারণ শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তখন তাকে বেশী বেশী প্রয়োজন ছিল। এখানে বসবাস আরম্ভ করার পরপরই রবীন্দ্র রচনায় বাউল প্রভাব পড়তে শুরু করে, প্রথমদিকে কবিতায় এবং তারপর গানে। গানের সুরে বাউলের সুরের মিশ্রণ একটি নতুন ধারার জন্ম দেয়। শুধু বাউলের সুর নয়- কীর্তন, সারি, ভাটিয়ালী ইত্যাদি লোকসঙ্গীতের প্রত্যেকটি শাখায় রবীন্দ্রনাথের পদচারণা দেখা যায়।

এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মনে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক যে, বাউলদের দর্শন ও সুরের এই প্রভাব কি শুধুই পূর্ববঙ্গের বাউলদের প্রেরণায়?- নাকি, পশ্চিমবঙ্গের বাউলদেরও প্রেরণা ছিল! কারণ বীরভূম অঞ্চলে কবি আগেও অনেকবার এসে থেকে গেছেন এবং এ অঞ্চলে অনেক বিষ্ণব ও বাউলেরা বাস করতেন। আর রবীন্দ্রনাথও বাউল সুরে গান রচনা করলেন বীরভূমে এসেই তাই আপাতদৃষ্টিতে কবির এই নতুন ধারার গানের কৃতিত্ব যায় বীরভূমের বাউলদের ওপরই। তবে রবীন্দ্রনাথ হারামনির ভূমিকায় বলেছিলেন যে, তিনি বাউলের যে সমস্ত গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তা শিলাইদহ অঞ্চলের। 'পত্রপুট'-এর ১৫ সংখ্যক কবিতায় তিনি তাঁর মনের কথা বলেছেন-

'কত দিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে।
যে নদীর নেই কোন দ্বিধা
পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙ্গে ফেলতে।
দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।.........
কবি আমি ওদের দলে ....।'

শান্তিদেব ঘোষ বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের গানে যে বাউল সুরের প্রভাব লক্ষণীয়, তাও মধ্যবঙ্গের বাউলদের, পশ্চিমবঙ্গের নয়।[১৩] এছাড়া রবীন্দ্রনাথের সাথে শিলাইদহের যে সমস্ত বাউলের সাথে পরিচয় ছিল এবং যাদের গানে কবি মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং লালন, মদন, গগন, বিশা, হাসন রাজা যাদের নাম তিনি বারবার শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন তারা সকলেই পূর্ববঙ্গীয়। আসলে পশ্চিম বঙ্গের বাউলরা পূর্ববঙ্গের বাউলদের মতন সম্প্রদায়িকতা মুক্ত নয়। তাদের দর্শণ, তত্ত্ব ও আচার যথেষ্টই বৈষ্ণব ভাবাপন্ন। রাধাকৃষ্ণের নাম ও প্রেমলীলা তাদের ধর্ম সাধনার প্রধান অঙ্গ। আমরা লক্ষ করেছি, বাউল আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ সকল আনুষ্ঠানিকতা ও সংকীর্ণ ধর্মাচারবিরোধী মুক্তির প্রতীক বলে গন্য করেছিলেন। সে জন্যেই তিনি পশ্চিমবঙ্গের বৈষ্ণবীয় বাউলদের দর্শণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারেননি।[১৪]

রবীন্দ্রসঙ্গীত মূলতঃ বাণীপ্রধান, একথা সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু গানের কথাকে গুরুত্বদেওয়ার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ গানের সুর নিয়েও কম নড়াচাড়া করেননি। সুরের নতুন ধরনের আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা তাঁর জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। গানের নতুন নতুন পথের আবিস্কার যেন তাঁর কাছে প্রতিবার নতুন পথে মুক্তির স্বাদ পাওয়া।

প্রথম জীবনে রাগ সঙ্গীতে মৌলিক রচনার পাশাপাশি ছিল রাগ এবং ঠ্যাটের ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সঙ্গে দেশী সুরের মিলন ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে বৈচিত্র এনেছিলেন। এরপর জমিদারীর দায়িত্বভার নিয়ে পূর্ববঙ্গে যাওয়ার পর পল্লীর পরিবেশ এবং লোকজসংস্কৃতি ও সঙ্গীতের

সঙ্গে তিনি গভীর ভাবে পরিচিত হন । বাউল, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, সারি প্রভৃতি গানের ভাব-দর্শণ ও সুরের বৈচিত্র রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে। যদিও তিনি ছোটবেলা থেকেই লোকসঙ্গীতের সাথে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু শহুরে পরিবেশে সম্ভবত তিনি এর স্বাদ পুরোপুরি নিতে পারেননি। তাই যখন তিনি শিলাইদহে এলেন, এখানে গ্রামীণ পরিবেশে মাটির গান শুনলেন, তখন সত্যিই মুগ্ধ হয়েছিলেন। একথা তিনি তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও চিঠি পত্রে বহুবার লিখেছেন। এই সমস্ত মরমী সাধকদের সুর তিনি নিজের মত করে নিজের গানে প্রয়োগ করেছেন। রাগসঙ্গীত, পাশ্চাত্যসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত এই তিন ধারার সুর তিনি তার গানে ব্যবহার করেছেন। সুরের এই ত্রিবেনী সংগমের মধ্যেও তাঁর গান আপন বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্টতা লাভ করেছে।

লোকসুরের মধ্যে বাউলের গানের দর্শণ ও সুর কবিকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। বাউলের বিশ্বপ্রেমানুভূতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরে বিশ্বপ্রেমের স্পন্দন অনুভব করেছেন। এই অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কবির কাব্য, নাটক, গান ও প্রবন্ধগুলোতে। বাউল ও লোকসঙ্গীতের মিশ্রণে রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে নতুন ধারা শুরু হয়। এই ধারা স্বতোৎসারিত হয়ে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বাউল সুরারোপীত একগুচ্ছ গান রচিত হয়। এই গানগুলির প্রত্যেকটিই বাউল সুরে রচিত। এরমধ্যে কোন বাউল দর্শন ছিলো না। কারন রবীন্দ্রনাথ বাউলের সুর গ্রহন করেছিলেন নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে। কিন্তু বাউলের দর্শনে তখনো তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্য আনতে পারেননি, কিংবা বাউলের দর্শনের সাথে বোঝাপড়া তখনও তাঁর শেষ হয়নি।

পরবর্তীকালে ‘গীতাঞ্জলী’ রচনার যুগে, বাউলের দর্শন রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। বাউলের চিন্তা চেতনায় গভীর ছাপ গীতাঞ্জলীর কবিতাগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। সময়ের সাথে সাথে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম চিন্তায় বাউল ধর্মের প্রভাব লক্ষণীয়। বিশেষত তাঁর কাব্য ও নাটকে এই প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত। এরপর রবীন্দ্রনাথের গীতালী ও গীতিমাল্য রচনাকালে তাঁর আধ্যাত্ম চেতনা বিশেষ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

বাউল গানের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ধ্যান ধারনা তাঁর গানের মধ্যে ফুটে উঠেছে। গীতবিতানের পূজা পর্যায়ে বাউল উপবিভাগের জন্য ১৩টি গান তিনি বাছাই করেছেন। এই ১৩টি গানে বাউলের দর্শন ও সুর স্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয়। গানগুলি হলঃ

১. আমি কান পেতে রই, আমার আপন হৃদয় গহন দ্বারে (স্বরবিতান-১৫)
২. আমি তারেই খুজেঁ বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে (স্বরবিতান-৪২)
৩. সে যে মনের মানুষ, কেন তারে বসিয়ে রাখিস নয়ন দ্বারে? (স্বরবিতান-৩)
৪. আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে (স্বরবিতান-৪২)
৫. আমার মন যখন জাগলি নারে (স্বরবিতান-৪৪)
৬. আমি তারেই জানি তারেই জানি (স্বরবিতান-৫৬)
৭. জানি জানি তোমার প্রেমে সকল প্রেমের বাণী মেশে (স্বরবিতান-৩)
৮. তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে টুকরো করে কাছি (স্বরবিতান-৪৩)
৯. আমি যখন ছিলেম অন্ধ (স্বরবিতান-৪২)
১০. আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় কোন খ্যাপা সে (স্বরবিতান-৪৩)
১১. মন রে ওরে মন, তুমি কোন সাধনার ধন (স্বরবিতান-১)
১২. কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস (স্বরবিতান-৩৮)
১৩. আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে (স্বরবিতান-২৮)

ডঃ মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী তার ‘লোকসঙ্গীতের ধারায় রবীন্দ্রসঙ্গীত’ প্রবন্ধে লিখেছেন, ‘বাউল গানের সুনির্দিষ্ট কোনো সুর নেই অর্থাৎ বাউল সুর বলে কোনো সুনির্দিষ্ট সুররূপ নেই। মূলত লোকসুর বিশেষত ভাটিয়ালী এবং রাগসঙ্গীতের কশৌলী ঝিঁঝিটের সুর বাউল গানে লক্ষ্য করা যায়। পদ্মাপারের বাউল গানে ভাটিয়ালী সুরের প্রাধান্য দেখা যায়।’[১৫] তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, ‘অঞ্চল ভেদে একই বাউলগান ভিন্ন ভাবে আঞ্চলিক সুরে তথা লোকসুরে গীত হয়। তিনি লালন ফকিরের ‘খাচার ভিতর অচিন

পাখী' গানটির উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, গানটি কুষ্টিয়া অঞ্চলে ত্রিমাত্রিক ছন্দে শুদ্ধ স্বরে গীত হয়, আবার বীরভূম অঞ্চলে চতুমাত্রিক ছন্দে ভৈরবী ঠাটে গাওয়া হয়ে থাকে। [১৬]

রবীন্দ্রনাথ বাউল সুর বলতে প্রধানত দেশী সুর বা লোকসুরকেই বোঝাতে চেয়েছেন। এই বাউল সুর বা লোকসুরের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সহজ সরল সুর ও ছন্দ। যাকে আমরা সমপদী অর্থাৎ ৩/৩ কিংবা ৪/৪ ছন্দ বলি। রবীন্দ্রনাথ এই সহজ সুর ও ছন্দের বৈশিষ্ট্যকে তাঁর গানে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আবার কখনো ক্লাসিকেলের ধ্রুপদের মতো সঞ্চারী যোগ করেছেন কিংবা সমপদী ছন্দের বদলে বিষমপদী ছন্দ ব্যবহার করেছেন। পাশাপাশি রাগরাগিনীর মিশ্রণও ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ বাউলগান সম্পর্কে নিজেই বলেছেন, 'ক্ষণে ক্ষণে এ রাগিনীর ও রাগিনীর আভাস পাই, কিন্তু ধরিতে পারা যায় না।' বাউল গানে সাধারণত স্থায়ী হোক আর অন্তরাই হোক সব সুর একই রকম হয়ে থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে স্থায়ী, অন্তরার সুরে পার্থক্য রেখেছেন এমনকি ধ্রুপদের ধারায় সঞ্চারী যোগ করে সুর নিয়ে খেলা করবার আরো একটি স্থান প্রশস্ত করেছেন। ফলে তাঁর গানে অনেক বেশী বৈচিত্র দেখা দিয়েছে। পূর্বে উল্লেখিত ১৩টি গানের মধ্যে "আমি যখন ছিলেম অন্ধ" গানটিতে তিনি বিষমপদী ছন্দ (তেওড়া-৩/২/২) ব্যবহার করেছেন। বাউলের সুরে ছন্দ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারন এটি ভাওয়াইয়া কিংবা ভাটিয়ালীর মতো নির্জনতার গান নয়। বাউলের গান দর্শকের জন্য উপস্থাপিত হয়। তাই বাউলেরা ছন্দের তালে নেচে নেচে গান পরিবেশন করেন। গানের সহজ ছন্দের কারনে তাদের পরিবেশনা সুন্দর হয়। তবে রবীন্দ্রনাথ উক্ত গানটি রাগ ও তালের মিশ্রন করা সত্ত্বেও গানে বাউলের ঢং সুন্দর ভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। অবশ্য এ গানটি ছাড়া বাকী গানগুলি সমপদী তালেই সুরারোপীত- শুধু বাউল গানেই নয় ত্রিমাত্রিক, চতুমাত্রিক ছন্দ তিনি তাঁর অন্যান্য গানেও ব্যবহার করেছেন। তালিকার গানগুলিকে রবীন্দ্রনাথ বাউল উপপর্যায়ে ভূষিত করেছেন- কিন্তু 'আমারে কে নিবি ভাই' গানটি স্বরবিতানে কীর্তনের সুর বলে উল্লেখ আছে। অথচ এটি বাউলের অন্যান্য গানের মতোই ত্রিমাত্রিক ছন্দে দাদরা তালে নিবদ্ধ। ডঃ মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী বলেছেন, "দেশীয় প্রাচীন সুর অবলম্বনে রচিত গানগুলোর বাউলের সুর ও কীর্তনের সুরকে চিহ্নিত করা দুরূহ হয়ে পড়ে। সেকারনে বাউল সুর, কীর্তনের সুর এবং প্রাচীন সুরকে এককথায় লোকসুর বলাই যুক্তিযুক্ত।"[১৭] এই রকম প্রাচীন সুরের আদলে রচিত তাঁর আরও গান রয়েছে। যেমন- ১) ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি, ২) আমাদের ভয় কাহারে, ইত্যাদি। এছাড়াও পুঁজা পর্যায়ের বাউল উপপর্যায়ের গানগুলি ছাড়াও প্রেম, স্বদেশ ইত্যাদি পর্যায়েও প্রচুর লোকসুরে রচিত গান রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ লোকসঙ্গীতের সুর বলতে মূলত বাউলের সুরকেই বোঝাতে চেয়েছেন। কারন বাউল গানই তাঁর লোক সংস্কৃতিতে প্রেরণার উৎস। বাংলায় যারা ক্ষ্যাপা বা পাগল বলে অভিহিত, তাদের হৃদয় নিসৃত গানের প্রতি কবি সম্মান ও গভীর অনুরাগ তাঁর কবিতা, গান ও নানা প্রবন্ধে নিবন্ধে প্রকাশ করেছেন। বাউলদের জীবন দর্শন রবীন্দ্রনাথের জীবন সাধনার সাথে এমন ভাবে মিশে গিয়েছিল যে বাউলগানের মতো বাংলার আর কোন গানই তাকে তেমন ভাবে আপ্লুত করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাণের মানুষ' ও বাউলের 'মনের মানুষ' এক হয়ে গেছে। বাউলের সুরের সহজ ভাবও রবীন্দ্রনাথ তার গানে গ্রহন করেছে। তবে খুব অল্প সংখ্যক গানই হুবহু বাউল সুর বা লোকসুরে রচিত। রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ে আলোচনার ভাষায় যা মূল গান থেকে রচিত তাকে ভাঙ্গাগান বলা হয়। গানগুলি হলঃ

মূলগান	ভাঙ্গাগান
১। আমি কোথায় পাব তারে	আমার সোনার বাংলা
২। ও মন অসার মায়ায় ভুলে রবে	যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক
৩। আমার সোনার গৌর কেনে	ও আমার দেশের মাটি
৪। মন মাঝি সামাল সামাল	এবার তোর মরা গাঙে
৫। হরি নাম দিয়ে ভগৎ মাতালে	যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
৬। চাঁচর চিকর আধো (বাংলা,কাফি-কানাড়া)	বেঁধেছে প্রেমের পাশে

এই ছয়টি গান কবি সরাসরি লোকসঙ্গীত থেকে ভেঙ্গেছেন। এছাড়া কবি রচিত আরো অনেক বাউলাঙ্গ ও কীর্তনাঙ্গের গান রয়েছে যেগুলি সরাসরি মুলগান থেকে ভাঙ্গা নয়। সেজন্যেই এই গানগুলিকে রাবীন্দ্রিক ভাষায় কীর্তনাঙ্গ বা বাউলাঙ্গের গান বলা হয়েছে কারন এই গানগুলিতে বাউলের সুরের

পাশাপাশি রাগ রাগিনীর মিশ্রন ও ধ্রুপদের সঞ্চারী যুক্তকরে সুরে বৈচিত্র এনেছেন। এমনটি ধ্রুপদের গভীর ও ধীরে রসের সাথে বাউলের উদাসী ভাবটির সমন্বয় সাধন করেছেন। এত করে রবীন্দ্রনাথের গানটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সমুজ্জল হয়ে উঠেছে।

তালিকার মুল গানের সাথে ভাঙ্গা গানগুলির সুরের সামঞ্জস্য থাকলেও গানের ভাব একেবারে ভিন্ন। প্রত্যেকটি গানই স্বদেশ প্রেমের মহিমায় রচিত। দেশী সুর ভেঙ্গে যে গানগুলি কবি রচনা করেছেন বিষয় বিভাগে পর্যালোচনা করলে এগুলো স্বদেশ পর্যায়ের গান এবং গীতবিতানের স্বদেশ পর্যায়েই অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বাংলা লোকসঙ্গীতের বিচিত্র সুরের ধারা (বাউল, সারি, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, কীর্তন, জারি) কবি গ্রহন করেছেন তাঁর দেশাত্নবোধক গানগুলিতে। সেসময় (১৯০৫ সালে) 'বঙ্গভঙ্গ রদ' আন্দোলন চলকালে কবি প্রচুর দেশাত্নবোধক গান রচনা করেন। এই গানগুলোতে তিনি আমাদের নিজস্ব দেশের সুর ব্যবহার করেছেন দেশের মানুষকে স্বদেশ প্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত করতে। দু-একটি গান বাদ দিলে সে সময় রচিত সমস্ত উল্লেখযোগ্য দেশাত্নবোধক গানই বাউল সুরে রচিত। এসময় কবির একটি দেশাত্নবোধক গীত সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল যার নাম ছিল 'বাউল'। স্বজাতির প্রতি ভালবাসা ও দেশের প্রতি আনুগত্য কবির এই সময়কার রচিত গানে ফুটে উঠেছে।

'বঙ্গভঙ্গ' যুগে স্বদেশী গানের যে ধারা তিনি শুরু করেছিলেন তা জীবনের শেষাবধি পরিত্যাগ করেননি। রবীন্দ্রনাথের রচনায় দর্শন চিন্তার যে মরমী গুন দেখা যায় তা তিনি লাভ করেছেন বাউলের গান থেকেই। শুধু যে বাউল সুর রবীন্দ্রনাথের গানে প্রবিষ্ট হল তা নয়, বাউল বৈরাগীরা চরিত্র হয়ে এখন রবীন্দ্রনাথের নাটকে, বাউলধর্ম রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে গেল, বাউলের একতারা নানাভাবে উল্লিখিত হতে থাকল রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীতে।[১৮]

স্বদেশী যুগ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ যতোগান রচনা করেছেন, সেসব গানের মধ্যে যে গানগুলি বাউল বা লোকসুরে রচিত তার একটি তালিকা দেওয়া হলঃ-

গানের প্রথম লাইন	**স্বরবিতান সংখ্যা**
১। আমার পথে পথে পাথর ছড়ানো	৫
২। আমারে কে নিবি ভাই	২৮
৩। এক হাতে ওর কৃপাণ আছে	৪৪
৪। এ পথ গেছে কোনখানে গো	৫২
৫। তাঁর অন্ত নাই গো যে আনন্দে	৪১
৬। তুমি যে সুরের আগুন	৪০
৭। তুমি বাহির থেকে দিলে	৩
৮। তোমার সুরের ধারা ঝরে	নবগীতিকা ২
৯। দুঃখ যদি না পাবে তো	অরূপরতন
১০। বারে বারে পেয়েছি যে তারে	নবগীতিকা ২
১১। যিনি সকল কাজের কাজী	৫২
১২। যেতে যেতে চায়না যেতে	৪৪
১৩। লহো লহো তুলে লহো	গীতমালিকা ২
১৪। আমার কী বেদনা	৫৪
১৫। আমার প্রানের মাঝে সুধা আছে	৫৯
১৬। আনমনা আনমনা	০৩
১৭। এসো এসো ওগো শ্যামলছায়াঘন দিন	৫৬
১৮। ডাকব না ডাকব না	১
১৯। তোরা যে যা বলিস ভাই	৫৬
২০। ফিরে ফিরে ডাক দেখিরে	গীতমালিকা ২
২১। সে আমার গোপন কথা	১

২২। হৃদয়ের একূল ওকূল	১০
২৩। আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে	নবগীতিকা ১
২৪। এবেলা ডাক পড়েছে	বসন্ত
২৫। এই শ্রাবণের বুকের ভিতর	নবগীতিকা ১
২৬। কোন খ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এলো	গীতিচর্চা ২
২৭। পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে	৫৮
২৮। পথিক মেঘের দল ছোটে ওই	গীতমালিকা ২
২৯। ফাগুনের শুরু হতেই শুকনো পাতা	নবগীতিকা ২
৩০। মেঘের কোলে কোলে যায়রে চলে	নবগীতিকা ১
৩১। সকল জনম ভরে ও মোর দরদিয়া	৫২
৩২। সারা নিশি ছিলেন ভুলে	নবগীতিকা ১
৩৩। সে কি ভাবে গোপন রবে	বসন্ত
৩৪। হে আকাশ বিহারী নীরদবাহন জল	৫৬
৩৫। উতল হাওয়া লাগল আমার	তাসের দেশ
৩৬। ওগো দখিন হাওয়া	ফাল্গুনী
৩৭। ওরে শিকল তোমার কোলে করে	প্রায়শ্চিত্ত
৩৮। কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার	৬৩
৩৯। গগনে গগনে ধায় হাঁকি	তাসের দেশ
৪০। দিনের পরে দিন যে গেল	তপতি
৪১। এই তো ভালো লেগেছিল	গীতপঞ্চাশিকা
৪২। ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে	৫২
৪৩। ওগো তোরা কে যাবি পারে	৩২
৪৪। কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে	৫২
৪৫। মালা হতে খসে পড়া	অরূপরতন
৪৬। যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন	গীতপঞ্চাশিকা
৪৭। রাঙিয়ে দিয়ে যাও	১
৪৮। স্বপন পারের ডাক শুনেছি	৫২
৪৯। ওগো তোমরা সবাই ভালো	স্বর-৫
৫০। ক্ষ্যাপা তুই আছিস আপন	স্বর-৫১
৫১। আমার নাই বা হলো পারে যাওয়া	স্বর-১০
৫২। এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে	স্বর-৪৬
৫৩। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে	স্বর-৪৬
৫৪। আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে	স্বর-৪৬
৫৫। মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি	স্বর-৪৬
৫৬। তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে	স্বর-৪৬
৫৭। ছি ছি, চোখের জলে ভেজাসনে আর মাটি	স্বর-৪৬
৫৮। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক	স্বর-৪৬
৫৯। যে তোরে পাগল বলে	স্বর-৪৬
৬০। ওরে তোরা নেই বা কথা বললি	স্বর-৪৬
৬১। যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা না	স্বর-৪৬
৬২। আপনি অবশ হলি	স্বর-৫১
৬৩। ও জোনাকী, কি সুখে ওই	স্বর-৫২

৬৪। বাংলার মাটি, বাংলার জল	স্বর-৪৬
৬৫। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি	স্বর-৪৬
৬৬। ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে	স্বর-৪৬
৬৭। সার্থক জনম আমার জন্মেছি	স্বর-৪৬
৬৮। আমরা পথে পথে যাব সারে সারে	স্বর-৪৬
৬৯। আমার সোনার বাংলা	স্বর-৪৬
৭০। ও আমার দেশের মাটি	স্বর-৪৬
৭১। ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিসনে	স্বর-৪৬
৭২। নিশিদিন ভরসা রাখিস	স্বর-৪৬
৭৩। বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি	স্বর-৪৬
৭৪। আমি ভয় করব না	স্বর-৪৬
৭৫। তুমি যত ভার দিয়েছ	স্বর-২৬
৭৬। আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়	স্বর-৫০
৭৭। ওর মানের এ বাঁধ টুটবে নাকি	স্বর-০৯
৭৮। আমরা বসব তোমার সনে	স্বর-০৯
৭৯। বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি	স্বর-০৯
৮০। আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়	স্বর-০৯
৮১। রইল বলে রাখলে কারে	স্বর-০৯
৮২। ওরে, আগুন আমার ভাই	স্বর-০৯
৮৩। গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ	স্বর-০৯
৮৪। শরতে আজ কোন অতিথি এল	স্বর-৫০
৮৫। ওই আসন তলের মাটির পরে	স্বর-৩৭
৮৬। রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি	স্বর-৩৮
৮৭। কোন আলোতে প্রানের প্রদীপ	স্বর-৩৮
৮৮। তুমি এবার আমায় লহো হে নাথ	স্বর-৩৮
৮৯। যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে	স্বর-৩৭
৯০। আমার প্রানের মানুষ আছে প্রাণে	স্বর-৪২
৯১। বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের	স্বর-৪২
৯২। যা ছিল কালো ধলো	স্বর-৪২
৯৩। তোমার খোলা হাওয়া	স্বর-৪৩
৯৪। ও আমার মন যখন জাগলি নারে	স্বর-৪৪
৯৫। তোমায় নতুন করে পাবো বলে	স্বর-০৭
৯৬। সবাই যারে সব দিতেছে	স্বর-০৭
৯৭। হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে	স্বর-০৭
৯৮। ভেঙে মোর ঘরের চাবি	স্বর-০৭
৯৯। বলো, বন্ধু বলো তিনি তোমার কানে কানে	স্বঃ নেঃ
১০০। আমি তারেই খুঁজে বেড়াই	স্বর-৪২
১০১। ভুলে যাই থেকে থেকে	স্বর-৫২
১০২। ওতো আর ফিরবে নারে	স্বর-৫২
১০৩। আমি মারের সাগর পাড়ি দেব	স্বর-৫২
১০৪। তোর শিকল আমায় বিকল করবে না	স্বর-৫২
১০৫। ফিরে চল মাটির টানে	স্বর-১৫

১০৬। আমি কান পেতে রই	স্বর-১৫
১০৭। বাদল বাউল বাজায়রে একতারা	স্বর-১৫
১০৮। পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে	স্বর-৩০
১০৯। সে যে মনের মানুষ	স্বর-৩০
১১০। খর বায়ু বয় বেগে চারিদিকে ছায় মেঘে	স্বর-০৩
১১১। জানি জানি তোমার প্রেমে	স্বর-০৩
১১২। আমি যখন ছিলেম অন্ধ	স্বর-৪২
১১৩। না না না ডাকব না	স্বর-০১
১১৪। আমি তারেই জানি	স্বর-৫৬
১১৫। মাটি তোদের ডাক দিয়েছে	স্বর-১৮
১১৬। অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে	স্বর-৬২

তালিকার কিছু কিছু গান 'বাউল সুরে রচিত' এমন কথা উল্লেখ নেই। কারণ এর কোন কোনটিতে লোক সঙ্গীতের সারি বা ভাটিয়ালী প্রভৃতির আভাস আছে। হুবহু কোন সুরের ব্যবহার না করে এ গানগুলোতে কবি নতুনত্ব নিয়ে এসেছেন। একারনেই এর সুরের বৈচিত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো লোকসূত্রে রচিত এই গানগুলি কোন বিশেষ সময়ের রচনা শুধু নয় কবি সমগ্র জীবনে বিভিন্ন সময়ে এগুলি রচনা করেছিলেন।

সহজ সরল ছন্দ ও সুরের আবেদন- 'লোক সঙ্গীতের এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথ রচিত বাউলাঙ্গ গানে এই একই মর্মস্পর্শী আবেদন পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে বৈচিত্র্য আনতে লোক সঙ্গীতের এই বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়েছেন। কেবল সুরের বৈচিত্র্যে দিক থেকে নয়, লোক সঙ্গীতের ভাবগত দিকটিতে কবির রচনায় বিশেষত বাউলগানে আধ্যাত্ব চেতনারই প্রকাশ পাওয়া যায়। একারনেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূজা পর্যায়ের গানে বাউল সুর অর্থাৎ লোকসুর ব্যবহার করেছেন। আর স্বদেশ পর্যায়ভুক্ত লোকসুর ব্যবহৃত গানগুলি খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল প্রকৃতি বিষয়ক কিংবা ষড়ঋতুর উপর রচিত গানেও কবি বাউল সুর ব্যবহার করেছেন। যেমন- 'এইতো ভালো লেগেছিল', 'বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা', কিংবা বাদল বাউল বাজায়রে একতারা, ইত্যাদি। সুর বৈচিত্রের সাথে বিষয় বৈচিত্রকে একত্রিত করে রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করলেন। কিন্তু বাউল সুরের বা লোক সুরের ও তার তত্ত্ব দর্শনের সাথে রাগিনীর মিশ্রনের পরীক্ষা নিরীক্ষা এক অনন্য দৃষ্টান্ত রাখলো যা অনেক শ্রেষ্ঠ বাউল গানের পাশাপাশি নিজস্ব সন্মানের স্থান করে নেয়। 'আমি তারেই খুজেঁ বেড়াই' কিংবা 'আমি কান পেতে রই' প্রভৃতি গান এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পল্লী বাংলার বাউল গান তার ক্ষুদ্র এলাকা ছাড়িয়ে আরো বৈচিত্র্যে পূর্ণ হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে। বাউলের গান চার-পাচঁটি অংশে বিভক্ত থাকলেও স্থায়ী অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ ইত্যাদি সমস্ত প্রায় একই সুরে গাঁথা। রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গের গানে স্থায়ীর সুর অন্তরার সুর এবং সঞ্চারীর সুর ভিন্ন, তবে আভোগে অন্তরার সুরেরই পুনরাবৃত্তি হয়। কবি বাউল গানের গঠন প্রণালীকে ঠিক রেখে তার সাথে রাগ-রাগিণীর মিশ্রণ ঘটিয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দাঁড় করিয়েছেন। যেমন- 'বজ্র মানিক দিয়ে গাঁথা' গানটির সঞ্চারীতে 'দেশ' রাগের ছোঁয়া পাওয়া যায়। আবার আমি 'তারেই জানি তারেই জানি' গানটি 'পিলু' রাগের মিশ্রণ আছে। একই রাগের মিশ্রণ ঘটেছে 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও' গানটির মধ্যেও। গানগুলিতে রাগের সমন্বয় থাকা স্বত্ত্বেও বাউলের বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে।

বাংলা লোকসঙ্গীতে ভাটিয়ালী সুরের একটি বিশেষ স্থান আছে। তাই বাউল গানেও ভাটিয়ালী সুরের প্রভাব দেখা যায়। বিশেষতঃ পদ্মা নদী বিধৌত এলাকার বাউল গানে ভাটিয়ালীর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। জমিদারী কাজে রবীন্দ্রনাথ কুষ্টিয়া শিলাইদহ অঞ্চলে দশ বছর ছিলেন। এসময়ে তিনি যে সমস্ত লোকসঙ্গীত শুনেছেন তাঁর সাথে পরবর্তী জীবনে শোনা বীরভূমের লোকসঙ্গীত গুলিতে অনেক পার্থক্য অনুভব করেছেন। তবুও পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উভয় গানের সুররূপই তাঁর গানে মিশে গেছে।

অন্যদিকে ভাটিয়ালী গানে ছন্দের তেমন গুরুত্ব নেই। ভাটিয়ালীগান খুব ধীর লয়ে গাওয়া হয়। সেজন্যে এর সুর করুণ রসের এবং আবেদন মর্মস্পর্শী। ভাটিয়ালী কখনো তাল ছাড়া আবার বৈতালিকেও গাওয়া হয়ে থাকে। বাংলায় লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন ধারায় ভাটিয়ালী সুরের প্রভাব প্রবলভাবেই লক্ষ্য করা যায়। গ্রামছাড়া ঐ রাঙ্গামাটির পথ কিংবা তোমার খোলা হাওয়া গান দুটি ভাটিয়ালীর সুরে রচিত। রাগসঙ্গীতের কশৌলী ঝিঁঝিটের সঙ্গে এই সুরের সাদৃশ্য রয়েছে। সঙ্গীতজ্ঞ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী রাগসঙ্গীতের ঝিঁঝিট থেকে লোকসঙ্গীতের ঝিঁঝিটকে আলাদা করে কশৌলী ঝিঁঝিট নামে আখ্যায়িত করেছেন। রাগসঙ্গীতের ঝিঁঝিটের স্বররূপ হলঃ

সা রা মা। পা মা গা রা সা ন্া ধ্া পা।
প্া ধ্া সা রা মা গা মা গা।
ধ্া সা।

আর লোক সঙ্গীতের কশৌলী ঝিঁঝিটের স্বররূপ হলঃ সা রা মা । পা মা গা রা সা ন্া ধ্া। ধা সা সা রা গা, রা গা, সা। ভাটিয়ালী গানের সুরে এই কশৌলী ঝিঁঝিটের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই প্রভাব রবীন্দ্রনাথের গানেও কিছুটা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সারি ও ভাটিয়ালী গানের সুরমিশ্রণে রচিত কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা বলা যায়-

১. আমার সোনার বাংলা
২. গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গামাটির পথ
৩. মাটি তোদের ডাক দিয়েছে
৪. পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে
৫. বসন্তে কি শুধু কেবল
৬. তোমার খোলা হাওয়া, ইত্যাদি।

ঝিঁঝিট রাগের মতো বাংলায় বিভাস রাগের সাথে রাগ সঙ্গীতের বিভাগের পার্থক্য রয়েছে। পন্ডিত ভাতখন্ডের মতে, বাংলায় বিভাস ও দেশকার রাগিনী এক। বাংলায় বিভাস রাগিনীর জাতি ঔড়ব-খারা। আরোহনে মধ্যম ও নিখাদ বর্জিত অবরোহনে শুধুমাত্র মধ্যম বর্জিত। আরোহনঃ সা রা গা পা ধা র্সা না ধা পা গা রা সা। ভাতখন্ডের মতে বিভাস রাগে রা ও ধা কোমল হবে। কিন্তু বাংলা বিভাসে সবই শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়। বাংলা বিভাসের সুররূপ এমন যে তা শুনতে লোকগীতির সুর বলেই মনেহয়। রবীন্দ্রনাথ বিভাস রাগের আদলেও বেশ কিছু গান রচনা করেছেন। অবশ্য বিভাস রাগের মিশ্রণে এ গানগুলো লোকসঙ্গীত অর্থাৎ বাউল সুরের অন্তর্ভূক্ত। যেমনঃ- মিশ্র বিভাসে রচিত 'হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভেসে যায়' এবং 'ওলো সই ওলো সই'- গান দুটি। এছাড়া আরও কয়েকটি গানের উদাহরণে বলা যায়ঃ-

১. ডাকব না ডাকব না
২. মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
৩. এবেলা ডাক পড়েছে
৪. নিশিদিন ভরসা রাখিস ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ, শাহজাদাপুর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, পাবনা অঞ্চলে বোটে করে পদ্মা, নগর, ইছমতী, ধলেশ্বরী, আত্রাই, বড়াল ও চলন বিলের উপর দিয়ে ভ্রমন করতে করতে মাঝিদের কণ্ঠে সারি ভাটিয়ালী প্রভৃতি গান শুনেছেন। সারি গানের মুল বিষয়বস্তু তিনি আবিস্কার করেছেন রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক, কিংবা কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়। এমনটি কোন কোন সারি গানে হালকা কৌতুক রসের ছোঁয়াও থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সারি গানকে তাঁর রচনার সংকীর্ণ গন্ডি থেকে নিয়ে এসেছেন উদার-অসীম আলোকে। এখানে উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- 'ঐ দেখ কত বার, হলো খেয়া পারাপার, সারি গান উঠিল অম্বরে', কিংবা 'তোরি, সুদূর সারি গানে বিদায় স্মৃতি জাগায় প্রাণে।' সারিগান মাঝিরা নৌকা চালানোর সময় গেয়ে থাকে তাই ছন্দের দ্রুত নয় দেখা যায়। কারন নৌকা বাইতে বাইতে ক্লান্ত মাঝির গতি ধীর হয়ে আসে। তাই গান গেয়ে সময়টাকে ভরিয়ে তোলা আর দ্রুত ছন্দের তালে দাঁড় বেয়ে এগিয়ে চলাই সারি গান গাইবার মূল উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথও তাঁর গানে সারি গানের সুর ও দর্শনকে কাজে লাগিয়েছেন। যেমনঃ-

১. আমি মারের সাগর পাড়ি দেব
২. খরবায়ু বয় বেগে চারিদিক ছায় মেঘ
৩. যদি তোর ডাকশুনে কেউ না আসে
৪. এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, ইত্যাদি।

তালিকায় তৃতীয় ও চতুর্থ গানদুটির মূলগান যথাক্রমে 'হরিনাম দিয়ে জগত মাতালে' এবং 'মন মাঝি সামাল সামাল'। গানগুলি কবি সারিগানে দ্রুত ছন্দের সাথে মিল রেখে চতুমাত্রিক এবং ত্রিমাত্রিক ছন্দেই (কাহারবা, দাদরা) রচনা করেছেন। তবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের নিজস্বতা তাঁর গানের ভাবেই ফুটে উঠেছে। বাউল ও সারির মিশ্রনেও একটি গানের উদাহরণ দেওয়া যায়ঃ- আমি কান পেতে রই।লোকসঙ্গীতের আরেকটি ধারা আছে ঝুমুর। এই ঝুমুর গানের সুর অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন 'ওরে বকুল পারুল'।

বাংলায় লোকসঙ্গীতের বৈচিত্রময় ধারার আর একটি বিশেষ রূপ কীর্তন। কীর্তন বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয়, এ গান বিভিন্ন পূজা পার্বনে, গাওয়া হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে লোক সুরের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কীর্তনের সুরও গ্রহন করেছেন। কীর্তন গান সাধারনত আখর যুক্ত হয়। কবি তাঁর কীর্তনাঙ্গের বেশ কিছু গানে আখরের ব্যবহার করেছেন। তবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে আখর যুক্ত করার স্বাধীনতা কবি দেননি। তাঁর গানের আখর তিনি নিজেই সংযুক্ত করেদিয়েছেন। তবে তা অল্প কিছু গানে। শান্তিদেব ঘোষ বলেছেন, 'আখর দিয়ে গাইবার ইচ্ছা যে তাঁর ছিল না এ আমরা বুঝি তাঁর আখর দেওয়া গানের সল্পতায়। জীবনের প্রথমার্ধে কয়েকটি গানে আখর দিয়েছিলেন, ... অধিকাংশ গান অনেকগুলি কলিতে বিভক্ত এবং প্রথম দুটি কলির হুবহু অনুকরণে অন্য সব কলিতে সুর বসিয়েছেন।'[১১] আখরযুক্ত গানগুলো হলঃ-

১. নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
২. আমি জেনেশুনে তবু ভুলে আছি
৩. ওহে জীবনবল্লভ, ওহে সাধন দূর্লভ
৪. কে জানিত তুমি ডাকিবে
৫. আমি সংসারে মন দিয়েছিনু
৬. তুমি কাছে নাই বলে হের সখা তাই।

পরবর্তীতে শান্তিনিকেতনে বসবাস কালে বাউলের প্রভাব মুক্ত এবং আখর বর্জিত এক নতুন ধরনের কীর্তনাঙ্গ গান কবি রচনা করেন- যাকে 'রবীন্দ্রিক কীর্তন' বলা যায়। এ গানের সুর সারি কিংবা বাউলের মতো শুধুমাত্র তিন বা চার মাত্রার ছন্দে বাঁধা নয়। ঝাঁপতাল ও তেওড়া তালের মতো বিষমপদী ছন্দেরও ব্যবহার হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়ঃ-

১. ওরা অকারনে চঞ্চল (৪/৪ ছন্দ কাহারবা স্বর-৫)
২. আমার কী বেদনা (৩/৩ ছন্দ, দাদরা-স্বর-৫৪)
৩. যেতে যেতে চায়না যেতে (২/৩/২/৩ ছন্দ, ঝাঁপতাল, স্বর-৪৪)
৪. লহো লহো তুলে লহো (৩/২/২ ছন্দ, তেওড়া, স্বর-৩১)
৫. আমি যখন ছিলেম অন্ধ (৩/২/২ ছন্দ, তেওড়া, স্বর-৪২)

কবির জীবনের শেষভাগেই এই গানগুলি তিনি বেশীর ভাগ রচনা করেছেন এবং এগুলোকে স্পষ্ট 'রবীন্দ্রবাউলের' রচনা বলা যায়।

লোকসঙ্গীতের বিষয় বৈচিত্রে একটি বিশাল স্থান অধিকার করে আছে প্রেম। ঈশ্বর প্রেম থেকে শুরু করে মনুষ্য প্রেম বিষয়ে অনেকে রচনা থাকলেও সবচেয়ে জনপ্রিয় বিষয় হচ্ছে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার কাহিনী বিষয়ক গান। রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই প্রথম কীর্তন সুরের গান রচনা করেন। বাংলার লৌকিক প্রেম সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেম লীলার বিষয়টিকে স্বর্গীয় ভাবে উপস্থাপন করা হয়না বরং সমস্তটাই পার্থিব বর্ণনা করা হয়। রবীন্দ্রনাথও এই বিষয়ে পার্থিব প্রেমের রসই অনুভব করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়েও কিছু গান লিখেছেন, অবশ্য এতে লোকসঙ্গীতের রাধাকৃষ্ণ লীলা পরিমিত মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। যেমনঃ-

১. মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে (১২৯১)
২. দু'জনে দেখা হল- মধু যামিনী রে (১২৯১)
৩. ওগো শোনো কে বাজায় (১২৯৩)
৪. এখোনো তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশি শুনেছি (১৩০০) ইত্যাদি।

লোকসঙ্গীতের আর একটি ধারা ঝুমুর গানও রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক প্রেম সঙ্গীত। তাই রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে গান রচনা করতে ঝুমুর গানের সুর গ্রহন করেছেন। ঝুমুর গানের সুর অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন 'ওরে বকুল পারুল' তবে উল্লিখিত গানগুলিতে ঝুমুরের পাশাপাশি কীর্তনের ছোঁয়া রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা আসলে ঢপকীর্তন। 'শাস্ত্রীয় জটিল ও বহুচারী তাল থেকে মুক্ত এবং রাগ রাগিনীর বৈচিত্র সুক্ষ্মতার বাইরে একসময় এক সরল কীর্তনের ধারা প্রবাহিত ছিল। .... আখরহীন এই কীর্তনে পাচাঁলী ও যাত্রাগানের প্রভাব স্পষ্ট ছিল।'[২০] ঢপকীর্তনে শাস্ত্রীয় কীর্তনের মত আড়কোষী কিংবা লোফা প্রভৃতি জটিল তালের ব্যবহার ছিল না। রবীন্দ্রনাথও তাঁর কীর্তনাঙ্গ গানে সহজতালের ব্যবহার করতেন এবং অল্প কিছু আখর যুক্ত গান রচনার পর তিনি আখর বর্জন করলেন। রবীন্দ্রনাথের কীর্তন প্রভাবিত গানগুলির বেশ অনেকখানি জায়গা করে নিয়েছে ঢপকীর্তনের ভাব ও সুরের রীতি। 'ওকে বলো সখী', 'কেন মিছে করে ছল'- মায়ার খেলার এই গান ঢপকীর্তনের উদাহরণ হিসেবে বলা যায়।

লোকসঙ্গীতের একটি অংশে রয়েছে কর্মসঙ্গীত। তাতে স্থান পেয়েছে ধান কাটার কিংবা ধান ভানার গান, নৌকা বাইচের গান, ছাদপেটার গান, তাঁত বোনার গান ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ লোকসঙ্গীতের এই ধারা অবলম্বনেও কয়েকটি গান রচনা করেছেন। যেমনঃ- আমরা চাষ করি আনন্দে কিংবা মাটি তোদের ডাক দিয়েছে ইত্যাদি।

লোকজসংস্কৃতি ও বাউল ভাবধারা কবিকে কতটা প্রভাবিত করেছিল সে আলোচনা করতে গেলে শুধুমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতের আলোচনাই শেষ নয়। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির অন্যান্য ক্ষেত্রেও বাউলের দর্শন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাস ও নাটকে তিনি বাউল চরিত্রের সংযোজন করেছেন। এমনটি নৃত্যনাট্যেও বাউলের নেচে নেচে গান গেয়ে বেড়ানোর এই ব্যাপারটিতে উৎসাহিত হয়ে তিনি বাউল চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন। 'গোরা' উপন্যাসটি কবি যে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে শুরু করেছেন সেটাই ছিল গোরা উপন্যাসের মূল ভাবনা। যা পরোক্ষভাবে বাউল দর্শন থেকেই এসেছে 'লালন শাহ'-র বিখ্যাত 'খাচার ভিতর অচীন পাখী' গানটি বর্ষা শেষে রৌদ্র স্নাত প্রভাতী কলকাতার রাজপথে সহসা শুনতে পেয়ে উপন্যাসের অন্যতম মূখ্য চরিত্র 'বিনয়'-এর মনে যে ভাবনার স্পন্দন উঠেছিল একদিক দিয়ে বিচার করলে সেটি কাহিনীর মূল ভাবের মুখবন্ধ। ধর্ম, সংস্কার, সমাজ ইত্যাদির গন্ডীকে অতিক্রম করে ঠিক যেমন করে বাউল সাধকেরা 'এক পরম শেষের অন্বেষণে' ফেরেন, এর মধ্যেও সেই রকম একটি উপলব্ধির উদ্ভাসন ঘটেছে।'[২১] উপন্যাসের চরিত্র 'ললিতা' ও 'বিনয়' এবং 'গোরা' ও 'সুচরিতা' যেভাবে সামাজিক অনুশাসন ও ধর্ম বিশ্বাসের গন্ডী অতিক্রম করে এগিয়ে গেল, অথবা 'আনন্দময়ী' ও 'পরেশ বাবু'-র মধ্যে যে সংস্কার বিহীন উদার ধর্মভাব রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। এমন কি কাহিনীর পরিনামে দেশ জাতিধর্মের যে ভাব মূর্তিটি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর মধ্যেও বাউল ভাবধারারই একটি অস্তিত্ব অনুভব করতে পারা যায়।

রবীন্দ্রনাথের 'আঁধার ঘরের রাজা' চিত্রকল্পটির কথাই ধরা যাক। ৩০ বছরেরও বেশী সময় ধরে রাজার এই চিত্রকল্পটি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে আবর্তিত হয়েছে। বাউলদের দর্শনে যে আধ্যাত্বিক অনুভুতির উপস্থিতি তারই মতে সাধকেরা তাকে বলেন 'সাঁই' অর্থাৎ প্রভূ বা স্বামী। এই ভাবনাই রবীন্দ্র রচনায় বারবার প্রতিফলিত হয়েছে খেয়া, রাজা, অরূপরতন, শাপমোচন অবধি দীর্ঘ সময় ধরে বাউলের অন্তর্নিহিত তাত্ত্বিক প্রেরণাটি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ক্রিয়াশীল না থাকলে এই রচনা সম্ভব হতো না।

কোন বিশেষ চরিত্রকে কেন্দ্র করে নাটকের পরিনতি লেখার একটি প্রবনতা রবীন্দ্রনাথের ছিল এবং এই চরিত্রটি কম বেশী বাউল ধরনেরই দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে 'ফাল্গুনী' নাটকের অন্ধ বাউলের কথা বলা যায়। একদিকে সংসার বৈরাগী অন্যদিকে চঞ্চল প্রানবন্ত, এটাই বাউল চরিত্রের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ঠাকুর দা, ধনঞ্জয়, গুরু, বিষু পাগল- এদের চলাফেরা, কথাবলা, কাজকর্ম ইত্যাদির মধ্যেই যে অবয়ব ফুটে ওঠে সেটা যেন রবীন্দ্রনাথেরই দেখা পূর্ববঙ্গের বাউলদের প্রতিবিম্ব। এমনকি নাটকের মধ্যেও

গানের দল রবীন্দ্রনাথের বাউল প্রেমের কারনেই এসেছে। বাউল ভাবধারায় রচিত কবির আরও একটি নাটক 'গৃহপ্রবেশ'। কবি নাটকটি শেষ করেছেন ট্রাজেডী দৃশ্যের মধ্য দিয়ে আর এই ট্রাজেডী কবি ফুটিয়ে তুলেছেন গানের মধ্য দিয়ে-

"আমার মন যখন জাগলি নারে
তোর মনের মানুষ এলো দ্বারে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ডাকঘর নাটকে যে বাউল চরিত্রের অবতারনা করেছেন। তিনি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় একজন বাউল গগন চন্দ্রদাস। শিলাইদাহ পোষ্টঅফিসের ডাকহরকরা ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের নাটকে বাউল নৃত্য ও বাউল চরিত্র নির্মানের অনুপ্রেরণা কবি পেয়েছিলেন গগন হরকরার স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্য থেকে। তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি নেচে নেচে গান গেয়ে গ্রামে গ্রামে চিঠি বিলি করতেন। একারনেই গাঁয়ের লোকেরা তাকে গগন হরকরা নাম দিয়েছিল। একই ভাবে 'বোষ্টামী' গল্পের বোষ্টামী ছিলেন শিলাইদহের 'সর্বক্ষেপী' বোষ্টমী। তাঁর এই 'সর্বক্ষেপী' নামও গ্রামের মানুষেরই দেওয়া।

রবীন্দ্র সাহিত্যের বিভিন্ন জায়গায় একটু খুঁজলেই সেখানে পল্লী সংস্কৃতি। নিসর্গ চিত্র, বাউলদের সঙ্গীত ও তত্ত্বের কিছুনা কিছু আভাস পাওয়া যাবে। কবির পরিনত বয়সের কাব্য চেতনায় বাউল ভাব পরিস্ফুট হয়েছে। অন্তর্যামী, জীবন দেবতা, চিত্রা- কবিতাগুলোতে যে অন্তর্যামী, জীবনদেবতা বা লীলা সঙ্গিনীর কথা বলেগেছেন এরা সকলই বাউলের 'মনের মানুষ'। পল্লীর বাউলেরা কবির কাব্যচেতনা ও সঙ্গীত চেতনাকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল যে এই মরমী সাধনা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গেছে। এ প্রসংঙ্গে তিনি বলেছেন, 'চিত্রা কাব্যে আমি একদিন বলেছিলুম, আমার অন্তর্যামী আমাকে দিয়ে যা বলাতে চান, আমি তাই বলি। আমার একটা যুগ্মসত্তা আমি অনুভব করেছিলুম যেন যুগ্ম নক্ষত্রের মতো, সে আমারই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত, তারই আকর্ষণ প্রবল। তারই সংকল্পপূর্ণ হচ্ছে আমার মধ্য দিয়ে, আমার সুখ-দুঃখে, আমার ভালোয় মন্দয়', কবি ক্ষ্যাপা বাউলদের মতো মনের মানুষ বা তাঁর অন্তর্যামীকে খুঁজে ফিরেছেন। 'চিত্রা' কাব্যের কবিতাগুলিতে জীবন দেবতার বোধ তাঁকে গভীরতর দার্শনিকত্বে উত্তীর্ণ করেছিল। আবার একসময় সদানন্দময় বৈরাগী বাউলদের সহজীয়া মরমীভাববোধ তাকে 'রবিবাউল' করে তুলেছিল।[২২] তাই তিনি বারে বারে বলেছেন- 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই', 'আমি কান পেতে রই', 'আমার মন যখন জাগলি নারে।'

বাউল সাধকদের গানের প্রতীকী শব্দগুলি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন তাঁর জীবন ভাবনার শিল্প রূপায়নে। জীবন স্বামী (সাই), রূপসাগর, জীবনতরী, জীবননদী, দেহযন্ত্র (বাজনা অর্থে), পারের খেয়া, স্রোতের প্রদীপ, দেহপাত্র, তুমি (সাধ্য) আমি (সাধক), ঘর-বাহির, বিশ্বজোড়া ফাঁদ, দুঃখ পাথার, মারের সাগর, ব্যথার পরান প্রদীপ, সোনার নাও, রূপের হাট, মানের বাট, আলোর আলো, অচেনা ফুলের গন্ধ, অরূপরতন, অন্ধকারের দুয়ার। আলোর শব্দ- এই সমস্ত উপমা বা রূপক শব্দগুলির সমস্ত শিকড় এক হয়েছে বাউল তত্ত্বে ও দর্শনে। আরশি নগর ও অচিন পাখী, দেহ ও আত্মার প্রতীক সংকেত রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতা, অন্তর্যামী, অরূপরতনকেও তিনি সেভাবেই খুঁজে চলেছেন সারাজীবন। 'তোমার খোঁজা শেষ হবে না মোর/ তোমার অন্ত নাই গো নাই।'[২৩]

কবির নাটকের বাউল চরিত্রগুলি আবার এক একটি কবিতার মধ্যে ফুটে উঠেছে। যেমন- প্রায়শ্চিত্ত, পরিত্রাণ এবং মুক্তধারার ধনঞ্জয় বৈরাগী, শরোদ্যোসব, রাজা ও অরূপরতনের ঠাকুরদা; অচলায়ন ও গুরুর দাদাঠাকুর, ডাকঘর এর ঠাকুরদা, ফাল্গুনীর অন্ধবাউল ও রক্তকরবীর বিশু পাগল-এসব চরিত্র যেন রবীন্দ্র জীবনেরই দর্পন। সম্ভবত কবি নিজেকেই ঐ সমস্ত চরিত্র রূপে বাস্তব জীবনে দেখতে চেয়েছেন। চরিত্রগুলির তিনি সততা, আত্মত্যাগ ইত্যাদি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। গানে গানে সামাজিক বিবেককে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। ফাল্গুনী (১৩১৬) নাটকের অন্ধবাউলের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নিজে অভিনয় করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকে বাউল বা লোকসুরের মিশ্রনে যেসব গান লেখা হয়েছে তার একটি তালিকা দেওয়া হলঃ

রচনা বয়স	নাটক	বাউল/ মিশ্র সুরের গান
২৯	বিসর্জন ১৮৯০	আমারে কে নিবি ভাই
৩১	গোড়ায় গলদ ১৮৯২	ওগো তোমরা সবাই ভালো
৪৭	শারদোৎসব ১৩১৫ (ঋণশোধ)	আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় আমারে ডাক দিল কে আমি তারেই খুঁজে বেড়াই মেঘের কোলে রোদ হেসেছে শরতে আজ কোন অতিথি যা ছিল কালো ধলো
৪৮	প্রায়শ্চিত্ত ১৩১৬ (+পরিত্রাণ)	আমাকে কে বাঁধবে ধরে বাঁচান বাঁচি মারেন মারি আমারে পাড়ায় পাড়ায় রইল বসে রাখলে কারে ওরে আগুন আমার ভাই গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ আমি ফিরবো না আর
৪৯	রাজা ১৩১৭ (অরূপরতন)	আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে বসন্তে কি শুধু কেবল তোরা যে যা বলিস ভাই আমি যখন ছিলেম অন্ধ আগুনে হল আগুনময় আমি তারেই খুঁজে বেড়াই দুঃখ যদি না পাবে তো
৫১	অচলায়তন ১৩১৮ (গুরু)	এ পথ গেছে কোনখানে সব কাজে হাত লাগাই মোরা ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে আমি তারেই জানি যিনি সকল কাজের কাজী সকল জনম ভরে ও মোর দরদিয়া আমি সব নিতে চাই বাধা দিলে বাধবে লড়াই
৫৩	ফাল্গুনী ১৩২৩	তোমায় নতুন করে পাব বলে আমাদের পাকবে না চুল গো ভালো মানুষ নইরে মোরা সবাই যারে সব দিতেছে- বসন্তে ফুল গাঁথলো আমার আমাদের খেপিয়ে বেড়ায় যে ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি
৬১	মুক্তধারা ১৩২৯	আমি মারের সাগর পাড়ি দেবো

রচনা বয়স	নাটক	বাউল/ মিশ্র সুরের গান
		ভুলে যাই থেকে থেকে আরো আরো প্রভু, আরো আরো আমাকে কে বাঁধবে ধরে আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় রইল বলে রাখলে কারে
৬৪	গৃহপ্রবেশ ১৩৩২	ওরে মন যখন জাগলি নারে
৬৫	রক্তকরবী ১৩৩৩	পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে তোমার গান শোনাবো
৬৭	শেষরক্ষা ১৩৩৫	লুকালে বলেই খুঁজে বাহির করা ওগো তোমরা সবাই ভালো
৬৮	পরিত্রাণ ১৩৩৬ (প্রায়শ্চিত্ত)	তুমি বাহির থেকে দিলে বিষম তাড়া তুমি হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন
৭২	বাঁশরী ১৩৪০	না চাহিলে যারে পাওয়া যায়
৭২	তাসের দেশ ১৩৪০	আমার মন বলে চাই চাই গো
৭৭	নৃত্যনাট্য চন্ডালিকা	আমি তারেই জানি
৭৮	নৃত্যনাট্য শ্যামা	নীরবে থাকিস সখি ও তুই

রবীন্দ্রনাথের ওপর বাংলার বাউল ও তাদের গানের তত্ত্ব ও সুরের প্রভাব যতোটা দেখা যায়, তাঁর সমকালীন কবিদের থেকে শুরু করে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত কোন আধুনিক কবি সাহিত্যিক কিংবা সঙ্গীতকারদের রচনায় এতোটা বিস্তৃত প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। তাঁর কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ এবং গানে একটু খুটিয়ে দেখলেই কোন না কোন ভাবে আমরা বাউলের ছাপ খুঁজে পাব। যদিও রবীন্দ্রনাথের রচনায় বাউল মিশেছে তাঁরমতো করেই- নিজস্বতা রবীন্দ্রনাথ কখনই হারাননি। কিন্তু বাউলের ভাবধারা, তাদের জীবনতত্ত্ব ও গানের সুর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে, তিনি সত্য সত্যই 'রবীন্দ্রবাউল' হয়ে উঠেছিলেন। তিনি শিলাইদহ, কুষ্টিয়া অঞ্চলে যে সব বাউলদের অন্তরঙ্গ সহচর্য লাভ করেছিলেন, তাদেরকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি স্মরণ করেছেন। শিলাইদহের ফেলে আসা দিনগুলির কথা মনে করে তিনি উদাস হয়ে যেতেন। তাঁর অতিপ্রিয় পদ্মা শুকিয়ে যাওয়ায় তিনি আফসোস করতেন। অবশ্য এরমধ্যেও হয়তো তিনি সেখানকার সুখস্মৃতিগুলিও স্মরণ করতেন। শিলাইদহের স্মৃতি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কবির মনে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, খন্ড-১০, পৃ-১২৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৌষ, ১৪০২ ।
২. রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা- গোলাম মুরশিদ, পৃষ্টা-১০৫, বাংলা একাডেমী, প্রকাশকাল জুন, ১৯৮১ ।
৩. আত্মপরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী, পৃ-২০৮, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৌষ, ১৪০২।
৪. রবীন্দ্র বিশ্বে পূর্ববঙ্গ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা-গোলাম মুরশিদ, দ্রষ্টব্য-২, পৃষ্টা-১০৬, প্রকাশক- বাংলা একাডেমী, প্রকাশকাল জুন, ১৯৮১।
৫. কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পৃষ্টা-১০০, ১৯৫৮।
৬. রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহের বাউল সম্প্রদায়, আবুল আহসান চৌধুরী, বাউল লালন রবীন্দ্রনাথ, শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, পৃষ্টা- ১৮৯, ১৯০, , দি সরস্বতি প্রিন্টিং, কলকাতা, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ ।
৭. রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহের বাউল সম্প্রদায়- আবুল আহসান চৌধুরী, 'বাউল লালন রবীন্দ্রনাথ'- শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, দি সরস্বতি প্রিন্টিং, কলকাতা, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫, পৃষ্টা-১৯২।
৮. শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ- শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, পৃষ্টা-১১৯, ১৩৮০ সন।
৯. হারামনি (২য় খন্ড)- মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, আশীর্বাদ- রবীন্দ্রনাথ, পৃষ্টা-৩-৪, ঢাকা।
১০.দ্রষ্টব্য-২, পৃষ্টা-৬০ ।
১১.রবীন্দ্রসঙ্গীত- শান্তিদেব ঘোষ, পৃষ্টা-৯৯-১০৭, কলকাতা-আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭২।
১২.দ্রষ্টব্য-২, পৃষ্টা-১১০ ।
১৩.গানের ঝর্ণাতলায়- মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, পৃষ্টা-১৪, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ফেব্রুয়ারী-১৯৯৭।
১৪.দ্রষ্টব্য-১৩, পৃষ্টা-১৯ ।
১৫.রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিক্রমা- করুনাময় গোস্বামী, পৃষ্টা-১৪৬ (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মাঘ ১৩৯৯)।
১৬.দ্রষ্টব্য-১১, পৃষ্টা-৮২।
১৭.দ্রষ্টব্য- গানের ঝর্ণতলা, পৃষ্টা-৩৩।
১৮.রবীবাউলের একতারা, পল্লব সেনগুপ্ত, বাউল লালন রবীন্দ্রনাথ, শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, পৃষ্টা-২০৭, প্রকাশ-২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫, লোক সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ।
১৯.রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাউল ভাবনাঃ বাণী ও সুর- সুধাংশুশেখর শাসমল, বাউল, লালন, রবীন্দ্রনাথ, সম্পাদক- সনৎকুমার মিত্র, পৃষ্টা-২২১, লোকসংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা, প্রকাশকাল-২১, ফেব্রুয়ারী-১৯৯৫ ।
২০.দ্রষ্টব্য-১৮, পৃষ্টা-১১৭।
২১.দ্রষ্টব্য-১৯, পৃষ্টা-২২৩।

চতুর্থ অধ্যায়

পূর্ববঙ্গে রচিত গানের তালিকা ও সুরবিশ্লেষণ

বাংলার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ্য কবি রবীন্দ্রনাথঠাকুর। সাহিত্যের সকল ধারায় তাঁর সফল পদচারনা লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল প্রতিভাই বাংলার সাহিত্য সম্ভারকে সমৃদ্ধ করেছে। তাই যুগ যুগ ধরে বাঙালীর শিল্প-সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথের রচনা মিশে গেছে ওতোপ্রত ভাবে। বৈশাখে নতুন বছরের আমন্ত্রনে, আষাঢ়ের প্রথম দিনে, নবান্নের উৎসবে, পৌষ মেলায়, নানা রঙে মাতিয়ে ফাল্গুনের উৎসব-এমনকি বইমেলায় রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনা, কবিতা পাঠ এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবশন হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ। পাশাপাশি তাঁর নাটক, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্যও মঞ্চে এবং টেলিভিশন-রেডিওতে প্রচারিত হচ্ছে।

বাঙ্গালী তাঁকে এমন ভাবে গ্রহন করেছে তার কারণ রবীন্দ্রনাথ বাংলার সমস্ত কিছুর সাথে ভীষণ ভাবে মিশে গিয়েছিলেন। তিনি নিজের চোখে অবলোকন করেছেন পদ্মার উত্তাল তরঙ্গ, নদীর পাড়ের জনজীবন, পল্লীবালার সৌন্দর্য, ছোট ছোট ছেলের খেলা করা, চাষিদের রৌদ্র জলে ভিজে ফসল ফলানো, সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট, মাঝির ভাটিয়ালী, সারি গান, বাউলের নৃত্যগীত, গোধূলীর আকাশ, নিবিড় নিস্তব্দ তারা ভরা আকাশ কিংবা শান্ত দুপুরে পাখীর কলকাকলী আর বাতাসে গাছের পাতার সরসর শব্দ। কবি এ সমস্ত কিছুই ভালবেসেছেন এবং এর ভেতরে প্রবেশ করেছেন। তাই বুঝি তিনি নিজের প্রানে অনুভব করতে পেরেছেন বাঙালীর প্রানস্পন্দন। কবি যেমন বাঙালী জাতিকে উপহার দিয়েছেন নোবেল পুরস্কার অর্জন করার মত গীতিকাব্য, তেমন পূর্ববাংলাও তাকে দিয়েছে লেখার অনুপ্রেরণা। কবি যে শুধু দশ বছরই (১৮৯১-১৯০১) পূর্ববঙ্গে ছিলেন তা নয়, বাংলার প্রকৃতি ও পদ্মার আকর্ষণে শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি বহুবার পূর্ববঙ্গে এসেছেন। প্রায় প্রতিবারই রচিত হয়েছে অনেক বিখ্যাত রচনা। ডঃ মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী তাঁর 'গানের ঝরণাতলায়' বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি জগতের এক স্বর্ন-যুগ কেটেছে পূর্বাচলে, বিশেযত উত্তরাঞ্চলে। এ বিষয়ে কবির নিজস্ব উক্তি দেখা যায় এন্ড্রুজকে লেখা পত্রে- 'প্রতি বারেই যেন নতুন করে নিজেকে আবিস্কার করি। শহরে ভীড়ের মধ্যে আমরা জীবনের যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গী হারিয়ে ফেলি। অল্পদিনের মধ্যেই সেখানকার সবকিছু আমাকে ক্লান্ত করে। তার একমাত্র কারণ আমাদের অভ্যন্তরে যা সত্য তা সেখানে হারিয়ে যায়।' পূর্ববঙ্গে এলে কবি যেন খুঁজে পেতেন নিজেকে পূর্ব বাংলার প্রকৃতি আগাগোড়াই মুগ্ধ করেছে কবিকে। এই মুগ্ধতা তিনি স্বীকার করেছেন ছিন্নপত্রাবলীর চিঠিগুলিতে। এছাড়া পূর্ববঙ্গের নিসর্গ-চিত্র, পল্লীবাসী, পদ্মানদী আর বাউলের ছাপ ফুটে উঠেছে তাঁর রচনায়। এই ছাপ তাঁর কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতিতে ছড়িয়ে থাকলেও আমরা কেবল পূর্ববঙ্গে রচিত গানগুলি নিয়েই আলোচনা করব।

রবীন্দ্রনাথ ১৮৯১ সাল থেকে জমিদারী দেখাশুনার কাজে পূর্ববঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার পর থেকে প্রায় চার বছর প্রকৃতির সৌন্দর্য্যেই প্রায় নিমগ্ন ছিলেন। জমিদারী কাজে উত্তরবঙ্গের শিলাইদহ, পতিসর, শাহজাদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে নদী পথে ঘুরতে ঘুরতে তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনযাপন প্রনালী প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করেন এবং ধীরে ধীরে সমস্ত কিছুর সাথে পরিচিত হয়ে এর ভেতরে প্রবেশ করেন। পল্লীবাসীর সরলতা ও প্রকৃতির নিবিড়তায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বেশ কিছু কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ রচনা করেন। কিন্তু ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত কবিকে খুব একটা গান রচনা করতে দেখা যায় না। একারনেই শ্রী শান্তিদেব ঘোষ এই সময়টিকে কবির 'গীত রচনার একটি অজ্ঞাত যুগ' আখ্যা দিয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করেছেন। এই নিবন্ধে ৬টি গানের একটি তালিকা পাওয়া যায় যা ১৮৯১ থেকে ১৮৯৪ (১২৯৮-১৩০১ বাং) সালের মধ্যে রচিত। গানগুলি হলঃ-

১) খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে- নাট্যগীতি/ ৫২

কীর্তন/ তেওড়া, স্বরবিতান-৩৩, বয়স ৩০, ১৯ আষাঢ় ১২৯৯ শাহজাদপুর, 'সোনার তরী' কাব্যে (১৩০০) 'দুইপাখী' নামে মুদ্রিত কবিতা। গানের বহি বিবিধ ১২১। স্বরলিপি ভারতী ও বালক চৈত্র ১২৯৯। স্বরলিপিকারঃ সরলা দেবী।

২) শুধু যাওয়া আসা- বিচিত্র/ ৬৯

বেহাগ/ কাহারবা, স্বরবিতান-১০, বয়স ৩১। সাধনা বৈশাখ ১২৯৯। শুধু শিরোনামে স্বরলিপিসহ গানটি প্রকাশিত হয়। গানের বহি (বিবিধ) ১০২। স্বরলিপি-(১) সাধনা বৈশাখ ১২৯৯(২) বীণাবাদিনী অগ্রহায়ণ ১৩০৪(৩) সঙ্গীত প্রকাশিকা ভাদ্র ১৩১৬। স্বরলিপিকারঃ (১+২) ইন্দিরা দেবী (৩) অনুলিখিত।

৩) আমার মন মানে না- পিলু-ভীমপলশ্রী/ একতাল। স্বর-১০, প্রেম/৫৯, বয়স-৩১। গানটির চলন নির্ভূল কীর্তন। ১২৯৯ কার্তিক ১৫ থেকে একমাসের মধ্যে গানটি রচিত। স্বরলিপিতে উল্লিখিত রাগ- মিশ্র-মুলতান। স্বরলিপি বীণাবাদিনী মাঘ-১৩০৪ স্বরলিপিকার-ইন্দিরা দেবী।

৪) ঝরঝর বরিষে বারিধারা- প্রকৃতি/২৮

মেঘ/ কাহারবা, স্বরবিতান-১১, বয়স-৩৪, ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫ (৪ আশ্বিন ১৩০২), শিলাইদহ। কাব্য গ্রন্থাবলী (গান) ৪২৯। সুরভেদ/ ছন্দভেদ আছে। স্বরলিপি- (১) স্বরলিপি গীতিমালা ১৩০৪, ২) শতগান ১৩০৭, ৩) কেতকী শ্রাবণ ১৩১৬/ স্বরলিপিকারঃ ১) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২) সরলা দেবী, ৩) দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫) তুমি নতুন কি তুমি চিরন্তন- (অজ্ঞাত)

৬) ফিরে এস ফিরে এস- (অজ্ঞাত)

শুধু যাওয়া আসা গানটি প্রথমে এইরূপ ছিল-

“শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা
শুধু আলো আঁধারে ক্ষণিক কাঁদা হাসা-
শুধু দেখা পাওয়া শুধু ছুয়ে যাওয়া
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে যাওয়া
শুধু নব দুরাশায় আগে চলে যায়
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা
হৃদয়ে হৃদয়ে আধ পরিচয়
আধখানি কথা। শেষ নাহি হয়-
লাজ ভয়ে ত্রাসে আধ বিশ্বাসে
শুধু আধখানি ভালবাসা
অশেষ বাসনা লয়ে ভাঙা বল
প্রানপণ কাজে পায় ভাঙা ফল,
ভাঙ্গা তরী ধরে ভাসে পারাবারে
ভাব কেঁদে ভাঙ্গা ভাষা।

গানটির সঙ্গে কোন তারিখ নেই, এমনকি কোন বিরাম চিহ্নও চোখে পড়ে না। গানটি এভাবে লিখে কবি কেটে দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে সংশোধণ করে যেভাবে লিখেছিলেন বর্তমানে আমরা সেভাবেই গেয়ে থাকি। গানটি পরিবর্তিত রূপটি হলঃ-

‘শুধু যাওয়া আসা;
শুধু স্রোতে ভাসা;
শুধু আলো আঁধারে;
কাঁদা হাসা;
শুধু দেখা পাওয়া, শুধু ছুঁয়ে যাওয়া;
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া;
শুধু নব দুরাশায় আগে চলে যায়
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা।
অশেষ বাসনা লয়ে ভাঙ্গা বল,
প্রানপন কাজে পায় ভাঙ্গা ফল;
ভাঙ্গাতরী ধরে ভাসে পরাবারে,

ভাব কেঁদে মরে, ভাঙ্গা ভাষা!
হৃদয়ে হৃদয়ে আধো পরিচয়,
আধখানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়,
লাজে ভয়ে ত্রাসে আধ বিশ্বাসে
শুধু আধখানি ভালবাসা।

(মিশ্র বেহাগ/ তালফেরতা)

গানটির প্রথম কলি গাওয়া হবে একতালে এবং বাকী ৩ কলি ত্রিতালে। সাধণা পত্রিকায় ১২৯৯ সালের বৈশাখ সংখ্যায়, ১৩০০ সালে প্রকাশিত 'গানের বহি'তে এবং ১৩০৪ সালে 'বীনাবাদিনী' পত্রিকায়- গানটির রাগ ও তাল এভাবেই প্রকাশিত হয়। ১৩১৬ সালের ভাদ্র সংখ্যার 'সংগীত প্রকাশিকা' পত্রিকায় এ গানটির যখন তৃতীয় স্বরলিপি প্রকাশিত হয়, তখন এর রাগিনীকে বলা হলো মিশ্র বেহাগ এবং তালফেরতা বা একতালার বদলে গানটির সব কলিকে চতুর্মাত্রিক কাওয়ালী তালে পরিবর্তন করা হয়েছে। এ যুগে আমরা গানটিকে সে ভাবেই গেয়ে থাকি। তালফেরতা বা একতালে এখন আর গাওয়া হয় না।[১] অবশ্য সুরেন মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রসঙ্গীত কোষ' বইয়ে গানটির কাওয়ালী না লিখে সরাসরি কাহারবা লিখেছেন।

তালিকায় শেষ দুটি গান বিশ্বভারতীকৃত গীতবিতানে পাওয়া যায় না। সম্ভবত পরবর্তীকালে গীতবিতানের গান বাছাই করবার সময় কবি নিজেই বাদ দিয়ে ছিলেন অথবা গান দুটি কোন ভাবে হারিয়ে গিয়েছিল। 'তুমি নতুন কি তুমি চিরন্তন' গানটি কবি একটি মেয়ের অন্যপ্রাশন উপলক্ষে লিখেছিলেন। গানটি তিনি অমিতা সেনকে শিখিয়ে ছিলেন সেই অনুষ্ঠানে গাইবার জন্য। আর, 'ফিরে এস ফিরে এস' গানটি কবি 'মেঘ ও রৌদ্র'-র জন্য লিখেছেন। গানটি যে কীর্তন সুরের সে কথাও এর দশম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। কিন্তু গানটি গীতবিতানে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। তবে ১৩০১ সালের 'সাধনা' পত্রিকার আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটির সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে।

বাকী চারটি গানের মধ্যে দুটি গান কাহারবা তালে রচিত এবং দুটি গানে কীর্তনের সুরের প্রভাব রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, কীর্তনের সুর প্রভাবিত হলেও গানদুটিতে কবি তেওড়া ও একতালের ব্যবহার করেছেন। এতে বোঝা যাচ্ছে, তখনও তিনি রাগসঙ্গীতের আবহ থেকে বেড়িয়ে পুরোপুরি লোকসঙ্গীতের আবহে প্রবেশ করেননি। এছাড়া আমার মন মানে না গানটিতে রাগের মিশ্রণও পাওয়া যায়। সুরেন মুখোপাধ্যায় তাঁর "রবীন্দ্রসঙ্গীত কোষ" বইটিতে লিখেছেন এই গানে পিলু ও ভীমপলশ্রী রাগের মিশ্রণ রয়েছে আবার পাশাপাশি আরও উল্লেখ করেছেন যে, স্বরলিপিতে লেখা রয়েছে মিশ্রমুলতান। হয়তো কবি প্রথমে একসুরে গানটি রচনা করেছিলেন কিন্তু, পরে সুর বদলেছেন।

ঝরঝর বরিষে বারিধারা- গানটির রবীন্দ্রসঙ্গীত কোষে রচনাকাল লেখা হয়েছে ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫ইং। এই দিনে ইন্দিরা দেবীকে এক পত্রে কবি লিখেছেন, "আজ এই ঝড়ের ভাবটা থেমে গিয়ে সকালে অল্প অল্প রোদদুর ওঠার চেষ্টা করছে................ কাল পরশু দুদিন ঠিক আমার সেই নতুন গানের মতো দৃশ্যটা হয়েছিল- ঝরঝর বরিষে ....।"[২] এর থেকে বোঝা যাচ্ছে ২০ সেপ্টেম্বরের আগেই গানটি রচিত হয়েছিল। তালিকার গানগুলির মধ্যে এই গানটিতে পূর্ববাংলার প্রকৃতিতে ঝড়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। আর 'মেঘ' রাগের সুরে গানটিতে ঝড়ের প্রচন্ড দাপট অসাধারণ ভাবে ফুটে উঠেছে।

১৮৯৫ সালে (১৩০২) শিলাইদহে দুই মাসে কবি ২১টি গান রচনা করেন। তখন কবির বয়স চৌত্রিশ চলছে। শ্রাবণ মাসের শেষ থেকে শুরু করে শরৎকালের দুই মাস কবি শিলাইদহেই ছিলেন। বর্ষার ভরা পদ্মা, শরতের আকাশ আর শ্রাবণের বর্ষণে সজীব বনানী কবির মনকেও সতেজ করে তুলেছিল। এবার দেখা যায় গানগুলি কি ছিল-

শিলাইদহে ১৩০২ (১৮৯৫) সালে রচিত গানগুলি হলো-

১) ওলো সই, ওলো সই- প্রেম/৮১

বিভাস (কীর্তন) দাদরা, স্বরবিতান-৩৫, বয়স-৩৪। ৫ আশ্বিন ১৩০২ শিলাইদহ বোট। কাব্যগ্রন্থাবলী ১৩০৩ (গান) ৪৩০। পাঠভেদ আছে। স্বরলিপি-স্বরলিপি গীতিমালা ১৩০৪। স্বরলিপিকারঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২) মধুর মধুর ধ্বণি বাজে- বিচিত্র/১০

ইমন/ কাহারা, স্বরবিতান-১০, বয়স-৩৪, ৫ আশ্বিন ১৩০২, শিলাইদহ। স্বরলিপিতে উল্লিখিত রাগ-ইমন-ভূপালী/ কাহারা। কাব্যগ্রন্থাবলী (গান)-৪৩০, ভূপালী। পাঠভেদ এবং সুরভেদ আছে। স্বরলিপি- স্বরলিপি গীতিমালা (১৩০৪)। স্বরলিপিকারঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩) বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে- পূজা/১৪৮

মিশ্র পূরবী/ একতাল, স্বরবিতান-১০, বয়স-৩৪, ৮ আশ্বিন ১৩০২। শিলাইদহ বোট। কাব্যগ্রন্থাবলী (গান) ৪৩০। সুরভেদ আছে। গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে রবীন্দ্রনাথ স্বকণ্ঠে গানটি রেকর্ড করেছিলেন। রেকর্ড নং বিডি১২৪১। স্বরলিপি- গীতিমালা ১৩০৪। স্বরলিপিকারঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪) বিশ্ব বীণারবে বিশ্বজন- প্রকৃতি/১

শঙ্করাভরণ দক্ষিণী/ তালফেরতা, স্বরবিতান-৩৬, বয়স-৩৪। মূলগান- নাদবিদ্যা পরব্রহ্মরস- শঙ্করাভরণ (ঝাঁপতাল ও কাহারবা)। ১৩০২, আশ্বিন ৪-৯ তারিখের মধ্যে শিলাইদহ বোটে রচিত। কাব্যগ্রন্থাবলী ১৩০৩। পাঠভেদ ও সুরভেদ আছে। হিন্দুস্থান রেকর্ড থেকে হিন্দুস্থান মিউজিকেল পার্টি গানটি প্রথম রেকর্ড করেন। রেকর্ড নং এইচ ৬৩১। শিল্পীরা ছিলেন জয়া দাশ, ধীরেণ গুপ্ত, প্রভা রায়, বিজয়া দেবী (দাশ) ও হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। স্বরলিপি (১) ভারতী আশ্বিন ১৩০৪, ২) স্বরলিপি গীতিমালা ১৩০৪, ৩) শতগান ১৩০৭, ৪) কেতকী শ্রাবণ ১৩২৪, ৫) শেফালী। ভাদ্র ১৩২৬। স্বরলিপিকারঃ ১) সরলা দেবী, ২) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩) সরলা দেবী ৪+৫ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইন্দিরা দেবী।

৫) আহা আজি মোর- দেশ পঞ্চম সওয়েরী (রচনার স্থান ও তারিখ উল্লেখ নেই) স্বর-৫০।

৬) কে দিন আবার আঘাত- প্রেম/১৫৪ কেদার/ কাহারবা, স্বরবিতান-১১, বয়স-৩৪। ১২ আশ্বিন ১৩০২ বিজয়াদশমী, শিলাইদহ। চিত্রা কাব্যের 'অতিথি' শীর্ষক কবিতা। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খন্ড গান (বিবিধ), পাঠভেদ আছে। স্বরলিপি বীণাবাদিনী আষাঢ় ১৩০৫। স্বরলিকিারঃ দিনেন্দ্রানাথ ঠাকুর।

৭) এসো গো নূতন জীবন- বিচিত্র/৯। সুর অজ্ঞাত, বয়স-৩৪, ১৩ আশ্বিন ১৩০২, শিলাইদহ। কাব্যগ্রন্থাবলি চিত্রা খন্ডে (৩৭৪) 'নবজীবন' নামে মুদ্রিত। রচনাবলী চিত্রা খন্ডে নেই। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খন্ড গান। উল্লিখিত রাগ-ভৈরব।

৮) পুষ্পবনে পুষ্প নাহি- প্রেম/১৪১। ললিত-কালাংড়া/ আড়খেমটা, স্বরবিতান-১০, বয়স-৩৪, ১৪ আশ্বিন ১৩০২ শিলাইদহ। কাব্যগ্রন্থাবলী 'চিত্রা' তে 'মানস বসন্ত' নামের কবিতা, রচনাবলী চিত্রাতে নেই। পাঠভেদ আছে, স্বরলিপি গীতিমালা ১৩০৪। স্বরলিপিকারঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৯) আহা জাগি পোহাল-প্রেম ১৩৯। মিশ্র ভৈরব/ কাহারবা, স্বরবিতান-৫০, বয়স-৩৪, ১৫ আশ্বিন ১৩০২, শিলাইদহ। কাব্য গ্রন্থাবলী (গান) ৪৩১ মিশ্র ভৈরোঁ সুরভেদ আছে। রেকর্ডে উল্লিখিত রাগ রামকেলী। গ্রামোফান কোম্পানী থেকে মিস দাশ (অমলা দাশ) গানটি প্রথম রেকর্ড করেন। রেকর্ড নং- ৮-১৩৮৫৫/৮-১৩৮৬২। পরে এইচ,এম,ভি থেকে কনক দাশ (বিশ্বাস) গানটি রেকর্ড করেছিলেন। রেকর্ড নং- পি ১১৮৩৪। স্বরলিপি স্বরলিপি-গীতিমালা ১৩০৪। স্বরলিপিকারঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১০) ওহে অনাদি অসীম সুনীল- ১৬ আশ্বিন (স্বর-৭) পৃষ্ঠা-৫০

১১) তোমার গোপন কথাটি-প্রেম/৬৩। কীর্তন/ আড় খেমটা, স্বরবিতান-১০, বয়স-৩৪, ১৮ আশ্বিন ১৩০২, শিলাইদহ। কাব্য গ্রন্থাবলী (গান) ৪৩১। ছন্দভেদ ও সুরভেদ আছে। গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে অমলা দাশ গানটি প্রথম রেকর্ড করে। রেকর্ড নং (৮-১৩৮৫৫/৮১-১৩৮৬২)। স্বরলিপি স্বরলিপি- গীতিমালা ১৩০৪। স্বরলিপিকারঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১২) চিত্ত পিপাসিত রে- প্রেম/১। খাম্বাজ/ ঝাঁপতাল, স্বরবিতান-১০, বয়স-৩৪, ২৩ আশ্বিন ১৩০২ শিলাইদহ। কাব্য গ্রন্থাবলী (গান) ৪৩১। সুরভেদ/ ছন্দভেদ আছে। স্বরলিপি- স্বরলিপি গীতিমালা ১৩০৪। স্বরলিপিকারঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৩) আমি চিনি গো চিনি- প্রেম/৮৬। খাম্বাজ/ দাদরা, স্বরবিতান-৫০, বয়স-৩৪, ২৫ আশ্বিন ১৩০২, শিলাইদহ। উল্লেখিত রাগ ঝিঁঝিট/ একতাল। 'শতগান'- এ উল্লিখিত। জেনোফোন রেকর্ডে 'পূর্ণ কুমারী'র কণ্ঠে গানটি প্রথম রেকর্ড হয়। রেকর্ডে উল্লিখিত রাগ সিন্ধু। গানের শুরু তোমার চিনি গো চিনি

গো। রেকর্ড নং এক্স৩-১০৩০৩৩/ এক্স৩-১০৩০৩৭ পরবর্তী নং এন ৪৫৪। স্বরলিপি ১) স্বরলিপি-গীতিমালা ১৩০৪ (২) শতগান ১৩০৭। স্বরলিপিকারঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর/ ২) সরলা দেবী।

১৪) আমরা লক্ষীছাড়ার দল- বিচিত্র/১১২। দেশমল্লার/ দাদরা, স্বরবিতান-৫১, বয়স ৩৪, ২৯ আশ্বিন ১৩০২ শিলাইদহ। উল্লিখিত রাগ খাম্বাজ, বাঁশরী নাটক (১৩৪০ অগ্রহায়ন) গান। কাব্য গ্রন্থাবলী ১৩০৩ স্বরবিতান-৫১। স্বরলিপিকারঃ ইন্দিরা দেবী।

১৫) ওগো ভাগ্যদেবী পিতামহী- বিচিত্র/১২৪। বিভাস/ দাদরা, স্বরবিতান-৫১, বয়স-৩৪, ১ কার্তিক ১৩০২ শিলাইদহ। কাব্যগ্রন্থাবলী (গান) ৪৩২, ১৩০৩। স্বরলিপি পান্ডুলিপি চৈত্র ১৩৬৩। স্বরলিপিকারঃ ইন্দিরা দেবী।

১৬) যে আসে ধীরে- প্রেম/১৪০। দেশ/ দাদরা, স্বরবিতাব-১০, বয়স-৩৪।

১৮ কার্তিক ১৩০২ জোড়াসাকোঁ। ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে 'গৃহপ্রবেশ' অভিনয়কালে গানটি 'হিমি'র কণ্ঠে গীত হয়। কাব্য গ্রন্থাবলী। আশ্বিন ১৩০৩। পাঠভেদ এবং তালভেদ আছে। গানটি আমলা দাশের কণ্ঠে গ্রামোফোন কোম্পানীতে ৯-১৩৩১০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রেকর্ডে উল্লিখিত নীহারবালার কণ্ঠে গীত হয়। রেকর্ড নং-পি ৮৯০৫। স্বরলিপি স্বরলিপি-গীতমালা- ১৩০৪। স্বরলিপিকারঃ জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৭) ওহে সুন্দর মম- প্রেম/১৮৭। মিশ্র খাম্বাজ/ দাদরা, স্বরবিতান-৩২, বয়স-৩৪, ২৫ কার্তিক ১৩০২, জোড়াসাকোঁ। কাব্যগ্রন্থাবলী (গান) ৪৩২। স্বরলিপি-পান্ডুলিপি আশ্বিন ১৩৬০। স্বরলিপিকারঃ ইন্দিরা দেবী।

১৮) তুমি যেওনা এখনি- প্রেম/১৫২। ভৈরবী/ ত্রিতাল, স্বরবিতান-১৩, বয়স-৩৪, ২৪ কার্তিক ১৩০২ জোড়াসাঁকো, কাব্যগ্রন্থাবলী (গান) ৪৩৩। পাঠভেদ এবং তালভেদ আছে, গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে রবীন্দ্রনাথ স্বকণ্ঠে গানটি রেকর্ড করেন। রেকর্ড নং বিডি ১২৩৩। এর পূর্বে কনক বিশ্বাস এইচএমভি থেকে গানটি রেকর্ড করেন, রেকর্ড নং- পি ১১৭৭০। স্বরলিপি স্বরলিপি-গীতিমালা (১৩০৪)। স্বরলিপিকারঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯) আকুল কেশে আসে- প্রেম/১৫৩। মিশ্র ভৈরবী/ কাহারবা, স্বরবিতান-১৩, বয়স-৩৪। ২৫ কার্তিক ১৩০২ জোড়াসাঁকো, বিকল্প রাগ রামকেলী, কাব্যগ্রন্থাবলী স্বরলিপি সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা, পৌষ ১৩৩৬। স্বরলিপিকারঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২০). হৃদয় শশী হৃদী গগনে- পূজা/৫২৩। ইমন কল্যাণ/ একতাল, স্বরবিতান-৪, বয়স-৩৪। ২৯ কার্তিক ১৩০২, জোড়াসাঁকো। পাঠ-হৃদয় চন্দ্র হৃদি গগনে। ১৩০৭ সালের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২২ শক ফাল্গুন (১৩০৭) পৃ-১৭৭। সুরভেদ আছে। কাব্যগ্রন্থ-৮। স্বরলিপি (১) সঙ্গীত প্রকাশিকা চৈত্র ১৩০৮ এবং (২) ব্রহ্মসঙ্গীত স্বর বিতান-১, মাঘ ১৩১১। স্বরলিপিকারঃ (১+২) কাঙ্গালীচরণ সেন।

২১) কী রাগিনী বাজালে হৃদয়ে- প্রেম/৫৫। কানাড়া/ একতাল, স্বরবিতান-১০, বয়স-৩৪। ২৯ কার্তিক, ১৩০২, জোড়াসাঁকো। কাব্যগ্রন্থাবলী (গান) ৪৩৩। স্বরলিপি বীনাবাদিনী ভাদ্র ১৩০৪। স্বরলিপিকারঃ ইন্দিরা দেবী।

তালিকার প্রথম গানটি একটি ছোট্ট ইতিহাস পাওয়া যায় সাহানা দেবীর স্মৃতিকথায়- 'শিলাইদহে কবি যখন স্বপরিবারে বাস করতেন তখন মাসিমাও (অমলাদাশ) ওদের সঙ্গে প্রায় থাকতেন। .... কবি পত্নীর সঙ্গে ছিল মাসিমার সবচেয়ে বেশী ভাব। এই দুই সখীর একত্র বসে অন্তরঙ্গভাবে গল্পলাপাদির একটি চিত্র আছে রবীন্দ্রনাথের গানে; গানটি হচ্ছে- 'ওলো সই ওলো সই' উল্লেখিত মাসিমা অর্থাৎ অমলা দাশের শিলাইদহে থাকার বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পত্রেও দেখা যায়। এই গানটি বিভাস রাগে ৩/৩ ছন্দে দাদরা তালে কীর্তনের ঢঙ্গে রচিত।

এই তালিকায় ১৫ সংখ্যক গানটিও বিতাস রাগে, দাদরা তালে নিবদ্ধ। 'ওলোসই' গানটি ছাড়াও এই তালিকার ১১ সংখ্যক গানে কবি কীর্তনের সুর ব্যবহার করেছেন এবং তাল হচ্ছে আড়-খেমটা। আড়-খেমটা তালের আরেকটা গান 'পুষ্পবনে পুষ্প নাহি'। এই গানটিকে মুলত কবিতা থেকে গানে রূপান্তরিত করা হয়েছে তাই গানের বাণী কবিতার থেকে ভিন্ন।

এই তালিকার গানগুলিতে কবি কয়েকটি তাল ঘুরে ফিরে ব্যবহার করেছেন, যেমন- দাদরা, কাহারবা ও একতাল। তবে, ত্রিতাল, আড়খেমটা এবং ঝাঁপতালেও কয়েকটি গান রয়েছে। প্রকৃতি পর্যায়ের

অন্তর্গত 'বিশ্ববীনারবে' গানটি কাহারবা ও ঝাঁপতালে তালফেরতা করে গাওয়া হয়। এই গানে কবি বাংলাদেশের ষড়ঋতুর প্রাকৃতিক বর্ণনার পাশাপাশি নানা উৎসবের কথাও বলেছেন, যেমন- 'আশ্বিনে নব আনন্দ, উৎসব নব'। এক একটি ঋতুর বর্ণনা শেষ হওয়ার সাথে সাথে তালেরও পরিবর্তন হওয়ায় এতো বড়ো গানটি ক্লান্তিকর না হয়ে বৈচিত্রময় হয়ে উঠেছে। গানটির প্রথম প্রকাশ পকেট বুকের পর দ্বিতীয় প্রকাশ স্বরলিপি-গীতমালায় (১৩০৪) সামান্য পাঠান্তর হয়েছিল। এরপর ১৩০৭ সালে 'শতগান' গ্রন্থে আর একটু পরিবর্তন করা হয়। এরপর ১৩১০ সালে 'গান'-এ পাঠান্তরের শেষরূপ- প্রকাশিত হয়।

এই ২১টি গানে তালের মতো রাগ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ঘুরে ফিরে ভৈরবী, খাম্বাজ, বিভাস রাগের পাশাপাশি ইমন-কল্যাণের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও পূরবী, শংকরাভরণ দক্ষিণী, কেদারা, দেশমল্লার, ভৈরব, কানাড়া প্রভৃতি রাগও কবি কয়েকটি গানে ব্যবহার করেছেন। দুটি গানে আমার দুই রাগের মিশ্রণও ঘটেছে- 'মধুর ধ্বনি বাজে' (২ সংখ্যক)'- ইমন-ভূপালী আর 'পুস্পবনে পুস্প নাহি' (৮ সংখ্যক)- ললিত/ কালাংড়া।

'আহা, জাগি পোহালো' গানটির সঞ্চারী দুটি লাইন-

> 'শরতপ্রভাত নিরাময় নির্মল, শান্তসমীরে কোমল পরিমল।
> নির্জন বনতল শিশির সুশীতল, পুলকাকুল তরুবল্লরী।'

-এ যেন শিলাইদহে ১৩০২ সালের শরৎকালেরই একটি চিত্র।

দুবছর পর ১৩০৪ সনের ভাদ্র মাসের শেষ দিক থেকে আশ্বিনের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত মোটামুটি ১৫টি গান রচনা করেন। পাশাপাশি এতোগুলো গান রচনার রহস্যটি হচ্ছে 'কবির সঙ্গে মৃণালিনী দেবী, অমলা দেবী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কবির পুত্র কন্যারা ১৩০৪ সালের আশ্বিন মাসে পতিসরে ছিলেন। সম্ভবত অমলাদেবীর উপস্থিতিই পুনরায় কবিকে গান রচনায় উৎসাহ যুগিয়েছিল।[৪]

বাংলা ১৩০৪ সনের ভাদ্র থেকে ১৩ আশ্বিন পর্যন্ত পতিসরে কবির লেখা মোট গানের সংখ্যা ১৫টি। গানগুলি হলো-

১) বৃথা গেয়েছি বহুগান- প্রেম ও প্রকৃতি/ ৫৫। মিশ্র কানাড়া/ একতাল, বয়স-৩৬, ১৩০৪ সালের ভাদ্রমাসে রচিত। গানটি অন্য কোন গীত সংগ্রহে পাওয়া যায়নি। ইন্দিরা দেবীর 'গানের বহি'তে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে গানটি উল্লিখিত। বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্তিক-পৌষ ১৩৫৩। স্বরলিপি নেই।

২) কেন বাজাও কাকঁন কনকন- প্রেম/১২৩। কাফি/ তেওড়া, স্বরবিতান-১৩, বয়স-৩৬, ১৩০৪ সালের আশ্বিন মাসে রচিত। কল্পনা ১৩০৭ বৈশাখ 'লীলা' কবিতা। কাব্যগ্রন্থ ৮ম গান (বিবিধ) কলম্বিয়া রেকর্ড থেকে সন্তোষ সেনগুপ্ত গানটি প্রথম রেকর্ড করেন। রেকর্ড নং এন ১৭৪৩৪। স্বরলিপি সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রকাশিকা আষাঢ় ১৩৪১। স্বরলিপিকারঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩) হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল- প্রকৃতি/ ৩০। গৌড়মল্লার/ কাহারবা, স্বরবিতান-১১, বয়স-৩৬। আশ্বিন ১৩০৪, ইছামতী। কল্পনা কাব্যের ১৩০৭ বৈশাখ 'নববিরহ' নামে প্রকাশিত। পাঠ 'হেরি নবীন শ্যামল ঘন' কাব্যগ্রন্থ ৮ম খন্ড গান। পাঠভেদ এবং সুরভেদ আছে। জোনোফোন রেকর্ডে সত্যভূষণ গুপ্তের কণ্ঠে এটি প্রথম প্রকাশিত রেকর্ড। রেকর্ড রাগ নাম মল্লার। রেকর্ড নং জেড৩-১০২০০৪। স্বরলিপি কেতকী শ্রাবণ ১৩৩৫ স্বরবিতান-১১। স্বরলিপিকারঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪) এবার চলিনু তবে- নাট্যগীতি/৫৯। বিভাস/ একতাল, স্বরলিপি নেই, বয়স-৩৬, ৭ আশ্বিন ১৩০৪, ইছামতী, কল্পনা বৈশাখ ১৩০৭ বিদায় শীর্ষক কবিতা। প্রদীপ বৈশাখ ১৩০৫, ২য় ভাগ।

৫) কেন যামিনী না যেতে জাগালে না- প্রেম/ ১২৪। ভৈরবী/ একতাল, স্বরবিতান-৫০, বয়স-৩৬, ১৩০৪ সালের ৭ আশ্বিন যমুনা নদী। কল্পনা কাব্যে (বৈশাখ ১৩০৭) লজ্জিতা কবিতা। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খন্ড গান (বিবিধ) ২৪, পাঠভেদ আছে। গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বাকচি গানটি প্রথম রেকর্ড করেন। রেকর্ড নং (২-১২৭৮০/১২৭৮১) পরবর্তী নং পি ১০৫। স্বরলিপি পান্ডুলিপি চৈত্র ১৩৬৩। স্বরলিপিকারঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৬) বন্ধু কিসের তরে অশ্রু ঝরে- নাট্যগীতি/ ৬০। বিভাস/ একতাল, স্বরলিপি নেই, বয়স-৩৬। ৭ আশ্বিন ১৩০৪ বড়াল নদী। পরিবর্ধন ৭ আষাঢ় ১৩০৫ নাগর নদী পতিসর। ভারতী শ্রাবণ ১৩০৫ সংখ্যায়

'হতভাগ্যের গান' নামে মুদ্রিত। কল্পনা বৈশাখ ১৩০৭ 'হতভাগ্যের গান' ইন্দিরা দেবীঃ স্মৃতি আশ্রিত মাত্র কয়েক ছত্রের স্বরলিপি।

৭) আমি কেবলি স্বপন করেছি- বিচিত্র/৬৮। বেহাগ/ একতাল, স্বরবিতান-৫১, বয়স-৩৬। ৮ আশ্বিন ১৩০৭, বলেশ্বরী, কল্পনা (বৈশাখ ১৩০৭) 'কাল্পনিক'। পাঠভেদ আছে। স্বরলিপি শতগান ১৩০৭। স্বরলিপিকারঃ সরলা দেবী।

৮) ভালবেসে সখী নিভৃতে যতনে- প্রেম/৩৪। কীর্তন/ একতাল, স্বরবিতান-৫৬, বয়স-৩৬। ৮ আশ্বিন ১৩০৪, শাহাজাদপুর,। 'কল্পনা' কাব্যের যাচনা কবিতা। কল্পনা বৈশাখ ১৩০৭। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খন্ড গান। পাঠভেদ আছে। রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠে গানটি গ্রামোফোন কোম্পানীতে গীত হয়। রেকর্ড নং- বিডি ১২৪২। স্বরলিপি- পান্ডুলিপি স্বরবিতান-৫৬, আশ্বিন ১৩৬৫। স্বরলিপিকারঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

৯) তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা- প্রেম/৩৬, প্রেম ও প্রকৃতি/৫৬। ইমন-কল্যাণ/ একতাল, স্বরবিতান-১০, বয়স-৩৬। ৯ আশ্বিন ১৩০৪ চলন বিল। পাঠ-তুমি সন্ধ্যার মেঘ, শান্ত সুদূর। কল্পনা (১৩০৭) মানস প্রতিমা। বীণাবাদিনী- জৈষ্ঠ্য ১৩০৫। পাঠান্তর ও সুরান্তর আছে। এক পিঠের নিকোল রেকর্ডে গানটি প্রথম প্রকাশিত হয় এস,বি গুপ্ত ও বকুবাবুর কণ্ঠে। পরে গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে সত্যভূষণ গুপ্ত গানটি রেকর্ড করেন। রেকর্ড নং (১২-১২৬২২/৮-১৪৪৮৩)। পরবর্তী নং পি ১৬৩৯। এর পরে কলম্বিয়া থেকে মাধুরী দে বিশ্বাস গানটি রেকর্ড করেন। রেকর্ড নং এন ৭৩৬৬। স্বরলিপি (১) বীণাবাদিনী জৈষ্ঠ্য ১৩০৫(২) ভারতী আষাঢ় ১৩০৬ (০৩) ঝঙ্কার জৈষ্ঠ্য ১৩৪২। স্বরলিপিকারঃ (১) ইন্দিরা দেবী, (২) সরলা দেবী।

১০) যদি বারণ কর তবে- প্রেম/ ১২২। মিশ্র ছায়ানট/ কাওয়ালি, স্বরবিতান-১০, বয়স-৩৬। ৯ আশ্বিন ১৩০৪, চলন বিল। কল্পনা কাব্যের (বৈশাখ ১৩০৭) সংকোচ কবিতা। কাব্যগ্রন্থ ৮ম খন্ড গান(বিবিধ) ২০। বীণাবাদিনী মাঘ ১৩০৪। প্যাথে এইচ বোসেজ রেকর্ড থেকে রাণীসুন্দরী গানটি সর্বপ্রথম রেকর্ড করেন। রেকর্ড নং- (৪৬০১৬/৪৬০২২) ১৯০৮-১৯১২। এরপর নিকোল রেকর্ড (এক পিঠের রেকর্ড) থেকে মিস রাধারাণী গানটি রেকর্ড করেন। এর পরবর্তী সময়ে গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী গানটি রেকর্ড করেন। রেকর্ড নং- (৯-১২৫৮৫/৯-১২৫৬২) পরবর্তী নং- পি ১৬৫০। স্বরলিপি বীণাবাদিনী মাঘ ১৩০৪। স্বরলিপিকারঃ ইন্দিরা দেবী।

১১) আমি চাহিতে এসেছি- প্রেম/৫৩। কালাংড়া/ দাদরা, স্বরবিতান-৫০, বয়স-৩৬। ১০ আশ্বিন ১৩০৪ সাল। কল্পনা (বৈশাখ ১৩০৭) কাব্যের প্রার্থী কবিতা। সুরভেদ আছে। স্বরলিপি শেফালী আষাঢ় ১৩৩৫। স্বরলিপিকারঃ ইন্দিরা দেবী।

১২) সখি প্রতিদিন হায়- প্রেম/ ৬১। ছায়ানট/ দাদরা, স্বরবিতান-৫০, বয়স-৩৬। ১০ আশ্বিন, নাগর নদী, কল্পনা বৈশাখ ১৩০৭ সকরুনা শিরোনামে প্রকাশিত। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা ১৩৪৫-তে প্রথম চার পংক্তি পঞ্চম দৃশ্যে প্রমদার গান। পাঠভেদ আছে। গানটি শিল্পী কনক দাশের কণ্ঠে এইচএমভি থেকে প্রথম গীত, রেকর্ড নং পি ১১৮৪৩। স্বরলিপি শেফালী, স্বরবিতান-৫০, ভাদ্র-১৩২৬। স্বরলিপিকারঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৩) বিধিডাগর আঁখি- প্রেম ও প্রকৃতি/ ৫৭। ভৈরবী/ ত্রিতাল, স্বরবিতান-৫১, বয়স-৩৬। ১০ আশ্বিন ১৩০৪ নাগর নদী সঙ্গীত প্রকাশিকা শ্রাবণ ১৩১২, পাঠভেদ আছে। স্বরলিপি সঙ্গীত প্রকাশিকা শ্রাবণ ১৩১২। স্বরলিপিকারঃ অনুল্লিখিত।

১৪) বধু মিছে রাগ করো না- প্রেম ও প্রকৃতি/ ৫৮। মিশ্র ঝিঁঝিট/ একতাল, স্বরবিতান-৩২, বয়স-৩৬। ১০ আশ্বিন ১৩০৪ পতিসর। ইন্দিরা দেবীর 'গানের বহি' তে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে গানটি পাওয়া যায়। বীণাবাদিনী, পান্ডুলিপি বীণাবাদিনী। স্বরলিপিকারঃ ইন্দিরা দেবী।

১৫) ওগো কাঙাল আমারে- প্রেম/৩৫। মিশ্র ভৈরবী/ একতাল, স্বরবিতান-৩৫, বয়স-৩৬। ১৩০৪ সালের ১২ আশ্বিন, পতিসর উৎসাহ প্রত্রিকা জৈষ্ঠ্য ১৩০৫। গান- ভিখারী, কল্পনা কাব্যে ভিখারী কবিতা, পাঠভেদ আছে। হিন্দুস্থান রেকর্ড থেকে রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠে গানটি ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়। রেকর্ড নং- এইচ ১৭০০। এর পূর্বে গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে বিভূতি সেন গানটি রেকর্ড করেছিলেন। রেকর্ড

নং পি-৬৭৮০। পরে ১৯০৩ সাল নাগাদ কনক দাশ এইচএমভি থেকে গানটি রেকর্ড করেছিলেন। রেকর্ড নং পি ১১৫৪২১ স্বরলিপি বীণাবাদিনী জৈষ্ঠ্য ১৩০৬। স্বরলিপিকারঃ অনুল্লিখিত (ইন্দিরা দেবী?)।

২৮ ভাদ্র থেকে ১২ আশ্বিন পর্যন্ত এ গানগুলো রচিত হয়েছে। এ পর্যায়ে কবি বিভিন্ন সময়ে ইছামতি, যমুনা, বড়াল, বলেশ্বরী, নাগর প্রভৃতি নদীসহ চলন বিলের ওপর দিয়ে ভ্রমণ করেছেন। এমনকি শাহজাদপুর এবং পতিসরে ২/৩ দিন ছিলেন। এই সময়কার গানগুলি কবির ৩৬ বছর বয়সের রচনা। এই গানগুলিতে একতালের ব্যবহার বেশী দেখা যাচ্ছে। দুটি গান দাদরায় এবং ছয়টি গান যথাক্রমে তেওড়া, কাহারবা, কাওয়ালী, দাদরা ও ত্রিতালে বাঁধা, বাকী ৭টি গানই একতালে নিবদ্ধ।

আগেরবারের মতো ভৈরবী, বিভাস, ইমনকল্যাণ, কানাড়া ও কালংড়া রাগ কবি এবারেও ব্যবহার করেছেন। তবে এবারে আরও নতুন কিছু রাগরূপ কবির গানে প্রবেশ করেছে, যেমন- কাফি, গৌড়মল্লার বেহাগ, ছায়ানট এবং ঝিঁঝিট। তবে এদের বেশীর ভাগই মিশ্র, যেমন- মিশ্র ছায়ানট, মিশ্র ঝিঁঝিট ইত্যাদি। অর্থাৎ কোন রাগই কবি তাঁর গানে পুরোপুরি ব্যবহার করেননি। এই সমস্ত রাগের রূপ কবি তাঁর নিজের মতকরে ব্যবহার করেছেন।

এই তালিকার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বেশীর ভাগ গানই প্রেম বিষয়ক বা প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক। শুধু বিচিত্র পর্যায়ের একটি গান 'আমি কেবলি স্বপন' আর নাটকের দুটি গান 'বন্ধু কিসের তরে' এবং 'এবার চলিনু তবে' দেখা যায়।

তালিকার ২য় গান 'কেন বাজাও কাঁকন কনকন' সম্বন্ধে কবি 'সঙ্গীতচিন্তায়' লিখেছেন- 'প্রথম বয়সে আমি হৃদয় ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সে গান ভাব বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলি অধিকাংশই রূপের বাহন। 'কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছল ভরে' এতে যা প্রকাশ পাচ্ছে তা কল্পনার রূপলীলা।' গানটি প্রথমে কবি যেভাবে লিখেছিলেন সেটি শান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রায়' পাওয়া যায় এভাবে-

'কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছল ভরে
ওগো ঘরে ফিরে চল কনক কলসে জল ভরে।
কেন জলে ঢেউ তুলি ছলকি ছলকি (কর খেলা ছলছল)
কেন চাহ খনে খনে ত্বরিত নয়নে কার তরে কত ছল ভরে।
হের যমুনা বেলায় আলসে হেলায় গেল বেলা
যতি হাসি ভরা ঢেউ করে কানাকানি কলস্বরে।
হের নদী পরপারে গগন কিনারে মেঘ মেলা,
চাহে হাসিয়া হাসিয়া গোপনে তোমারি মুখ পরে কত ছল ভরে।'[৫]

পরবর্তী কালে কবি গানটি ইষৎ পরিবর্তন করেছিলেন, যার বর্তমান রূপ বিশ্বভারতীকৃত গীতবিতানে রয়েছে। বর্তমান রূপটি এইরূপ-

'কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছল ভরে।
ওগো, ঘরে ফিরে-চলো কনক কলসে জল ভরে।
কেন জলে ঢেউ তুলি ছলকি ছলকি কর খেলা।
কেন চাহ খনে খনে চকিত নয়নে কার তরে কত ছল ভরে।
হেরো যমুনা বেলায় আলসে হেলায় গেল বেলা,
যত হাসিভরা ঢেউ করে কানাকানি কলস্বরে কত ছলভরে।
হেরো নদী পরপারে গগন কিনারে মেঘমেলা;
তারা হাসিয়া চাহিছে তোমারি মুখ পরে কত ছল ভরে।

রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গে নদী ও নারীকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন এই গানটি যেন ঠিক তারই প্রতিছবি।

“হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে” তালিকার এই ৩য় গানটির পূর্বরূপ ছিল “হেরি নবীন ঘন নীল গগনে।” কবি এই গানটিতে ঘন নীল আকাশে একটি বিরহকাতর মুখ কল্পনা করেছেন। আলোচ্য দুটি গানেই প্রকৃতির সঙ্গে নারীকে মিশিয়ে গানের বিষয়বস্তু তৈরী করেছেন।

‘বন্ধু কিসের তরে অশ্রু ঝরে’ গানটির স্বরলিপি পাওয়া যায় না। কিন্তু সুরের মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীত কোষ বইটিতে এর উল্লেখ করে বলেছেন- এটি বিভাস রাগে একতালে রচিত হয়েছিল। ‘গানটি প্রাথমিক রূপে মোট ছয়কলির গানরূপে নিবন্ধ, পরবর্তী কালে গানটিতে আরো দশকলি যুক্ত হয়ে মুদ্রিত দেখি। বাকি দশকলি ‘কল্পনা’ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের কালে যুক্ত হয়েছে।’[৭]

কীর্তনের সুরে রচিত তালিকায় ৮ম গান ‘ভালবেসে সখী নিভৃত যতনে’ এর বর্তমান রূপ। প্রথমদিকে কবি লিখেছিলেন ‘ভালবেসে সখী কোমল যতনে’। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, এই সময়কার বেশীর ভাগ গানেই বাণীর রূপান্তর ঘটেছে, এবং প্রায় প্রতিটি গানেই কবি প্রেমকে প্রকৃতির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এরপর কবি বেশ অনেক দিন কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। এসময়ই রচিত হয় নৈবেদ্য, কথা ও কাহিনী, কনিকা, ক্ষণিকা, কল্পনা, বেশ কিছু ছোটগল্প এবং প্রবন্ধ, চোখের বালি, চিরকুমার সভা ইত্যাদি। কিন্তু ১৮৯৮ সাল (১৩০৫ বাং) থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত কবি এতোকিছু রচনা করলেও গান রচনা বিশেষ দেখা যায় না।

১৯১৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময কবি জনসাধারনকে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রচুর গান রচনা করেছিলেন। এই গানগুলো সেই সময় খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কবি ঐ গানগুলোকে বাংলার লোকজ সুর এবং লোক সঙ্গীতের মত সহজবানী ব্যবহার করেছিলেন। এমনকি কিছু গান মূল গান থেকে ভেঙ্গেও রচনা করেছিলেন। সেই সময়ে দেশাত্মবোধক গানগুলো এতোটা জনপ্রিয় হয়েছিল তার কারন বাংলা ভাষাভাষিরা এর মধ্যে তাদের প্রাণের টান খুজেঁ পেয়েছিল। গানগুলি শুধু সেই সময়েই নয় একশ বছর পর এই একবিংশ শতাব্দীতেও সমান জনপ্রিয়। কিন্তু উল্লেখ্য এই যে, গানগুলির কোনটাই পূর্ববঙ্গে রচিত নয় বলে এই সময়কার গানগুলি আমাদের আলোচনার মধ্যে আসছে না।

১৯০৬ সাল থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত কবি পল্লী পূনর্গঠন চিন্তায় ব্যাপৃত ছিলেন এবং এই লক্ষ্যে কাজও করে চলেছিলেন। এছাড়া কবি বোলপুরের ব্রাহ্ম বিদ্যালয় নিয়েও ব্যস্ত ছিলেন। এরমধ্যে তাঁর তৃতীয় কন্যা মীরা দেবীর বিবাহ হয়। পরিবারে সুখের রেশ কাটতে না কাটতেই তাঁর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। এসময় মৃত্যু শোক কাটাতে কবি বেশ কিছুদিন শিলাইদহে ছিলেন। তখন ‘গোরা’ উপন্যাস লেখার কাজ চলছিল।

১৩১৬ সালের (১৯০৯) আশ্বিন মাসে শিলাইদহে বসে কবি গীতাঞ্জলীর ৩টি গান রচনা করেন। গানের রচনা কাল হিসেবে তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ৪৮ বছর। গান ৩টি হলঃ

১) গায়ে আমার পুলক লাগে- পূজা/ ৩১৮। কাফি- খাম্বাজ/ কাহারবা, স্বরবিতান-৩৮, বয়স-৪৮। ২৫ আশ্বিন ১৩১৬ শিলাইদহ। গীতাঞ্জলী-৪২। স্বরলিপিতে উল্লিখিত রাগ সিন্ধু খাম্বাজ/ ঢিমা ত্রিতাল। স্বরলিপি সঙ্গীত প্রকাশিকা চৈত্র ১৩১৬ (২) গীতলিপি-১ (৩) সঙ্গীত গীতাঞ্জলী ১৯২৭। স্বরলিপিকারঃ (১+২) সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (৩) ভীমরাও শাস্ত্রী।

২) প্রভূ আজি তোমায় দক্ষিণ- পূজা/ ৩৬৪। কীর্তন/ কাহারবা, স্বরবিতান-৩৭, বয়স ৪৮, ২৭ আশ্বিন ১৩১৬ শিলাইদহ। গীতাঞ্জলী-৪৩। গান ১৯০৯ (ব্রহ্ম) ৩৬৬। বঙ্গদর্শন কার্তিক ১৩১৬। ১৩১৭ সালের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী চৈত্র ১৮৩২ সক। স্বরলিপি- (১) গীতলিপি ২, (২) সঙ্গীত গীতাঞ্জলী ১৯২৭। স্বরলিপিকারঃ (১) সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (২) ভীমরা ও শাস্ত্রী।

৩) জগতে আনন্দ যজ্ঞে- পূজা/ ৩১৭। সরফর্দা- বিলাওল/ একতাল, স্বরবিতান-৩৭, বয়স-৪৮। ৩০ আশ্বিন ১৩১৬ শিলাইদহ। গীতাঞ্জলী ৪৪ সংখ্যক। ১৩১৭ সালের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩২ শক চৈত্র (১৩১৬) পৃঃ ১৯৪। স্বরলিপি- (১) গীতলিপি ৫ ভাগ (২) সঙ্গীত গীতাঞ্জলী-১৯২৭। স্বরলিপিকারঃ (১) সুন্দ্রেনাথ বন্দোপাধ্যায়, (২) ভীমরাও শাস্ত্রী।

গীতাঞ্জলীর জন্য রচিত এই গান তিনটিই পূজা পর্যায়ের অন্তর্গত। প্রথম গানটি কাফি ও খাম্বাজ রাগের মিশ্রণে রচিত কাহারবা তালে নিবদ্ধ। কিন্তু স্বরলিপিতে লেখা হয়েছে টিমা ত্রিতালে এবং সিন্ধু ও খাম্বাজের সমন্বয়ে রচিত। এখানে সুরেণ মুখোপাধ্যায় একটি দ্বন্দ্ব রেখে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় গানটি কীর্তনের সুরে রচিত এবং কাহারবা তালে নিবদ্ধ। বাংলার কীর্তনে সাধারণত সহজ ছন্দের তাল ব্যবহৃত হয়। এখানে কবিও সহজ তাল ব্যবহার করেছেন। শুধুমাত্র কীর্তনের সুর ছাড়া গানটি আখড়হীন এবং বাণীতে পূর্ববঙ্গের প্রভাব মুক্ত। তৃতীয় গান 'জগতে আনন্দ যজ্ঞে' একতালে রচিত হয়েছে। এই গানটিতেও দুটি রাগের মিশ্রণ দেখা যায় বিলাবল ও সরকর্দা। গানটিতে পূর্ববাংলার প্রকৃতি বা মানুষের কোন ছোঁয়া, সুর ও বাণীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে গানের ভাবের যে একাকীত্ব ও ঔদাস্য তার মধ্যে কবির পূর্ববঙ্গ প্রিয়তা প্রকাশ পেয়েছে।

পরের বছর ১৩১৭ সালের (১৯১০) আষাঢ় মাসে কবি পুত্র রথীন্দ্রনাথকে নিয়ে শিলাইদহে আসেন। আশেপাশের এলাকায় নৌকা নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে তিনি গীতাঞ্জলীর ১১টি গান রচনা করেন। সম্ভবত ২৫ আষাঢ় থেকে ২৯ আষাঢ়ের মধ্যে এই গানগুলো রচিত হয়।

১) কে বলে সর ফেলে যাবি- (অজ্ঞাত)

২) নদী পারের এই আষাঢ়ের প্রভাত খানি- পূজা/ ২৬২। মিশ্র রামকেলী/ দাদরা, স্বরবিতান-১১, বয়স-৪৯। ২৫ আষাঢ় ১৩১৭ শিলাইদহে। গীতাঞ্জলি ১১৩ সংখ্যক গান। পাঠভেদ আছে। স্বরলিপি সঙ্গীত গীতাঞ্জলি ১৯২৭। স্বরলিপিকার ভীমরাও শাস্ত্রী।

৩) মরণ যেদিন দিনের শেষে- (অজ্ঞাত)

৪) দয়া করে ইচ্ছে করে আপনি ছোট হয়ে-(অজ্ঞাত)

৫) ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা-(অজ্ঞাত)

৬) যাত্রী আমি ওরে- পূজা ও প্রার্থনা/৭২। লোকজ সুর/ দাদরা, স্বরবিতান-৩৩, বয়স-৪৯। ২৬ আষাঢ় ১৩২৭ গোরাই নদী। গীতাঞ্জলী ১১৭ সংখ্যক। পাঠভেদ আছে। কাব্যগীতি ১৩২৬ স্বরলিপি কাব্যগীতি স্বরবিতান-৩৩ পৌষ ১৩২৬। স্বরলিপিকাঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৭) উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে- পূজা/ ১৮৩। ভৈরবী-ভৈরব/ কাহারবা বিকল্পে টোড়ী-ভৈরবী, স্বরবিতান-৩৭, বয়স-৪৯। ২৬ আষাঢ় ১৩১৭। গীতাঞ্জলি ১১৮ সংখ্যক। কলকাতার মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা চৈত্র ১৮৩১ শক। স্বরলিপি (১) স্বরলিপি গীতলিপি (৬ ভাগ) (২) সঙ্গীত গীতাঞ্জলী ১৯২৭। স্বরলিপিকারঃ (১) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (২) ভীমরাও শাস্ত্রী।

৮) ভজন পূজন সাধণ আরাধন-(অজ্ঞাত)

৯) সীমার মঝে অসীম তুমি- পূজা/ ৬৫। ছায়ানট/একতাল, স্বরবিতান-৩৭, বয়স-৪৯। ২৭ আষাঢ় ১৩১৭ গোরাই-জানিপুর। গীতাঞ্জলি ১২০। বঙ্গদর্শণ মাঘ ১৩১৭। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮১২ শক চৈত্র (১৩১৭)। স্বরলিপি গীতলিপি-৪/ সঙ্গীত গীতাঞ্জলি ১৯২৭, স্বরলিপিকারঃ (১) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (২) ভীমরাও শাস্ত্রী।

১০) তাই তোমার আনন্দ আমার পর- পূজা/২৯৪। দেশ/ দাদরা, স্বরবিতান-৩৭, বয়স ৪৯। ২৮ আষাঢ় ১৩১৭, জানিপুর গোরাই। গীতাঞ্জলি ১২১। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩২ শক চৈত্র (১৩১৭) পৃঃ ২০৪। স্বরলিপিতে উল্লিখিত রাগ জয়জয়ন্তী (মিশ্র)। স্বরলিপি-(১) গীতিলিপি ৪র্থ ভাগ ১৯১০-১৯১৮, (২) সঙ্গীত গীতাঞ্জলি ১৯২৭/ স্বরলিপিকারঃ (১) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (২) ভীমরাও শাস্ত্রী।

১১) মনের আসন আমার শয়ন

তালিকায় উল্লেখিত ১১টি গানের মধ্যে (১,৩,৪,৫,৮ ও ১১ সংখ্যক) ছয়টি গানই গীতবিতানে পাওয়া যায় না। বাকী পাঁচটি গানের সবগুলোই পূজা পর্যায়ের অন্তর্গত। 'উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী' কাহারবা তাল এবং 'সীমার মাঝে অসীম তুমি' একতাল- এই গানদুটি ছাড়া বাকী তিনটি গান দাদরা তালে রচিত হয়েছে। ভৈরব, ভৈরবী, ছায়ানট প্রভৃতি রাগের ব্যবহার পূর্বে রচিত গানগুলিতেও দেখাযায়, এবার গানে নতুন ভাবে যুক্ত হয়েছে রামকেলী ও দেশ। তালিকার দুটি গান 'নদী পারের এই আষাঢ়ের' ও 'যাত্রী আমি

ওরে' গান দুটির পাঠান্তর রয়েছে। এই পাঁচটি গানের মধ্যে শুধু একটি গানে (৬ সংখ্যক) আমরা লোক সুরের ছোঁয়া পাই। এ গানগুলো কবির ৪৯ বছর বয়সে রচনা।

১৩১৭ সালেই (১৯১০) তিন মাস পর আশ্বিন মাসের শেষের দিকে শিলাইদহে অবস্থান কালে 'রাজা' নাটক রচিত হয়। এই নাটকের ২৫টি গানও শিলাইদহেই রচিত। গানগুলো হলঃ

১) খোল খোল দ্বার- প্রেম/১১৪। ইমন-কল্যাণ/ কাহারবা, স্বরবিতান-৪২, বয়স-৪৯। রাজা পৌষ ১৩১৭। অরূপরতন (১৩৪২) সং) সুরঙ্গমার গান। পাঠান্তর আছে। হিন্দুস্থান রেকর্ড থেকে রবীন্দ্রমোহন বসু গানটি প্রথম রেকর্ড করেন। রেকর্ড নং এইচ-২৫০। স্বরলিপি সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা অগ্রহায়ন ১৩৪০। স্বরলিপিকার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২) কোথা বাইরে দূরে- প্রেম/৩২৭। খাম্বাজ/ ঝম্পক (৩/২ ছন্দ), স্বরবিতান-৪২, বয়স-৪৯। রাজা (পৌষ ১৩১৭) নাটকে সুরঙ্গমার গান অরুপরতনের ১৩১৬ এবং ১৩৪২ উভয় সংস্করণেই গানটি উল্লিখিত। সাপমোচন পৌষ ১৩৩৮। এইচএমভি থেকে কনক দাশ গানটি রেকর্ড করেন। রেকর্ড নং পি ১১৭১১। স্বরলিপি বিশ্ব-ভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৫৭। স্বরলিপিকার অনাদিকুমার দস্তিদার।

৩) আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে- প্রকৃতি/ ১৯০। বাহার/ কাহারবা, স্বরবিতান-৩৮, বয়স-৪৮, ২৬ চৈত্র ১৩১৬ বোলপুর। গীতাঞ্জলী-৫৫ সংখ্যক। ইংরেজী অনুবাদক ক্ষিতীশ রায় Spring stands at your door today. Anthology Vol-1 স্বরলিপি গীতলেখা ২য় ভাগ ১৩২৫। স্বরলিপিকারঃ

৪) পুষ্প ফোটে কোন কুঞ্জবনে- প্রকৃতি/ ২৭৩। পিলু-বাঁরোয়া/ ঝাঁপতাল, স্বরবিতান-৩৬, বয়স-৪৮। ১৯০৯(ব্রহ্ম) ৩৭৩। রাজা পৌষ ১৩১৭। পাঠভেদ আছে। স্বরলিপি (১) সঙ্গীত প্রকাশিকা চৈত্র ১৩১৬ এবং (২) গীতিলিপি-১। স্বরলিপিকারঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫) যেখানে রূপের প্রভা নয়ন লোভা- নাট্যগীতি/ ৯২ সুর- অজ্ঞাত, বয়স-৪৯। রাজা নাটকে ৩য় নাগরিকের গান। ২য় সংস্করণে নাটকে গানটি বর্জিত হয়। 'রাজা' ১৩১৭ পৌষ মাসে প্রকাশিত। গানটির স্বরলিপি নেই।

৬) আমরা সবাই রাজা- স্বদেশ/ ১০। ইমন-ভূপালী/ দাদরা, স্বরবিতান, ৪২, বযস-৪১। রাজা, পৌষ ১৩১৭, ঠাকুরদার গান, অরূপরতনের উভয় সংস্করণেই গানটি আছে। স্বরলিপি পান্ডুলিপি। আশ্বিন ১৩৬২। স্বরবিতান ৪২। স্বরলিপিকারঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

৭) আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে- পূজা/ ৫৪৯। লোকজ সুর/ দাদরা, স্বরবিতান-৪২, বয়স-৪৯,রাজা পৌষ ১৩১৭, বাউল দলের গান। অরূপরতনের উভয় সংস্করনেই গানটি আছে। স্বরলিপি পান্ডুলিপি। স্বরবিতান-৪২। আশ্বিন ১৩৬২। স্বরলিপিকারঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

৮) তোরা যে যা বলিস্ ভাই- প্রেম/ ১৮৪। বেহাগ-দাদরা/ স্বরবিতান-৫৬, বয়স-৪৯। রাজা নাটকে পাগলের গান। 'রাজা', পৌষ ১৩১৭। শিলাইদহ। স্বরলিপি জীবনময় রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। স্বরলিপিকারঃ প্রফুল্লকুমার দাস।

৯) আজি কমলমুকুল দল- প্রকৃতি/২৭২। বাহার/ ত্রিতাল, স্বরবিতান-৩৬, বয়স-৪৯। রাজা, পৌষ ১৩১৭, ঠাকুরদার গান। মূলগান-মনকী কমল দল-মিশ্রবাহার/ ত্রিতাল-সঙ্গীত প্রকাশিকা ফাল্গুন ১৩১৪। স্বরলিপি গীতলিপি ৫ম ভাগঃ স্বরলিপিকার। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০) মোদের কিছু নাইরে নাই- বিচিত্র/ ১২১। লোকজ সুর/ দাদরা, স্বরবিতান-৪২, বয়স-৪৯। রাজা নাটকে সকলের গান। রাজা পৌষ ১৩১৭ ভারতীতে প্রকাশিত এবং ১৩১৭ মাঘ মাসে প্রবাসীতে সমালোচনা প্রকাশিত হয়। শিলাইদহ। অরূপরতন মাঘ ১৩২৬ গান। স্বরলিপি-পান্ডুলিপি, স্বরবিতান-৪২, আশ্বিন-১৩৬২। স্বরলিপিকারঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

১১) মম চিত্তে নিতি নৃত্যে- বিচিত্র/৬। কাফি/ ষষ্ঠী, স্বরবিতান-৪২, বয়স-৪৯। স্বরলিপিতে উল্লিখিত তাল কাশ্মীরী খেমটা। রাজা পৌষ ১৩১৭। নাচের দলের নৃত্য ও গীত। অরূপরতনের উভয় সংস্করনেই গানটি আছে। শ্রাবণ গাথা শ্রাবণ ১৩৪১। কলম্বিয়া রেকর্ড থেকে শীলা সরকার গানটি প্রথম রেকর্ড করেন। রেকর্ড নং এন ২৭০৮৩। স্বরলিপি অরূপরতন- স্বরবিতান-৪২, আশ্বিন ১৩৬২ গীতলিপি-৫ম খন্ড। স্বরলিপিকারঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১২) বসন্তে কি শুধু কেবল- প্রকৃতি/ ২০৩। লোকজ সারি সুর-কাহারবা/ বাহার- তেওড়া, স্বরবিতান-৪২, বয়স-৪৯। রাজা নাটকে ঠাকুরদার গান। রাজা পৌষ ১৩১৭। অরূপরতন মাঘ ১৩২৬। শিলাইদহ। সুরান্তর এবং তালান্তর আছে। স্বরলিপি পান্ডুলিপি আশ্বিন ১৩৬২। স্বরলিপিকারঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

১৩) বিরহ মধুর হলো আজি- প্রেম/২৬২। বেহাগ/ কাওয়ালি, স্বরবিতান-৩৬, বয়স-৪৯। রাজা, পৌষ ১৩১৭, বালকগনের গান। ১৩১৭ সালের পৌষসংখ্যা ভারতীতে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ৭ পৌষের মধ্যে প্রকাশিত। রচনা শিলাইদহ। স্বরলিপি- (১) সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৭ চৈত্র এবং গীতলিপি-৫। স্বরলিপিকারঃ (১+২) সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।

১৪) যা ছিল কালো ধলো- প্রেম/৮৭। লোকশ্রয়ী সুর/ দাদরা, স্বরবিতান-৪২, বয়স-৪৯। রাজা নাটক পৌষ ১৩১৭। বাউলের দলের গান। অরূপরতনের উভয় সংস্করণেই গানটির উল্লেখ আছে। রাজা পৌষ ১৩১৭। গান রচনা শিলাইদহ। পান্ডুলিপি, স্বরলিপি-পান্ডুলিপি। স্বরবিতান-৪২, আশ্বিন ১৩৬২। স্বরলিপিকারঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

১৫) আহা তোমার সঙ্গে- প্রেম/৮৮। পিলু/ তালছাড়া গেয়গান, স্বরবিতান-৪২, বয়স-৪৯। 'রাজা' নাটক পৌষ ১৩১৭। ঠাকুরদার গান। অরূপরতনের উভয় সংস্করণেই গানটি আছে। স্বরলিপি-পান্ডুলিপি আশ্বিন ১৩৬২। স্বরলিপিকারঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

১৬) আমার সকল নিয়ে বসে আছি- প্রেম/৮৯। খাম্বাজ/ দাদরা, স্বরবিতান-৪২, বয়স-৪৯। রাজা পৌষ ১৩১৭ ঠাকুরদার গান। অরূপরতনের উভয় সংস্করণেই গানটি আছে। স্বরলিপি-পান্ডুলিপি স্বরবিতান-৪২, আশ্বিন ১৩৬২। স্বরলিপিকারঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

১৭) আমার ঘুর লেগেছে-তাধিন তাধিন- বিচিত্র/ ৭, সুর- অজ্ঞাত, বয়স-৪৯। রাজা, পৌষ ১৩১৭, ঠাকুরদার গান।

১৮) আজি দক্ষিণ দুয়ার খোলা- প্রকৃতি/২০২।

বাহার(কীর্তন)/ কাহরবা, স্বরবিতান-৪২, বয়স-৪৯। রাজা পৌষ ১৩১৭। ঠাকুরদার গান। অরূপরতনের উভয় সংস্করনে গানটি আছে। শাপমোচন চৈত্র ১৩৩৯। গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে হরেন্দ্রনাথ দত্তের কণ্ঠে গানটি প্রথম রেকর্ড করা হয়। রেকর্ড নং পি ৬৪৯২। কলম্বিয়া রেকর্ড থেকে মাধুরী দে (বিশ্বাস) কণ্ঠে ও গানটি রেকর্ড করা হয়। রেকর্ড নং এন ৭৩৬৬। স্বরলিপি সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রকাশিকা পৌষ-১৩১৪। স্বরলিপিকারঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯) আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না- প্রেম/ ৯০। কীর্তন টপ্পা, স্বরবিতান-৪২, বয়স-৪৯। রাজা, পৌষ ১৩১৭, রাজার গান। অরূপরতনের উভয় সংস্করণেই গানটি আছে। শিলাইদহ। পাঠভেদ আছে। স্বরলিপি- পান্ডুলিপি, স্বরবিতান-৪২, আশ্বিন ১৩৬২। স্বরলিপিকারঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার।

২০) ভয়েরে মোর আঘাত করো- পূজা/ ২২১। সুর-অজ্ঞাত, বয়স-৪৯। রাজা নাটকে সুরঙ্গমার গান। ১৩১৭ সালের পৌষ সংখ্যা 'ভারতী'র বিজ্ঞাপনে প্রকাশ 'রাজা' ৭ পৌষের মধ্যে প্রকাশিত হইবে। ১৩১৭ সালের মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে রাজার সমালোচনা প্রকাশিত হয়। গানগুলি শিলাইদহে রচিত। স্বরলিপি নেই।

২১) আমি তোমার প্রেমে হবো- প্রেম/৯১। ভৈরবী/ দাদরা, স্বরবিতান-৬২, বয়স-৪৯। রাজা, পৌষ ১৩১৭ সুরঙ্গমার গান। রচনা শিলাইদহ। স্বরলিপি প্রবাসী আশ্বিন ১৩৩২। স্বরলিপিকারঃ সাহানা দেবী।

২২) এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল- পূজা/৯৩। সুর-অজ্ঞাত, বয়স-৪৯। রচনা-১৩১৭, পৌষ। রাজা নাটকে সুদর্শনার গান, শিলাইদহ। স্বরলিপি নেই।

২৩) এ যে মোহ আবরণ- পূজা/ ১৬২। সুর অজ্ঞাত, বয়স-৪৯। পৌষ ১৩১৭। রাজা নাটকে সুরঙ্গমার গান। গানটি শিলাইদহে রচিত বলে অনুমান।

২৪) অন্ধকারের মাঝে আমায়- পূজা/৮৪। সুর অজ্ঞাত, স্বরলিপি নেই, বয়স-৪৯। রাজা, পৌষ ১৩১৭ সুরঙ্গমার গান। এই গানের আর একটি পাঠ ১৩৪৪ সালের শারদীয়া যুগান্তরে প্রকাশিত হয়।

২৫) ভোর হলো বিভাবরী- পূজা/ ২৭০। রামকেলী/ কাহারবা, স্বরবিতান-৪২, বয়স-৪৯। রাজা নাটকে সুরঙ্গমার গান। রাজা ১৩১৭ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত ও মাঘ মাসে প্রবাসীতে সমালোচনা প্রকাশিত হয়। গান রচনাস্থল শিলাইদহ। পান্ডুলিপি। স্বরলিপি-পান্ডুলিপি স্বরবিতান-৪২, আশ্বিন ১৩৬২। স্বরলিপিকারঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

তালিকার প্রথম গান 'খোল খোল দ্বার' রচিত হয়েছিল কবির ৪২ বছর বয়সে। আলোচ্য সময়ে কবি বাণীর কিছুটা পরিবর্তন করে গানটির রূপান্তর ঘটান। 'পুষ্প ফোটে কুঞ্জবনে' (৪ সংখ্যক) গানটিও আলোচ্যকালে পাঠান্তর হয়েছে গানটি কবি রচনা করেছিলেন তাঁর ৪৮ বছর বয়সে। লোকসুরে রচিত একটি গানেও পাঠান্তর দেখা যায়- 'আমি রূপে তোমায় ভোলাবনা' গানটি টপ্পার আঙ্গিকে কীর্তনের সুরে রচিত। গানটি বৈতালিক গাওয়া হয়। বৈতালিক আরও একটি গান তালিকায় রয়েছে- 'আহা তোমার সঙ্গে প্রানের খেলা'। প্রেম পর্যায়ের এই গানটি 'পিলু' রাগে রচিত।

পিলু রাগের সাথে বারোয়া রাগের মিশ্রনে 'পুষ্প ফোটে কুঞ্জবনে' গানটি ঝাঁপতালে রচিত। দুই রাগের মিশ্রণে আরও দুটি গান রেয়েছে 'খোলা খোলো দ্বার' ইমন-কল্যান এবং 'আমার সবাই রাজা' ইমন-ভূপালী। এছাড়া এর আগের গানগুলির মত এই গানগুলোতেও খাম্বাজ, বাহার, বেহাগ, কাফি, ভৈরবী রামকেলী প্রভৃতি রাগ কবি ব্যবহার করেছেন।

তাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই গানগুলোতেও দাদরাও আধিক্য রয়েছে- ২৫টি গানের মধ্যে ৭টি গানই (৬,৭,৮,১০,১৪,১৬,২১ সংখ্যক) দাদরা তালে রচিত। এছাড়া কাহাররা, ত্রিতাল, ঝাঁপতাল ও কাওয়ালী প্রভৃতি তালের ব্যবহার অন্যান্য বারের মতো এবারেও দেখা যায়। তবে এবারে কবি নতুন দুটি তালের প্রয়োগ করেছেন ষষ্ঠী (মম চিত্তে নিতি নৃত্যে) এবং ঝম্পক (কোথা বাইরে দূরে)। বৈতালিক গানটি (১৯ সংখ্যক) ছাড়া লোকজ সুরের গানগুলিতে কবি দাদরা ও কাহারবার সহজ ছন্দই গ্রহন করেছেন।

এ পর্বে ছয়টি গান লোকসুরে রচিত হয়েছে। বিশেষত রাজা নাটকের দলীয় এবং বাউল দলের গানে কবি লোকসুর ব্যবহার করেছেন। যেমন- 'আমার প্রাণের মানুষ' 'যা ছিল কালো ধলো', বাউল দলের গান আর নাটকে সকলের গান 'মোদের কিছু নাইরে'। সারি সুরের 'বসন্তে কি শুধু কেবল' গানটি কবি 'ঠাকুরদার' গলায় দিয়েছেন।

রাজা নাটকের ৫, ১৭, ২০, ২৩, ২৪ সংখ্যক গানগুলির স্বরলিপি পাওয়া যায়নি বিধায় বর্তমানে এর সুরগুলো হারিয়ে গেছে।

পরের বছর ১৩১৮ সালের বৈশাখের শেষে কবি শিলাইদহে যান এবং আষাঢ় মাসে প্রথম দিক পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। এক মাসেরও কিছু বেশী সময়ে কবি 'অচলায়তন' নাটকটি রচনা করেন। এই সাথে রচিত হয় নাটকের ২৩টি গান-

১) তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে- পূজা/১৬১। পিলু-ভীমপলশ্রী/ দাদরা, স্বরবিতান-৫২, বয়স-৫০। অচলায়তন নাটকে পঞ্চকের গান। ১৩১৮ সালের আষাঢ় মাসে শিলাইদহে গানটি রচিত। গুরু ফাল্গুন ১৩২৪। স্বরলিপি ভারতী আষাঢ় ১৩২৪। স্বরলিপিকারঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২) দূরে কোথায় দূরে দূরে- পূজা/ ৪৪০। ভৈরবী/ আড়াঠেকা, স্বরবিতান-৫২, বয়স-৫০ ঢালাভাবে গেয় গান। অচলায়তন নাটকে পঞ্চকের গান। গানটি ১৩১৮ সালের ১ আষাঢ় থেকে ১৫ আষাঢ়ের মধ্যে শিলাইদহে রচিত। রেকর্ডে উল্লিখিত রাস মিশ্র মূলতান। গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে জিতেন্দ্রনাথ দাস গানটি রেকর্ড করেছিলেন। রেকর্ড নং পি ৫৯৬৯। স্বরলিপি- পান্ডুলিপি, স্বরবিতান-৫২, জ্যৈষ্ঠ- ১৩৬৪। স্বরলিপিকারঃ সুধীরচন্দ্র কর।

৩) এ পথ গেছে কোন খানে- পূজা/৩৮৯। পিলু/ দাদরা, স্বরবিতান-৫২, বয়স-৫০। অচলায়তন নাটকে পঞ্চকের গান। ১৩১৮ সালের ১ থেকে ১৫ আষাঢ়ের মধ্যে গানগুলি রচিত। রচনাস্থল- শিলাইদহ। স্বরলিপি- পান্ডুলিপি জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪। স্বরলিপিকারঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

৪) আমরা চাষকরি আনন্দে- বিচিত্র/ ১৩০। লোকজ সুর/ দাদরা, স্বরবিতান-৫২, বয়স-৫০, অচলায়তন নাটকের প্রথম শোনপাংশুর গান। ১৩১৮ সালের ১লা আষাঢ় থেকে ১৫ই আষাঢ় এর গানগুলি শিলাইদহে রচিত। গুরু ফাল্গুন ১৩২৪ স্বরলিপি-পান্ডুলিপি, স্বরবিতান-৫২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪। স্বরলিপিকারঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

৫) কঠিক লোহা পাষাণ ঘুমে-বিচিত্র/১২৯। লোকজ সুর/ দাদরা। স্বরবিতান-৫২, বয়স-৫০। অচলায়তন নাটকের তৃতীয় শোনপাংশুর গান। অচলায়তন প্রবাসী আশ্বিন ১৩১৮। রচনা শেষের তারিখ ১৫ আষাঢ় ১৩১৮ শিলাইদহ। স্বরলিপি- পাণ্ডুলিপি জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪। স্বরলিপিকারঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

৬) সব কাজে হাত লাগাই মোরা- বিচিত্র/১২৮। পিলু/ দাদরা, স্বরবিতান-৫২, বয়স-৫০। অচলায়তন নাটকে শোনপাংশুর গান। ১৩১৮ সালের ১ আষাঢ় থেকে ১৫ আষাঢ়ের মধ্যে গানগুলি শিলাইদহে রচিত। পাণ্ডুলিপি- স্বরলিপি, পাণ্ডুলিপি স্বরবিতান-৫২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪। স্বরলিপিকারঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

৭) ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে- প্রেম/৩২৬। কালাংড়া/ দাদরা স্বরবিতান-১২, বয়স-৫০। আষাঢ় ১৩১৮, অচলায়তন নাটকে পঞ্চকের গান। তাসের দেশ ১৩৪০ চতুর্থ দৃশ্য হরতনীর গান। ১ম অভিনয় ম্যাডান থিয়েটার ২৭-২৮ ও ৩০ ভাদ্র। হিন্দুস্থান রেকর্ড থেকে কণিকা মুখোপাধ্যায় (মোহর) গানটি রেকর্ড করেন। রেকর্ড নং এইচ ৭৫৪ "স্বরলিপি তাসের দেশ ভাদ্র ১৩৫৭। স্বরলিপিকারঃ শান্তিদেব ঘোষ।

৮) এই একলা মোদের হাজার মানুষ- নাট্যগীতি/ ৯৩। লোকজ সুর/ দাদরা, স্বরবিতান-৫২, বয়স-৫০। অচলায়তন নাটকে পঞ্চকের গান। ১৩১৮ সালের ১-১৫ আষাঢ়ের মধ্যে গানটি রচিত। শিলাইদহ। প্রবাসী আশ্বিন ১৩১৮। স্বরলিপি- পাণ্ডুলিপি-পাণ্ডুলিপি জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪ স্বরলিপিকারঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

৯) যা হবার তা হবে- পূজা/ ৮৩। খাম্বাজ/ যৎ (৮ মাত্রা), স্বরবিতান-৫২, বয়স-৫০। অচলায়তন নাটকে দাদাঠাকুরের গান। ১-১৫ আষাঢ় ১৩১৮ শিলাইদহ। খাম্বাজ-টপ্পা। পাণ্ডুলিপি-স্বরলিপি পাণ্ডুলিপি স্বরবিতান-৫২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪। স্বরলিপিকারঃ সুধীরচন্দ্র কর।

১০) আমি কারে ডাকি গো- পূজা/ ১৭১। সুর-অজ্ঞাত, বয়স-৫০। অচলায়তন নাটকে পঞ্চকের গান। ১-১৫ আষাঢ় ১৩১৮ শিলাইদহ।

১১) বুঝি এল বুঝি এল ওরে প্রাণ- প্রেম ও প্রকৃতি/ ৬১। ইমন/ কাহারবা, স্বরবিতান-১১, বয়স-৫০। অচলায়তন নাটকে দাদাঠাকুরের গান। ১৩১৮ সালের আষাঢ় মাসে গানটি রচিত শিলাইদহে। স্বরলিপি কেতকী শ্রাবণ ১৩২৬ স্বরবিতান-১১। স্বরলিপিকারঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১২) আজ যেমন করে গাইছে আকাশ- প্রেম/ ৩৭৪। কীর্তন, স্বরবিতান-৫২, বয়স-৫০। অচলায়তন নাটকের গান। ১৩১৮ সালের ১লা থেকে ১৫ই আষাঢ়ের মধ্যে গানটি রচিত। পঞ্চকের কণ্ঠে গেয়। গানটি তালবিহীন ভাবে গেয়। স্বরলিপি-পাণ্ডুলিপি। স্বরবিতান-৫২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪। স্বরলিপিকারঃ সুধীরচন্দ্র কর।

১৩) হারে রেরে- বিচিত্র/৪৮। ইমন-ভূপালী/ একতাল, স্বরবিতান-১১, বয়স-৫০। অচলায়তন নাটকে পঞ্চকের গান। ১৫ই আষাঢ় ১৩১৮ শিলাইদহ। তাসের দেশ ১৩৪০ ভাদ্রতেও গানটির উল্লেখ আছে। স্বরলিপি কেতকী শ্রাবণ ১৩২৬, স্বরবিতান-১১। স্বরলিপিকারঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৪) ওরে ওরে আমার মন মেতেছে- বিচিত্র/৪৭। পিলু/ দাদরা, স্বরবিতান-৫২, বয়স-৫০। অচলায়তন নাটকে পঞ্চকের গান। ১৩১৮ সালের ১ আষাঢ় থেকে ১৫ আষাঢ়ের মধ্যে গানটি রচিত। শিলাইদহ। স্বরলিপি পাণ্ডুলিপি জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪। স্বরলিপিকারঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

১৫) এই মৌমাছির ঘর ছাড়া কে- প্রভৃতি/২৭৪। ভৈরবী-পরিবর্তিত ষড়জ/ দাদরা, স্বরবিতান-৫২, বয়স-৫০। ১-৫ আষাঢ় ১৩১৮। অচলায়তন নাটকে পঞ্চকের গান। স্বরলিপি-পাণ্ডুলিপি, স্বরবিতান-৫২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪। স্বরলিপিকারঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

১৬) ও অকুলের কূল- পূজা/৭০। ভৈরবী/ একতাল, স্বরবিতান-৫২, বয়স-৫০। অচলাতয় নাটকে পঞ্চকের গান, আষাঢ় ১৩১৮ শিলাইদহ, স্বরলিপি পাণ্ডুলিপি- জৈষ্ঠ্য ১৩৬৪। স্বরলিপিকারঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

১৭) আমরা তারেই জানি- পূজা/৮২ লোকসুরে রচিত। খাম্বাজ/ দাদরা, স্বরবিতান-৫২, বয়স-৫০। অচলায়তন নাটকের গান। দর্ভক দলের গান। পাণ্ডুলিপি। আষাঢ় ১৩১৮ শিলাইদহ। স্বরলিপি-পাণ্ডুলিপি স্বরবিতান-৫২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪। স্বরলিপিকারঃ সুধীরচন্দ্র কর।

১৮) সকল জনম ভরে- পূজা/ ১৬৩। কীর্তন/ টপ্পা, স্বরবিতান-৫২, বয়স-৫০। তালমুক্ত গান। অচলায়তন নাটকে পঞ্চকের গান। গানগুলি ১৩১৮ সালের ১-১৫ আষাঢ়ের মধ্যে শিলাইদহে রচিত বলে মনে করা হয়। পান্ডুলিপি। স্বরলিপি- পান্ডুলিপি, স্বরবিতান-৫২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪। স্বরলিপিকারঃ সুধীরচন্দ্র কর।

১৯) উতল ধারা বাদল ঝরে- প্রকৃতি/ ৬২। দেশ/ কাহারবা, স্বরবিতান-৩৬, বয়স-৫০। অচলায়তন নাটকের গান। ১৩১৮ সালের ১ থেকে ১৫ই আষাঢ়ের মধ্যে গানটি রচিত। দ্বিতীয় দর্ভকের মাদল সহযোগী গীত। স্বরলিপি ভারতী আশ্বিন ১৩১৮। স্বরলিপিকারঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০) আলো আমার আলো ওগো- বিচিত্র/ ৪৬। ইমন/ দাদরা, স্বরবিতান-৫২, বয়স-৫০। অচলায়তন নাটকে বালকদের গান। ১৩১৮ সালের ১-১৫ আষাঢ়ের মধ্যে গানগুলি শিলাইদহে রচিত স্বরলিপি সঙ্গীত গীতাঞ্জলি ১৯২৭। স্বরলিপিকার ভীমরাও শাস্ত্রী।

২১) যিনি সকল কাজের কাজী- পূজা/ ৮১। বেহাগ/ দাদরা, স্বরবিতান-৫২, বয়স-৫০। আষাঢ় ১৩১৮। শিলাইদহ। অচলায়তন নাটকে শোনপাংশুদের গান। অচলায়তনের গানগুলি ১৩১৮ সালের ১ থেকে ১৫ আষাঢ়ের মধ্যে শিলাইদহে রচিত। ধর্মসঙ্গীত পৌষ ১৯১৪। স্বরলিপি পান্ডুলিপি স্বরবিতান-৫২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪। স্বরলিপিকারঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

২২) আমি যে সব নিতে চাই- বিচিত্র/ ৪৫। পিলু/ দাদরা, স্বরবিতান-৫২, বয়স-৫০। অচলায়তন নাটকের গান, পঞ্চকের কণ্ঠে গীত। ১৩১৮ সালের ১-১৫ আষাঢ়ের মধ্যে অচলায়তনের গান রচিত। শিলাইদহ। স্বরলিপি পান্ডুলিপি জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪। স্বরলিপিকারঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

২৩) আর নহে আর নহে- পূজা/ ৩৮৩। শঙ্করা/ কাহারবা, স্বরবিতান-৫২, বয়স-৫০। ১৩১৮ আশ্বিনের মধ্যে রচিত। অচলায়তন নাটকের গান। অচলায়তন ১৩১৮ আশ্বিনের প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। পঞ্চকের কণ্ঠে গীত। অচলায়তন গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় ১৯১২ আগষ্ট মাসে। স্বরলিপি পান্ডুলিপি জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪। স্বরলিপিকার সুধীরচন্দ্র কর।

এ পর্যায়ে ২৩টি গানের মধ্যে প্রথম গানটিতে পিলু ও ভীমপলশ্রী রাগের মিশ্রণ রয়েছে। বেশ অনেক কটি গানে কবিকে পিলু রাগের ব্যবহার করতে দেখা গেছে এবং বেশীর ভাগ সময়ই এ রাগ অন্য রাগের সাথে মিশ্রিত করে কবি তাঁর গানে ব্যবহার করেছেন। আরো একটি মিশ্র রাগের গান দেখা যায়- “হারে রে রে” ইমন-ভূপালীতে। কবিকে ইমন-ভূপালীর মিশ্রণ আগেও করতে দেখা গেছে। এছাড়া অন্যান্য গানগুলোতে কবি এর আগেও যে সমস্ত রাগের ব্যবহার করেছেন সেই রাগগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এবার একটি নতুন রাগের ব্যবহার পাওয়া যায়- ‘আর নহে আর নহে’ গানটিতে কবি ‘শঙ্করা’ রাগের রূপ গ্রহন করেছেন। তালিকার ২য় গান ‘দূরে কোথায় দূরে’ সাধারণত বৈতালিকে গাওয়া হলেও সুরেন মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘রবীন্দ্রসঙ্গীত কোষ’ বইটিতে ‘আর ঠেকার’ কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি রাগরূপের বিষয়ে ভৈরবী রাগের কথা উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি এও বলেছেন যে, জিতেন্দ্রনাথ দাসের রেকর্ডে লেখা রয়েছে মিশ্র মুলতান।

বৈতালিকে এ পর্যায়ে আরও দুটি গান রয়েছে- ‘আজ যেমন করে গাইছে আকাশ’ ও ‘সকল জনম ভরে’। এই দুটি গানই আবার কীর্তনের সুরে রচিত। এই দুটো গানসহ তালিকার ৪,৫,৮ ও ১৭ সংখ্যক গান ৪টিও লোকজ সুরের ধারায় রচিত। এদের মধ্যে ‘আমরা চাষ করি আনন্দে’ গানটি পূর্ববঙ্গের প্রেক্ষাপটে রচিত।

কীর্তনাঙ্গে দুটি বৈতালিক গান ছাড়া লোকসুরে রচিত বাকী চারটি গানই দাদরা তালে নিবদ্ধ, অন্যান্য বারের মত এর বারেও দাদরা তালের আধিক্য দেখা গেছে। পাশাপাশি কাহারবা, একতাল এবং একটি নতুন তাল ‘যৎ’-এর ব্যবহার দেখা যায় ‘যা হবার তা হবে’ এই গানটিতে।

বিষয়বৈচিত্রের দিক থেকে এর আগেরবারের মত এবারেও পুজা, প্রেম ও প্রকৃতি পর্যায়ে গান বেশী দেখা যায়। তবে পাশাপাশি ‘বিচিত্র’ পর্যায়ের অন্তর্গত হয়েছে এবারের ৪,৫,৬ ও ২২ সংখ্যক ৪টি গান। এবারেও স্বরলিপি না থাকায় ‘আমি কারে ডাকি গো’ গানটির সুর অজ্ঞাত থেকে গেছে।

১৯১২ সালে কবির বিদেশ ভ্রমণের কথা ছিল। কিন্তু ভ্রমণ বাতিল হওয়ায় তিনি ২০ থেকে ২৫ মার্চের মধ্যে কোন দিনে শিলাইদহ চলে আসেন। ১৫ চৈত্র থেকে ৩০ চৈত্র কবি গীতিমাল্যের ১৮টি গান রচনা করেন। হয়তো ১৫ দিনেরও বেশী সময় কবি শিলাইদহে অবস্থান করেছেন। গানগুলো নিম্নরূপঃ-

১) স্থির নয়নে তাকিয়ে আছি (১৫ চৈত্র)- (অজ্ঞাত)

২) ভাগ্যে আমি পথ হারালাম (১৬ চৈত্র) - (অজ্ঞাত)

৩) আমি হাল ছাড়লে তবে- (১৭ চৈত্র) - (অজ্ঞাত)

৪) আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ- পূজা/ ৫৫৯। খাম্বাজ/ দাদরা, স্বরবিতান-৪১, বয়স-৫০। ১৭ চৈত্র ১৩১৮ শিলাইদহ। গীতিমাল্য-৭, তত্ত্ববোধিনী বৈশাখ ১৮৩৪ শক (১৩১৯)। পাঠভেদ আছে। স্বরলিপি গীতলেখা ৩য় ভাগ/ আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা মাঘ ১৩২২। স্বরলিপিকারঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫) কোলাহল তো বারণ হলো- পূজা/ ৩৬১। পিলু/ দাদরা, স্বরবিতান-৩৯, বয়স-৫০। ১৮ চৈত্র ১৩১৮ শিলাইদহ, গীতিমাল্য-৮ সংখ্যক তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকা ১৮৩৮ শক জৈষ্ঠ্য (১৩১৯) ছুটি। স্বরলিপি (১) গীতলেখা ১ ভাগ ১৩২৪, (২) সঙ্গীত গীতাঞ্জলি ১৯২৭। স্বরলিপিকারঃ (১) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (২) ভীমরাও শাস্ত্রী।

৬) নাম হারা এই নদীর পারে- (১৯ চৈত্র) - (অজ্ঞাত)

৭) কে গো তুমি বিদেশী (২০ চৈত্র) - (অজ্ঞাত)

৮) ওগো পথিক দিনের শেষে- (২১ চৈত্র) - (অজ্ঞাত)

৯) এই দুয়ারটি খোলা- (২২ চৈত্র) - (অজ্ঞাত)

১০) এই যে এরা আঙিনাতে- (২৩ চৈত্র) - (অজ্ঞাত)

১১) অনেক কালের যাত্রা আমার (২৪ চৈত্র) - (অজ্ঞাত)

১২) আমি তোমায় করবো বড়ো- (অজ্ঞাত)

১৩) এবার ভাসিয়ে দিতে হবে- প্রকৃতি/ ২৫৩। মিশ্র হাম্বীর/ দাদরা, স্বরবিতান-৩৯, বয়স-৫০। ২৬ চৈত্র ১৩১৮, শিলাইদহ। প্রবাসী আষাঢ় ১৩১৯, পৃঃ ৩১৭ 'অবসান', নৃত্যনাট্য পরিশোধ ১৩৪৩। গীতিমাল্য। স্বরলিপি (১) গীতলেখা-১, ১৩২৪/ সঙ্গীত গীতাঞ্জলী ১৯২৭। স্বরলিপিকারঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর/ ভীমরাও শাস্ত্রী।

১৪) যেদিন ফুটল কমল- পূজা/ ১৩৭। বাহার- পঞ্চম/ তেওড়া, স্বরবিতান-৪১, বয়স-৫০। ২৬ চৈত্র ১৩১৮ শিলাইদহ। গীতিমাল্য-১৭। প্রবাসী ভাদ্র ১৩১৯ 'বিকাশ' কবিতা। স্বরলিপি সঙ্গীত গীতাঞ্জলী ১৯২৭। স্বরলিপিকারঃ ভীমরাও শাস্ত্রী।

১৫) এখনো ঘোর ভাঙ্গে না- পূজা/২৬৮। পিলু/ দাদরা, স্বরবিতান-৩৯, বয়স-৫০। ২৭ চৈত্র ১৩১৮ শিলাইদহ। গীতিমাল্য ১৮ সংখ্যক। পাঠভেদ ও সুরভেদ আছে। স্বরলিপি (১) গীতলেখা-১/ ১৩২৪, (২) সঙ্গীত গীতাঞ্জলী ১৩২৭। স্বরলিপিকারঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (২) ভীমরাও শাস্ত্রী।

১৬) ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো- প্রেম/ ৩২৩। সুরান্তর দেশ/ হাম্বীর কাহারবা ও একতাল, স্বরবিতান-১১/৪২, বয়স-৫০। সুরান্তর আছে তালান্তর আছে। ২৮ চৈত্র ১৩১৮ শিলাইদহ, প্রবাসী শ্রাবণ ১৩১৯ পৃঃ ৩৮৯ ঝড়। অরূপরতন ১৩৪৬। গীতিমাল্য-১৯/ স্বরলিপি গীতলেখা-১, ১৩২৪/ কেতকী শ্রাবণ ১৩২৬/ স্বরলিপিকারঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৭) তুমি একটু কেবল বসতে দিও- প্রেম/ ৯৫। ভৈরবী/ দাদরা, স্বরবিতান-৩৯, বয়স-৫০। ২৯ চৈত্র ১৩১৮, শিলাইদহ। ১৩২৭ সালের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮২৪ শক ফাল্গুন (১৩২৭) পৃঃ ২৯৫। গীতিমাল্য। এইচএমভি থেকে হরেন্দ্রনাথ দত্ত গানটি প্রথম রেকর্ড করেন। রেকর্ড নং- পি ৬৪৯২১। স্বরলিপি- (১) গীতলিপি ৬, (২) গীতলেখা-১/১৩২৪। স্বরলিপিকার- (১) সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, (২) দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮) এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে- পূজা/৫৯৯। রামকেলী-কালাংড়া/ দাদরা, স্বরবিতান-৪১, বয়স-৫০। ৩০ চৈত্র ১৩২৮। শিলাইদহ। গীতিমাল্য-২১ সংখ্যক কবিতা পাঠ-এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে-তত্ত্ববোধিনী শ্রাবণ ১৮৩৪ শক (১৩১৯)। স্বরলিপি সঙ্গীত গীতাঞ্জলী ১৯২৭। স্বরলিপিকারঃ ভীমরাও শাস্ত্রী।

গীতিমাল্যের এই ১৮টি গানের মধ্যে ১,২,৩,৬,৭,৮,৯,১০,১১,১২ সংখ্যক ১০টি গানই গীতবিতান সংকলন থেকে বাদ পরেছে। বাকী ৮টি গানের মধ্যে ৬টিই দাদরা তালের গান।

প্রতিবারের মত এবারও দাদরা তালের আধিক্য দেখা যাচ্ছে ৪,৫,১৩,১৫,১৭ ও ১৮ সংখ্যক গানগুলি দাদরা তালে নিবদ্ধ। বাকী দুটি গানের মধ্যে 'যেদিন ফুটল কমল' তেওড়া তালে এবং 'ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো' গানটি কাহারবা ৪/৪ ছন্দ ও একতাল ৩/৩/৩/৩ ছন্দে রচিত। তালান্তরের পাশাপাশি গানটির সুরান্তরও করা হয়েছে।

এই তালিকায় তিনটি গানে রাগের মিশ্রণ দেখা যায় 'যেদিন ফুটল কমল' (১৪ সংখ্যক) বাহর ও পঞ্চম রাগ, 'ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো' (১৬ সংখ্যক) দেশ ও হাম্বীর এবং 'এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে' (১৮ সংখ্যক) রামকেলী ও কালাংড়া রাগে নিবদ্ধ। গানটি গীতবিতানে 'এবার' বাদ দিয়ে 'আমার যাবার বেলাতে' করা হয়েছে।

প্রতিবারের মত এবারেও কবি পিলু, ভৈরবী খাম্বাজ, বাহার ও দেশ রাগের ব্যবহার করেছেন। তবে এবারে নতুন সংযোজন হয়েছে পঞ্চম রাগ।

বিষয়বৈচিত্রের দিক থেকে পূজা পর্যায়ের গানই বেশী তবে এর পাশাপাশি প্রেম পর্যায়ের দুটি এবং প্রকৃতি পর্যায়ের একটি গান রয়েছে।

এই ১৮টি গান রচনার দুবছর পর কবি পুনরায় শিলাইদহে আসেন। এই দুবছর কবি 'নোবেল পুরস্কার' বিজয়ের কারনে ব্যস্ত ছিলেন। এ বছর ফাল্গুন মাসে শিলাইদহে বসে কবি গীতিমাল্যের জন্য ৮টি গান রচনা করেন।

১) সভায় তোমার থাকি সবার- পূজা/৮৮। কাফি/ দাদরা, স্বরবিতান-৩৯, বয়স-৫২। ১২ ফাল্গুন ১৩২০ (২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯১৪) শিলাইদহ। গীতিমাল্য-৫৬, গীতলেখা-১। স্বরলিপি গীতলেখা-১, ১৩২৪। স্বরলিপিকারঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২) যদি জানতেম আমার কিসের- প্রেম/৪৬। রামকেলী/ কাহারবা, স্বরবিতান-৩৯, বয়স-৫২। ১২ ফাল্গুন ১৩২০ (২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯১৪) শিলাইদহ। গীতিমাল্য-৫৭, পান্ডুলিপি। স্বরলিপি-পান্ডুলিপি স্বরবিতান-৩৯, ফাল্গুন-১৩৬১। স্বরলিপিকারঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

৩) বেসুর বাজেরে- পূজা/১৫৪। ভৈরবী- রামকেলী/ কাহারবা, স্বরবিতান-৩৯, বয়স-৫২। ১৪ ফাল্গুন ১৩২০ (২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯১৪) শিলাইদহ। গীতিমালা-৫৮ সংখ্যক। পাঠভেদ ও সুরভেদ আছে। স্বরলিপি গীতলেখা- ১,১৩২৪। স্বরলিপিকারঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪) তুমি জানো, ওগো অন্তর্যামী- পূজা/২৪৪। ইমন-পূরবী/ একতাল স্বরবিতান-৩৯, বয়স-৫২। ১৪ ফাল্গুন ১৩২০ (২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯১৪) শিলাইদহ। গীতিমাল্য-৫৯/ স্বরলিপি গীতলেখা-১, ১৩২৪/ স্বরলিপিকারঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫) সকল দাবী ছাড়বি যখন-(অজ্ঞাত)

৬) রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি- পূজা/২০। পিলু/ ত্রিতাল, স্বরবিতান-৪১, বয়স-৫২। ১৫ ফাল্গুন, ১৩২০ (১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯১৪) শিলাইদহ। গীতিমাল্য -৬১ (১৯১৪) প্রবাসী বৈশাখ-১৩২১। স্বরলিপি-(১) আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা আশ্বিন-কার্তিক ১৩২২,. (২) গীতলেখা-৩ (১৩২৭)। স্বরলিপিকারঃ (১+২) দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৭) মিথ্যা আমি কী সন্ধানে- (অজ্ঞাত)

৮) আমার ভাঙা পথের রাঙা- পূজা/ ৫৭৩। বেহাগ/ দাদরা, স্বরবিতান-৩৯, বয়স-৫২। ১৬ ফাল্গুন ১৩২০ (২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯১৪)। গীতমাল্য-৬৪ সংখ্যক কবিতা। স্বরলিপি-গীতলেখা-১, ১৩২৪। স্বরলিপিকারঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এবারও ৫ ও ৭ সংখ্যক গান গীতবিতানে পাওয়া যায়নি। অনেকদিন পর এবার আবার ইমন-পুরবীর মিশ্রন দেখা যাচ্ছে- 'তুমি জানো ওগো আন্তর্যামী' গানটিতে এবং ভৈরবী ও রামকেলী মিলেছে 'বেসুর বাজেরে' গানে। এই গানটিতে আবার পাঠভেদ ও সুরভেদ রয়েছে। প্রতিবারের মত কবি এবারও পিলু, বেহাগ, কাফী, রামকেলী প্রভৃতি রাগের ব্যবহার করেছেন।

এই পর্যায়ের গানগুলোতে আর দাদরার আধিক্য বেশী দেখা যাচ্ছে না, মাত্র দুটো গান (১ ও ৮ সংখ্যক) দাদরায়, দুটো গান (২ ও ৩ সংখ্যক) কাহারবায় এবং বাকী দুটির একটি একতালে (৪ সংখ্যক) অন্যটি ত্রিতালে (৬ সংখ্যক)।

তালিকায় এবার পূজা পর্যায়ের গান বেশী হয়েছে। মোট ৬টি গানের মধ্যে ১,৩,৪,৬ ও ৮ সংখ্যক গানই পূজা পর্যায়ের। ২ সংখ্যক শুধু একটি গান প্রেম পর্যায়ে রচিত হয়েছে। তালিকায় একটি গানছাড়া (৩ সংখ্যক) আর কোন গানে সুরান্তর কিংবা পাঠান্তর নেই।

রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মতো শিলাইদহে আসেন ১৯২২ সালে সম্ভবত ২১ মার্চ(৮চৈত্র)। মোট পনের দিন কবি সেখানে অবস্থান করেন। এ সময় (১০চৈত্র থেকে ১৪চৈত্র ১৩২৮) কবি ৫টি গান রচনা করেন। গানগুলো হলঃ

১) পূর্বাচলের পানে তাকাই- প্রকৃতি/২৫৯। কাফি/ কাহারবা, স্বরবিতান-১৫, বয়স-৬০। ১০ চৈত্র ১৩২৮ (২৪ মার্চ ১৯২২), শিলাইদহ। শেষবেলা/ ভারতী বৈশাখ ১৩২৯। প্রবাহিনি ২৪। স্বরলিপি- নবগীতিকা-২, ১৩২৯। স্বরলিপিকারঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২) আসা যাওয়ার পথের ধারে- প্রেম/১৯। ইমন- কল্যাণ/ দাদরা। স্বরবিতান-১৫, বয়স-৬০। ১১ চৈত্র ১৩২৮ (১৫ মার্চ ১৯২২), শিলাইদহ। ভারতী বৈশাখ, ১৩২৯ প্রবাহিনী-২৩। এইচএমভি থেকে কনকদাশ (বিশ্বাস) গানটি প্রথম রেকর্ড করেন। রেকর্ড নং পি ১১৮৩২। স্বরলিপি- পান্ডুলিপি নবগীতিকা-২, ১৩২৯। স্বরলিপিকারঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩) কার যেন এই মনের বেদন- প্রকৃতি/ ১৯৩। ভৈরবী/ দাদরা, স্বরবিতান-১৫, বয়স-৬০। ১২ চৈত্র১৩২৮ (২৬ মার্চ, ১৯২২) শিলাইদহ। 'অবশেষে' ভারতী বৈশাখ ১৩২৯। প্রবাহিনী ১৭০ ঋতুচক্র, সুরভেদ আছে। কলম্বিয়া রেকর্ড থেকে মনিকা দেবী গানটি প্রথম রেকর্ড করেন। রেকর্ড নং এন ৭২০৫। স্বরলিপি- নবগীতিকা-২, ১৩২৯। স্বরলিপিকারঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪) নিদ্রাহারা রাতের এ গান- প্রেম/১২। গৌড়সারং/ ষষ্ঠীতাল, স্বরবিতান-১৫, বয়স-৬০। ১৩ চৈত্র ১৩২৮ (২৭ মার্চ, ১৯২২), শিলাইদহ। ভারতী বৈশাখ ১৩২৯/ নিদ্রাহারা শিরোনামে প্রকাশিত। প্রবাহিনী-২১/ স্বরলিপি নবগীতিকা-২, ১৩২৯/ স্বরলিপিকারঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫) এক ফাগুনের গান সে আমার- প্রকৃতি/২৬৬। বসন্ত-বাহার/ তেওড়া, স্বরবিতান-১৫, বয়স-৬০। ১৪ চৈত্র ১৩২৮ (২৮ মার্চ ১৯২২) শিলাইদহ। ভারতী বৈশাখ ১৩২৯। প্রবাহিনী ১৭১ ঋতুচক্র। পাঠভেদ আছে। স্বরলিপি-পান্ডুলিপি-স্বরবিতান-১৫, ১৩২৯। স্বরলিপিকারঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গানগুলো কবির ৬০ বছর বয়সে রচিত। তালিকার পাঁচটি গানেই কবির পূর্ববঙ্গ বাসের আনন্দ বেদনার চিত্রগুলি ফুটে উঠেছে। প্রতিটি গানে বাণী একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় পূর্ববঙ্গ ছেড়ে যাবার একটি বেদনা সেখানে অনুরণিত হচ্ছে।

'পূর্বাচলের পানে তাকাই ....
যখন একূল যাব ছাড়ি, পারের খেয়ায় দেব পাড়ি
..... হঠাৎ বুকে চমক লাগায় আধভোলা সেই কান্নাহাসি।'

কবির মনেপড়েছে নদীপাড়ের খেয়ার স্মৃতি এবং পল্লীবাসীর কান্নাহাসি যা তিনি সেখানে প্রত্যক্ষ করেছেন।

'আশা-যাওয়ার পথের ধারে গান গেয়ে
মোর কেটেছে দিন।
যাবার বেলায় দেব করে বুকের কাছে
বাজল যেবীন।'

কবির শিলাইদহে আসা যাওয়ার বিগত ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি তিনি এই গানটিতে ঢেলে দিয়েছেন।

"কার যেন এই মনের বেদন

চৈত্র মাসের উত্তল হাওয়ার
ঝুমকোলতার চিকন পাতা
কাঁপে রে কার চমকে চাওয়ায়।
হারিয়ে যাওয়া কার সে বাণী
কার সোহাগের স্মরণখানি
আমের বোনের গন্ধে মিশে
কামন কে আজ কান্না পাওয়ায়।
কাঁকন-দুটির রিনিঝিনি
কার বা এখন মনে আছে।
সেই কাঁকনের ঝিকিমিকি
পিয়ালবনের শাখায় নাচে।
যার চোখের ওই আভাস দোলে
নদী ঢেউয়ের কোলে কোলে
তার সাথে মোর দেখা ছিল
সে সেকালের তরী যাওয়ায়।"

গানটিতে স্পষ্ট তাবে ফুটে উঠেছে শিলাইদহের প্রতি তাঁর প্রাণের বেদনা। কবি যে বরান্দায় বসে পদ্মা থেকে ভেসে আসা হাওয়ার স্পর্শ অনুভব করতেন। সেই হাওয়ার দোলায় পাতার ঝিরঝির শব্দ এবং তার সাথে ভেসে আসা আমের বোল ও নানান ফুলের গন্ধ। আর নদী কোলে কবির দিনের পর দিন বোটে থাকার স্মৃতি আমৃত্যু তাঁর হৃদয়ে অম্লান হয়েছিল।

"নিদ্রাহারা রাতের এ গান........
সুরের কাঙ্গাল আমার ব্যথা
ছায়ার কাঙাল রৌদ্র যথা ....

শিলাইদহে আসার পর নিবিড় নিস্তব্ধতায় কবি উপলব্ধি করেছিলেন তিনি কতটা সুরের কাঙ্গাল। এসব কথা তিনি বিতিন্ন সময় তাঁর বিভিন্নপত্রে উল্লেখ করেছেন। ইন্দিরা দেবীকে একপত্রে লিখেছিলেন যে শহরে তাদের আছে সন্ধ্যের জলসা, ডিসকর্ড, পিয়ানো ইত্যাদি নানা রকম বিনোদনের সামগ্রী কিন্তু শিলাইদহে কবির ছিল কেবল নিশ্চুপ নিস্তব্ধ একাকী সন্ধ্যেবেলা। আরও একটি পত্রে কবি জানিয়েছিলেন, একদিন মধ্যরাতে নহবতের সুর শুনে তিনি অনুভব করেছিলেন তাঁর মন সুরের অভাবে কতটা তৃষিত হয়েছিল।

'এক ফাগুনের গান, গান সে আমার আর ফাগুনের কুলে কুলে'

এ যেন কবির ১০ বছর পূর্ববঙ্গ বাসবাসের ফাল্গুনের স্মৃতিকথাই গানে প্রতিধ্বণিত হয়েছে। প্রকৃতি পর্যায়ের অন্তর্গত এ গানটি বসন্ত ও বাহার রাগের মিশ্রণে অপূর্ব রূপ ধারন করেছে। এ পর্যায়ের 'আসা যাওয়ার পথের ধারে' গানটিতেও কবি ইমনকল্যাণ দুটি রাগের মিলন ঘটিয়েছেন। এছাড়া কাফি ও ভৈরবীর পাশাপাশি 'গৌড়সারং' রাগের ব্যবহার করেছেন।

তাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবারে কবি দাদরা, কাহারবা ও তেওড়া তালের পাশাপাশি ষষ্ঠীতাল ব্যবহার করেছেন। এবারকার পাঁচটি গানের মধ্যে তিনটি গানই প্রকৃতি পর্যায়ের বাকী ২টি প্রেম পর্যায়ের অন্তর্গত। তালিকায় ৩ সংখ্যক গানে সুরভেদ ও ৫ সংখ্যক গানে পাঠভেদ রয়েছে।

দেখা যাচ্ছে পূর্ববঙ্গে বসে রবীন্দ্রনাথ প্রচুর গান রচনা করেছিলেন। তবে সবগুলো গান তাঁর সর্বশেষ গীতসংকলন 'গীতবিতানে' স্থান পায়নি। হয়তো কোন কোনটি কবি নিজেই বাদ দিয়েছিলেন কিংবা সঠিক স্বরলিপি না থাকায় গানগুলি গীতবিতানে অবস্থানের যোগ্যতা হারিয়েছিল। এ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত বেশকিছু গান আরো সুন্দর করবার জন্য পূর্ববঙ্গে রচিত রূপটি কবি পরবর্তীকালে পরিবর্তন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ৩০ বছর বয়সে থেকে শুরু করে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত রচিত গানগুলোতে পূর্ববঙ্গের নিসর্গ চিত্র ও সমাজ জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে এবং গানের সুর ও বাণীতে এসেছে অনন্য সাধারণ রূপ, যা তাঁর সৃষ্টিকে করেছে অমর।

তথ্য সূত্র

১. রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা-শান্তিদেব ঘোষ, পৃষ্ঠা- ১৬২-১৬৪, আনন্দ পাবলিশার্স, নভেম্বর ১৯৮৭।
২. ছিন্নপত্রাবলী- শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পত্র নং- ২২৯, পৃষ্ঠা-৩২৪, বিশ্বভারতী, চৈত্র ১৩৯৯।
৩. রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা-শান্তিদেব ঘোষ, পৃষ্ঠা- ১৭৪, আনন্দ পাবলিশার্স, নভেম্বর ১৯৮৭।
৪. গানের ঝর্ণাতলায়, মৃদুল কান্তিচক্রবর্তী, পৃষ্ঠা-৫২, অবসর প্রকাশনা- ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭।
৫. রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা-শান্তিদেব ঘোষ, পৃষ্ঠা- ২২১, আনন্দ পাবলিশার্স, নভেম্বর ১৯৮৭।
৬. ছিন্নপত্রাবলী- শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পত্র নং- ৪১, পৃষ্ঠা-৭২,৭৩,৭৪ বিশ্বভারতী, চৈত্র ১৩৯৯।
৭. গানের ঝর্ণাতলায়, মৃদুল কান্তিচক্রবর্তী, পৃষ্ঠা-৫৪, অবসর প্রকাশনা- ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭।

- **গান সম্পর্কিত তথ্যগুলো- 'রবীন্দ্রসঙ্গীত কোষ', সুরেন মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য প্রকাশ, ৭/০৮/২০০১ থেকে নেওয়া হয়েছে।**

গ্রন্থপঞ্জী

১. অচেনা রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

২. মানুষের ধর্ম- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩. ছিন্নপত্রাবলী- শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪. রবীন্দ্ররচনাবলী, ৩য় খন্ড।

৫. পতিসরে রবীন্দ্রনাথ-ডঃ সাইফুদ্দীন চৌধুরী।

৬. রবীন্দ্র সংগীত বিচিত্রা- শান্তি দেব ঘোষ।

৭. রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ-সংকলন -আবুল আহসান চৌধুরী।

৮. রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-গোলাম মুরশিদ।

৯. শ্রীভূমি সিলেটে রবীন্দ্রনাথ-নগেন্দ্র লাল দাস।

১০. রবীন্দ্রনাথ, সম্পাদনা- মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ।

১১. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, খন্ড-১০।

১২. আত্মপরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী।

১৩. কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত।

১৪. 'বাউল লালন রবীন্দ্রনাথ'- শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত।

১৫. শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ- শচীন্দ্রনাথ অধিকারী।

১৬. হারামনি (২য় খন্ড)- মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, আশীর্বাদ- রবীন্দ্রনাথ, ।

১৭. গানের ঝর্ণাতলায়- মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী।

১৮. রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিক্রমা- করুনাময় গোস্বামী।

১৯. 'রবীন্দ্রসঙ্গীত কোষ', সুরেন মুখোপাধ্যায়।

425530

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার